ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

❀ ❀ ❀

(১) ধর্মের প্রয়োজন

বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ এবং সাধু-মহাত্মাদের কথা এবং মহান ব্যক্তিদের আচরণ থেকে এইটিই সিদ্ধ হয় যে জগৎ-সংসার ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের দ্বারাই মানুষের জীবনের সার্থকতা আসে। ধর্মই মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবনে প্রবেশ করায়, ধর্মবলের দ্বারাই জীব বিপদসঙ্কুল সংসার এবং পরলোকে দুঃখের মহাসাগর পার হতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা এবং সাধুরা তো এই সিদ্ধান্তকে খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও ধর্মের মর্যাদাকে উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। সকলেই ধর্মবলের দ্বারা নিজেদের শক্তিশালী ভেবেছেন। এখন পর্যন্ত সর্বত্র এই কথাই মেনে নেওয়া হয়েছে যে ধর্ম ছাড়া মানুষের জীবন পর-জীবদের মতো হয়ে যায়। কিন্তু ইদানিং পৃথিবীতে একটি নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। যেখানে ধর্মকে জীবনের উন্নতির একটি প্রধান সাধন মনে করা হতো সেখানে এখন কিছু লোক ধর্মকে পতনের কারণ বলে জানাচ্ছেন।

কিছুদিন আগে সংবাদ পত্রগুলিতে এই খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে রাশিয়ায় 'ঈশ্বর বিরোধী মণ্ডল'-এর অনুরোধে সেখানকার সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের সদস্যদের কোনরকম ধর্মীয় কাজে যোগদান না করার নির্দেশ জারী করেছেন। এর আগে এইভাবে ঈশ্বরের বিধিবদ্ধ বিরোধ করবার কথা কোথাও শোনা যায়নি। অবশ্য পুরাণে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যদের নাম পাওয়া যায়। তারা প্রহ্লাদকে তাড়না করেছিল। অত্যাচারের জন্য বিখ্যাত রাবণের রাজত্বেও

সম্ভবত ঈশ্বরকে মান্য না করার আইন ছিল না। তা যদি থাকত তাহলে বিভীষণের মত ঈশ্বরভক্ত তার রাজত্বে কি করে থাকত? একথা ঠিক যে বহুকাল ধরে পৃথিবীতে এমন লোক হয়ে আসছে যারা ঈশ্বরের সত্তাকে স্বীকার করে না। কিন্তু তারাও কখনও ধর্মের বিরোধিতা করেনি। বড় বড় নিরীশ্বরবাদীরাও জগতে ঐহিক সুখ বিধানের জন্য ধর্মকে পালন করেছেন এবং তার পক্ষ নিয়েছেন। ধর্মের স্বরূপ যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেক দেশ এবং জাতি চিরকাল ধরে ধর্মকে পালন করে আসছে।

বর্তমানে এই ধর্মবিরোধী আন্দোলন কেবল রাশিয়াতেই সীমিত নেই, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকাতেও খ্রীষ্ট, মুসলমান, বৌদ্ধ সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর এই আন্দোলন সঞ্চারিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দুঃখের কথা হলো এই যে ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষেও আজ ঈশ্বর এবং ধর্মের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হওয়ার ফলে কিছু লোক বলতে আরম্ভ করেছেন যে 'ধর্মই হল আমাদের সর্বনাশের কারণ। ধর্মের কারণেই দেশ পরাধীন হয়ে যাচ্ছে, ধর্মই হলো আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রধান বাধা।' যারা এই ধরনের কথা বলে এবং মানে তারা ঈশ্বর ও ধর্মবাদীদের মূর্খ মনে করে। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে না আর সহজে একথা বোঝাও তাদের পক্ষে কঠিন। কেননা যখন মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান মনে করে তখন সে নিজের মতের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ সম্মতিকেও পছন্দ করে না। এই ধর্মবিধ্বংসী আন্দোলনের পরিণাম কী হবে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাহলেও শব্দ, যুক্তি এবং অনুমান-প্রমাণ থেকে এইটিই অনুমিত হয় যে এর ফলে দেশের খুবই দুর্দশা হবে। ধর্মহীন মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয় আর এই রকম মানুষের সমূহ যত বৃদ্ধি পায়, ততই দ্বেষ-বিদ্বেষের দাবানল বেশি করে প্রজ্বলিত হতে থাকে। তাতে সকলকেই দুঃখভোগ করতে হয়।

ধর্মই মানুষকে সংযমী, সাহসী, ধীর, বীর, জিতেন্দ্রিয় এবং কর্তব্যপরায়ণ করে। ধর্মই দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, পরদুঃখ-কাতরতা, সেবা, সত্য এবং ব্রহ্মচর্যের পাঠ শেখায়। মনু ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলেছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌।। (৬/৯২)

ধৃতি, ক্ষমা, মনকে নিগ্রহ, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নির্মল বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি হলো ধর্মের লক্ষণ।

মহাভারতে বলা হয়েছে—

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ।।

(বনপর্ব ২৯৭/৩৫)

মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা সকল প্রাণীর সঙ্গে অদ্রোহ, সকলের প্রতি কৃপা এবং দান এইটিই হল সাধু পুরুষদের সনাতন ধর্ম।

পদ্মপুরাণে ধর্মের লক্ষণ বলা হয়েছে—

ব্রহ্মচর্যেণ সত্যেন মখপঞ্চকবর্তনৈঃ।
দানেন নিয়মৈশ্চাপি ক্ষান্ত্যা শৌচেন বল্লভ।।
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্তনৈঃ।
এতৈর্দশাভিরঙ্গৈস্তু ধর্মমেব প্রপূরয়েৎ।।

(দ্বিতীয় খণ্ড, অঃ ১২/৪৬-৪৭)

হে প্রিয়! ব্রহ্মচর্য, সত্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, শান্তি এবং অস্তেয় দ্বারা আচরণ করা—এই দশটি অঙ্গের দ্বারা ধর্মেরই পূর্তি করুন।

এখন বলুন, কোনো জাতি বা ব্যক্তি কি মন এবং ইন্দ্রিয়ের গোলাম, বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, সত্য-ক্ষমা রহিত, মন, বাণী, শরীরের দ্বারা অপবিত্র, হিংসা-পরায়ণ, অশান্ত, দানরহিত এবং পরস্বার্থহরণকারী হলে সুখী অথবা উন্নত হতে পারে? প্রত্যেক উন্নতিকামী জাতি অথবা ব্যক্তির জন্য কি ধর্মের এই গুণগুলিকে চরিত্রগত করবার অতিশয় আবশ্যকতা নেই? ধর্মের এই তত্ত্বগুলি থেকে রহিত কোনো জাতি কখনও কি জগতে সুখপূর্বক টিকে থাকতে পারে? ধর্মের নাম পর্যন্ত যাঁরা উচ্ছেদ করতে চান, সেই সব সজ্জনেরা যদি পক্ষপাতশূন্য হয়ে গভীরভাবে শান্তচিত্তে চিন্তা করেন তাহলে তাঁরাও বুঝতে পারবেন যে, ধর্মই আমাদের ইহকাল-পরকালের একমাত্র সহায়ক এবং সঙ্গী। ধর্ম মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের শীতল ক্রোড়ে নিয়ে যায়, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যায়, তমসাবৃত হৃদয়ে অপূর্ব জ্যোতির প্রকাশ এনে দেয়। ধর্মই চরিত্র গঠনের একমাত্র সহায়ক। ধর্মের দ্বারাই অধর্মকে জয় করা যেতে পারে, ধর্মই অত্যাচারকে বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপনার হেতু হতে পারে। পাণ্ডবদের কাছে সৈন্যবল অপেক্ষা ধর্মবল বেশি ছিল, সেইজন্যই তারা জয়লাভ করে। অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা সর্বরকমে সুসজ্জিত বিপুল সেনার অধিকারী মহাপরাক্রমী

রাবণেরও ধর্মত্যাগের ফলে অধঃপতন হয়েছিল। কংসকে ধর্মত্যাগের কারণে কলঙ্কিত হয়ে মরতে হয়েছিল।

মহারাণা প্রতাপ এবং ছত্রপতি শিবাজীর নাম হিন্দু জাতির মধ্যে ধর্মাভিমানের জন্য অমর। গুরু গোবিন্দ সিং-এর পুত্র ধর্মের জন্য সানন্দে আত্মবলিদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ভক্তিমতি মীরা ধর্মের জন্য বিষ পান করেছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট ধর্মের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধ ধর্মের জন্য শরীরকে কৃশ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম পালনের জন্য কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারলে একা সুখময় স্বর্গে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। এইজন্য এইসব মহানুভবদের নাম আজও অমর হয়ে আছে। ধর্ম চলে গেলে মানুষ কি বাঁচবে? ধর্মের অভাবে পরধর্ম ও পরস্ত্রী অপহরণ করার, দীনকে দুঃখ দেওয়ার, যথেচ্ছার করার সুযোগ এসে যাবে। সর্বরকমে ধর্মরহিত জগতের কল্পনা বিচারশীল পুরুষের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়।

অতএব এখন থেকে ধর্মভীরু জনতাকে সাবধানতার সঙ্গে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য কোমর বাঁধতে হবে। ধর্ম সাহিত্যের প্রচার, ধর্মের নির্মল ভাবের প্রসার, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বের অন্বেষণ এবং প্রসার করাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে ধর্মের যথার্থ আচরণের দ্বারা এমন চরিত্রগত ধর্মবল সংগ্রহ করতে হবে, যার দ্বারা ধর্মবিরোধীর চালচলনে কঠিন বাধা সৃষ্টি করা যায়। সনাতন ধর্ম কোনো ধর্মের বিরোধ করে না। মহাভারতে বলা হয়েছে—

ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুধর্মকঃ।
অবিরোধাত্তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রম।।

হে সত্যবিক্রম। যে ধর্ম অন্য ধর্মের বিরোধ করে সেটি তো কুধর্ম। যে অন্যের বিরোধিতা করে না সেইটিই যথার্থ ধর্ম। বুঝি না, এসব সার্বভৌম ধর্ম ত্যাগ করার কথা ওঠে কেন? মনুর এই কথা স্মরণ করা উচিত—

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারা ন জ্ঞাতির্ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।।২৩৯।।
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ঠসমং ক্ষিতৌ ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি।।২৪১।।
তস্মাদ্ধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্মেন হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্।।২৪২।।

(মনুস্মৃতি অঃ ৪)

পরলোকে সহায়তার জন্য মা, বাবা, ছেলে, স্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজন থাকে না। সেখানে কেবল ধর্মই কাজ করে। মৃত শরীরকে বন্ধু-বান্ধবেরা কাঠ এবং মাটির ঢেলার মতন মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে যায়। কেবল ধর্মই তার সঙ্গে যায়। অতএব পরলোকের সহায়তার জন্য প্রতিদিন ক্রমশ ধর্ম সঞ্চয় করতে থাকা উচিত। ধর্মের সহায়তায় মানুষ দুস্তর নরকও পার হয়ে যায়।

(২) ধর্মে লাভ এবং অধর্মে ক্ষতি

যুগের প্রভাবে এবং জড় ভোগবাদী সভ্যতার বিস্তারের ফলে আজ পৃথিবীর ধর্মের প্রতি খুবই কুরুচি দেখা যাচ্ছে। যেখানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও ধর্মকে পালন করা কর্তব্য বলে মনে করা হতো সেখানে আজ ধর্মকে প্রাণঘাতী শত্রু মনে করে তাকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা চলছে। ধর্ম কী জিনিস তা জানার জন্য এতটুকু চেষ্টা না করে ধর্মের সব কিছু নষ্ট করাকেই বাহাদুরী বলে মনে করা হচ্ছে। আর ভাবাবেগে তাড়িত ধর্মশূন্য মানুষ উচ্ছৃঙ্খলতারূপ স্বাধীনতার উন্মত্ততায় ঈশ্বর এবং ধর্মের অস্তিত্বকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে এবং ডঙ্কানাদে ঈশ্বর ও ধর্মকে অপরাধী ঘোষণা করে এই বলে চিৎকার করছে যে "ধর্ম এবং ঈশ্বরই জগতের সর্বনাশ করে দিয়েছে। ধর্ম এবং ঈশ্বরের জন্যই পৃথিবীতে দরিদ্র এবং দুর্বলদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে। ধর্ম এবং ঈশ্বরের দাসত্বই মানুষকে দাসত্বে অভ্যস্ত করে দিয়েছে। আর এই ধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি স্বীকৃতির কারণেই সাদাসিধা মানুষদের লুণ্ঠন করা হয়েছে এবং এখনও তা করা হচ্ছে।"

এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বার্থপর, কামাসক্ত, দাম্ভিক, পাষণ্ড লোকেরা কামিনী, কাঞ্চন এবং মান-সম্মানের কামনায় ক্রোধ এবং লোভের বশবর্তী হয়ে ধর্মের নামে অত্যাচার করেছে এবং এখনও করে চলেছে। একথাও সত্য যে ঈশ্বরের উপাসনাকারী বলে কথিত পূজারী এবং যাজকদের মধ্যেও অনেক পাষণ্ড দুরাচারী লোকেরাও ঠকাবার জন্য নতুন নতুন ছলনা সৃষ্টি করেছে এবং আজও এমন লোকেদের অভাব নেই। মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে স্বার্থপর, ধর্মজ্ঞানরহিত, বিষয়লোলুপ মানুষ অবশ্যই বেচারা গরীব, দুঃখী কৃষক-মজুর গ্রামীণ সাদাসিধা লোকেদের কাছ থেকে পশুদের মতো কাজ আদায় করে, তাদের উপর অত্যাচার করে এবং তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু তার দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে এটি হলো ধর্ম এবং ঈশ্বরের দোষ অথবা সেই কারণে ধর্ম এবং ঈশ্বরকে মানা উচিত নয়। বরং এই কথাই বলা উচিত যে লোকেদের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থা না থাকায় এই পাষণ্ডতা এবং অনাচার বিস্তৃত হয়েছে। যদি বাস্তবে

লোকেদের ধর্মে প্রবৃত্তি এবং সর্বব্যাপী, সর্বদর্শী, ন্যায়কারী, দয়ালু ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস থাকত তাহলে এই রকম অনাচার কখনই ব্যাপক হতো না। অনাচার, অত্যাচার, পাষণ্ডতা এবং গরীবদের উপর উৎপীড়নের প্রধান কারণই হলো ধর্মের হ্রাস হওয়া।

আজকাল তীর্থগুলিতে কাম ও লোভের বশবর্তী কিছু দাম্ভিক লোক সেখানে প্রবেশ করে শ্রদ্ধাবান যাত্রীদের শ্রদ্ধা থেকে লাভ তুলে নেয় অথবা কামভোগপরায়ণ হীনবৃত্তির কিছু মানুষ ভক্তির উত্তম ভেক ধারণ করে নারীদের সতীত্ব হরণ করে নিচ্ছে। এরা সবাই ভীষণ অপরাধী। যারা ধর্মের স্থানগুলিকে দূষিত করে, কাম ও লোভের বশে জনগণকে প্রবঞ্চিত করে, নিজেদের অপকর্ম ও দুরাচারের দ্বারা ধর্মাত্মা, সাধু, সন্ত এবং ভক্তদের নামের উপর কলঙ্ক লেপন করে তারা সবাই নরপিশাচ। তাদের যতই নিন্দা করা হোক তা পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু ঈশ্বর এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে ধর্মের নামে যারা ছলনা করে সেইসব স্বার্থপর, দাম্ভিক এবং পাষণ্ডকে ধর্মাত্মা, ভক্ত অথবা আস্তিক মনে করে তাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অবিবেচনাপ্রসূত ভাবে তীর্থ, মন্দির, ধর্ম কিংবা ঈশ্বরকে নিন্দা করা—ধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করার চেষ্টাও এক রকম ধর্মের উপর অত্যাচার তথা জেনে বুঝে ঘোরতর অপরাধ। পৃথিবীতে চিরকাল কম বেশি দাম্ভিক, পাষণ্ড মানুষ থেকেছে আর এই ঘোর কলিকালে তো তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিই পেয়েছে। যেখানে যে বেশ পরিধান করলে এবং যে রকমের কাজ করলে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হয় তারা দম্ভপূর্বক দ্রুততার সঙ্গে সেই বেশ ধারণ করে নিজেদের হীন মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য সেই কাজ করে থাকে। বিগত দিনগুলিতে যখন খদ্দরের খুব কদর ছিল তখন দেখা গিয়েছিল যে বহু লোক খাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়েও খদ্দর পরতে শুরু করেছে। কিন্তু তার দ্বারা খদ্দরের বদনাম করা যায় না। আজও যদি প্রকৃত দেশসেবকদের মধ্যে কোনো দেশদ্রোহী থাকে এবং সে দেশসেবকের বেশ ধারণ করে দেশের ক্ষতি করতে থাকে তাহলে তার দ্বারা দেশসেবা খারাপ কাজ হয়ে যায় না এবং প্রকৃত দেশসেবকদের বিরুদ্ধে ন্যায়তঃ কোনো অভিযোগ তোলা যায় না। এই কথা ধর্মের সম্পর্কেও প্রযুক্ত। কিন্তু আজকাল যেন ধর্ম ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের মনে এক রকম বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। কিছু মানুষ ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে যে কোনো অছিলায় ধর্ম এবং ঈশ্বরকে নিন্দা করাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করে।

দুঃখের কথা হলো, ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে আর্যজাতিতে জন্ম মানুষদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হলো ভোগবাদী পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বর্তমানে দূষিত ধর্মহীন শিক্ষা। শৈশব থেকে ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যার দ্বারা তাদের ধর্মের জ্ঞান তো হয়ই না, তার বিপরীতে ধর্মের প্রতি অরুচি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই কারণেই যাদের পিতা-পিতামহ সংস্কৃত ভাষার বড় পণ্ডিত, ধর্মের জ্ঞাতা এবং ধর্মপথে দৃঢ়তার সঙ্গে আরুঢ় ছিলেন তাঁদের পুত্র-পৌত্রেরা জানেও না যে ঋষি সেবিত সনাতন ধর্ম কাকে বলে। অধিকাংশরূপে এরাই ধর্ম এবং ঈশ্বরের বিরোধী মানুষরূপে তৈরী হয়। এখন যেমন জঙ্গলে বসবাসকারী পাহাড়ী জাতিদের মধ্যে ধর্মের জ্ঞান নেই, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ লোকেদের অবস্থাও সেই রকম। আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। পাহাড়ী জাতিগুলির সরল মানুষদের বুঝিয়ে ধর্ম পথে আনা সহজ, কিন্তু যে মানুষদের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং নতুন সংস্কৃতির অহঙ্কার আছে এবং যারা একেই উন্নতির মান বলে মনে করে আছে তাদের ধর্মপথে নিয়ে আসা খুবই কঠিন। ঈশ্বরের দয়ার কাছে তো কিছুই কঠিন নয়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। আজকাল লোকেরা পত্র-পত্রিকায় এবং সভা-সমিতিতে অনর্গল ঈশ্বর এবং ধর্মকে শেষ করার উদ্দেশ্যে যেভাবে ধর্ম এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হীনতম অভিযোগ করে থাকে, কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন লোক তেমনভাবে ধর্ম এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলার সাহস করতে পারত না। সেইসব ঈশ্বর এবং ধর্মবিরোধী ভাইদের কাছে আমার নম্র নিবেদন হলো তাঁরা যেন আবেগ তাড়িত না হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। প্রগতি এবং উন্নয়নের নামে ধর্ম এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এই পবিত্র আর্যভূমিকে বিরাট সঙ্কটের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা না করেন। তাঁরা যেন প্রাচীনকালের ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মসেবী মহর্ষিদের ত্যাগময় জীবনের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁরা কত বড় ত্যাগী এবং বৈরাগী ছিলেন। ধর্মের জন্য তাঁরা কত রকমের কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দেশ এবং ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা কতভাবে নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছিলেন। বৃত্তাসুরের উপদ্রব থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য মহর্ষি দধিচী নিজের শরীরের মাংস গরুদের দিয়ে চাটিয়ে হাড়গুলিকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায়। আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে ধর্মের হানি হলে দেশ ও জাতির অবস্থা কেমন হবে। ঈশ্বরের আশ্রয়

এবং ধর্মের প্রবৃত্তি—এই দুটি এমন জিনিস যে তাদের দ্বারা আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে পরম সুখের অধিকারী হতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস এবং ধর্মের লোপ হলে আমাদের জীবন পশুদের থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের সত্তাকে স্বীকার না করলে এবং ধর্মের বিরোধ করলে অধর্মের বৃদ্ধি হবে। অধর্মের বিস্তারের ফলে সংসার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে থাকবে। আচরণের সীমাবদ্ধতা তো নষ্টই হয়ে যাবে। পরধন এবং পরস্ত্রীর বাছবিচার উঠে যাবে। পরে অধার্মিকেরা বোন এবং কন্যাদের সঙ্গে ব্যাভিচারের মতো ঘোরতর অকাজ করতে থাকবে। লোকেদের লেখায় এর ইঙ্গিতে এখনই তো পাওয়া যাচ্ছে। এটি এত বড় পাপ যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র একে ভীষণ ঘৃণিত কাজ উল্লেখ করে এই রকম মানুষদের মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন—

অনুজ বধূ ভগিনী সুত নারী। সুনু সঠ কন্যা সম এ চারী।
ইন্হহি কুদৃষ্টি বিলোকই জোঈ। তাহি বধেঁ কছু পাপ ন হোঈ।।

যখন ধর্মের সম্মান থাকবে না, পশুধর্ম বিস্তারলাভ করবে তখন এই রকম ঘোরতর পাপকর্ম থেকে কে কাকে আটকাবে? মাতা-পিতা, গুরুজনদের সেবা তো দূর অস্ত, তাঁদের অবহেলা এবং অপমান হতে থাকবে। যার কাছে যে কাজ ভাল লাগবে তাকেই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হবে। তার ফলে ইহলোকে এবং পরলোকে কোথাও জীবন সুখকর হবে না। শ্রীভগবান বলেছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।

(গীতা ১৬/২৩)

"যে মানুষ শাস্ত্রের বিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামতো আচরণ করে, সে সিদ্ধি লাভ করে না, পরম গতি এবং সুখও লাভ করে না।"

ঈশ্বর এবং ধর্মের শাসন না থাকলে অধার্মিকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রবঞ্চনা সৃষ্টি করে মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বলবান এবং ক্ষমতাধিষ্ঠ মানুষেরা ক্রোধ এবং মোহের বশবর্তী হয়ে দুর্বল এবং গরীবদের উপর সেই রকম অত্যাচার করবে বলবান পশুরা যেমন করে নির্বল, নিরাপরাধ পশুদের কষ্ট দেয়। নৃশংসতা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন ঘোরতর রাক্ষসবৃত্তি এসে যাবে যে স্বার্থপুষ্ট মানুষ পশুদের কথা তো কোন্ ছার মানুষকেই খেতে থাকবে। মান, মোহ এবং মদে (দম্ভে) আবিষ্ট হয়ে অধার্মিকেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছামতো আচরণ করতে থাকবে। যাদের

বলবান, ধনী এবং শিক্ষিত বলা হয় সেইসব মানুষকেই ঈশ্বর, মহাত্মা, যোগী বলে মনে করা হবে। অধর্মের কারণেই আজ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পরাধীন, দীন, দুঃখী হয়ে যাচ্ছে। অধর্মের বৃদ্ধির পরিণামেই বর্তমান ভারতবর্ষে নতুন নতুন মহামারী হচ্ছে। মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে এবং পশুধন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি দৈবী-প্রকোপের ফলে প্রাণীরা দুঃখভোগ করছে এবং অন্ন-বস্ত্রের অভাবে প্রাণত্যাগ করছে। অধর্মের আরও বিশেষ বৃদ্ধি হলে দুঃখ তো আরও বেড়ে যাবে। অধর্মের ফল অবশ্যই দুঃখ। পক্ষান্তরে ধর্মের ফল কখনও দুঃখ হতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যায় চিরকাল যথার্থ ধর্মেরই জয় হয়েছে। কেননা যেখানে ধর্ম সেখানেই ঈশ্বরের সাহায্য থাকে। মহাভারতে গুরু দ্রোণাচার্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়লাভের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—

যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।

(ভীষ্মপর্ব)

'যেখানে ধর্ম সেখানেই ঈশ্বর (কৃষ্ণ) এবং যেখানে ঈশ্বর সেখানেই জয়।'

ধন, জন, শক্তি এবং ক্ষমতা প্রভৃতি সর্ব প্রকারের সম্পন্ন শক্তিশালী অধর্মাচারী মানুষেরা ধর্মাত্মাদের দ্বারা নিহত হয়েছে। এই কথা খ্যাত যে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতি অসুরেরা ধন-জনে সম্পন্ন ছিল। তাদের কাছে যুদ্ধের অসাধারণ উপকরণ মজুত ছিল। কিন্তু পাপের ফলে তারা ভগবানের দয়ায় বলীয়ান সাধারণ বানরদের দ্বারা পরাস্ত হয়েছিল। এই কথা যুক্তিযুক্ত এবং প্রমাণিত যে, যে-মানুষ দুঃখী, অনাথ এবং নির্বলদের উপর অত্যাচার করে সে তার নিজের সেই অত্যাচারময় অনীতির দ্বারা নিজেও নিহত হয়। তার পাপ তাকেই খেয়ে ফেলে। পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। কোনো কারণে তার জন্য দেরী হলেও হতে পারে। দীর্ঘকাল পরে পাওয়া ফলকে দূরদৃষ্টি না থাকার কারণে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সেজন্যই আমরা এই ভুল করি যে পাপীরা বেশ ফুলে ফেঁপে আছে এবং সংসারে পাপের কোনো শাস্তি নেই। এইজন্যই লোকেরা ধর্মকে অবহেলা করে অধর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এটি চিন্তা করা উচিত যে সকল কুপথ্যের ফল তখনই তখনই হয় না। কারও তাড়াতাড়ি হয়, কারও বা কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তাররাও বুঝতে পারেন না, তা কিসের কারণে হয়েছে। কিন্তু একথা ঠিকই যে তা হলো কোনো না কোনো সময়ে করা কোনো পাপ বা কুপথ্যের পরিণাম। কোনো বীজ মাটিতে

তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়, কারও তা হতে অনেক মাস সময় লেগে যায়। কোনো গাছে তাড়াতাড়ি ফল ধরে আবার কোনো গাছে কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে ফল আসে। একথা নিশ্চিত যে বীজ অনুসারে ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে আমাদের কৃতকর্মের ফল আমাদের ভুগতে হবেই। অতএব অধর্ম থেকে আমাদের সর্বদা দূরে থাকতে হবে এবং ধর্মপালনে তৎপর হতে হবে।

ধর্মাচরণের ফলে মানুষের মধ্যে সমতা, শান্তি, দয়া, সন্তোষ, সারল্য, সাহস, নির্ভয়তা, বীর্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের স্বাভাবিক বিকাশ হয়। ধর্মরূপী তপস্যার আচরণের দ্বারা সকল পাপ ও দোষ আগুনের ইন্ধনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিষয়ের প্রতি বিরাগ এবং ঈশ্বর তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যায়। তার ফলে সমস্ত সৎগুণ তার মধ্যে স্বয়ং প্রকটিত হয়ে যায়। এই রকম ধর্মাত্মা মানুষ কোনো প্রাণীকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে পারে না। সে সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে অথবা নিজের আত্মাকে দর্শন করে। যে মানুষ সর্বত্র ঈশ্বরকে অথবা আত্মাকে দর্শন করে সে কাউকে কি করে দুঃখ দিতে পারে? যেমন অজ্ঞানী পুরুষ নিজের স্বার্থে নিমগ্ন থাকে তেমনই এই রকম ধর্মাত্মা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে ইন্দ্র পর্যন্ত সকল জীবের কল্যাণে রত থাকে। এরই পরিণামে সেই মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে—

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ। (গীতা ১২/৪)

যিনি ধর্মকে জানেন তিনি দুর্বল দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করবেন এবং কারও ধন আহরণ করবেন, কাউকে বিরক্ত করবেন—তা হতেই পারে না। বরং তিনি জেনে শুনে একটি পিঁপড়েকেও কষ্ট দেবেন না। যে মানুষ জেনে শুনে কোনো জীবকে সামান্যতম কষ্টও দেয় তার কাছে ধর্মের তত্ত্বের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সে ধর্মতত্ত্বজ্ঞাতা মানুষের কাছ থেকে শিক্ষাও পায়নি। কেননা শাস্ত্রে অহিংসাকেই পরমধর্ম বলা হয়েছে।

অহিংসা পরমো ধর্ম

তুলসীদাস বলেছেন—

পরহিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ।
পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ।।

আমাদের শম, দম, যম, নিয়ম প্রভৃতি উত্তম ধর্ম পালন করে নিজেদের ভ্রান্ত ভাইদের পথ দেখাতে হবে যাতে তারা সকলে ধর্মে আরূঢ় হয় এবং দেশ সুখী হয়ে যায়। যে দেশে ভগবান রাম এবং কৃষ্ণ অবতার রূপ গ্রহণ করেছেন এবং যেখানে সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃত গীতার মতো প্রকৃত ধর্ম জানাবার গ্রন্থ আছে সেই দেশের প্রজারা অশান্তি এবং দুঃখ ভোগ করবে এটি খুবই লজ্জার কথা। গীতোক্ত ধর্ম পালন করলে আমরা নিজেরা শান্ত এবং সুখী হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে সুখী এবং স্বাবলম্বী করতে পারব। সমগ্র গীতার কথা বাদ দিন কেবল ষোড়শ অধ্যায়ে ধর্ম সম্পদরূপে যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে সেটিকে পালন করলে এবং আসুরী-সম্পদকে ত্যাগ করলেই মানুষ চিরকালের জন্য পরম শান্তি এবং পরমানন্দ লাভ করতে পারে। সে যে কেবল নিজেই সুখী হয় তা নয় উপরন্তু যে গ্রামে,যে শহরে সে থাকে, সেখানে যত লোক থাকে তাদের প্রায় সবাইকেই সে নিজের ধর্ম বলের দ্বারা সুখী করে দিতে পারে। যেখানে প্রকৃত ধর্মাত্মা থাকেন সেখানে তাঁর ধর্মের প্রতাপে ভূমিকম্প, মহামারী, অকাল প্রভৃতি দৈবী কোপের দ্বারা প্রজারা পীড়িত হতে পারে না। দৈবীযোগে যদি কখনও এরকম বিপত্তি এসেও যায় তাহলে তাঁর প্রতাপে অর্থাৎ তাঁর পরোপকার বৃত্তির দ্বারা লোকেরা সহজেই সেই বিপত্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মহারাজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন নিজের চার ভাই এবং রাণী দ্রৌপদীকে নিয়ে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করছিলেন তখন তাঁদের খুঁজে বার করতে ব্যগ্র দুর্যোধনকে পিতামহ ভীষ্ম তাঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন—

পুরে জনপদে চাপি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দানশীলো বদান্যশ্চ নিভৃতো হ্রীনিষেবকঃ।।
জন জনপদে ভাব্যো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রিয়বাদী সদা দান্তো ভব্যঃ সৎপরো জনঃ।।
হৃষ্টঃ পুষ্টঃ শুচির্দক্ষো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
নাসূয়কো ন চাপীর্ষুর্নাভিমানী ন মৎসরী।।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র স্বয়ং ধর্মমনুব্রতঃ।
ব্রহ্মঘোষাশ্চ ভূয়াংসঃ পূর্ণাহুত্যস্তথৈব চ।
ক্রতবশ্চ ভবিষ্যন্তি ভূয়াংসো ভূরিদক্ষিণাঃ।।
সদা চ তত্র পর্জন্যঃ সম্যগ্বর্ষী ন সংশয়ঃ।

সম্পন্নসস্যা চ মহী নিরাতঙ্কা ভবিষ্যতি।।
গুণবন্তি চ ধান্যানি রসবন্তি ফলানি চ।
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি শুভশব্দা চ ভারতী।।
বায়ুশ্চ সুখসংস্পর্শো নিষ্প্রতীপং চ দর্শনম্।
ন ভয়ং ত্বাবিশেত্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।।
গাবশ্চ বহুলাস্তত্র ন কৃশা ন চ দুর্বলাঃ।
পয়াংসি দধিসর্পীষি রসবন্তি হিতানি চ।।
গুণবন্তি চ পেয়ানি ভোজ্যানি রসবন্তি চ।
তত্র দেশে ভবিষ্যন্তি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।।
রসাঃ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চাপি গুণান্বিতাঃ।
দৃশ্যানি চ প্রসন্নানি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।।
ধর্মাশ্চ তত্র সর্বৈস্তু সেবিতাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্গুণৈশ্চ সংযুক্তা অস্মিন্ বর্ষে ত্রয়োদশে।।
দেশে তস্মিন্ ভবিষ্যন্তি তাত পাণ্ডবসংযুতে।
সম্প্রীতিমান্ জনস্তত্র সন্তুষ্টঃ শুচিরব্যয়ঃ।।
দেবতাতিথিপূজাসু সর্বভাবানুরাগবান্।
ইষ্টে দানে মহোৎ সাহঃ স্বস্বধর্মপরায়ণঃ।।
অশুভাদ্ধি শুভপ্রেপ্সুরিষ্টযজ্ঞাঃ শুচিব্রতঃ।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।।
ত্যক্তবাক্যানৃতস্তাত শুভকল্যাণমঙ্গলঃ।
শুভার্থেপ্সুঃ শুভমতির্যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র নিত্যং চেষ্টপ্রিয়ব্রতঃ।
ধর্মাত্মা শক্যতে জ্ঞাতুং নাপি তাত দ্বিজাতিভিঃ।।
কিং পুনঃ প্রাকৃতৈস্তাত পার্থো বিজ্ঞায়তে কচিৎ।
যস্মিন্সত্যং ধৃতির্দানং পরা শান্তির্ধ্রুবা ক্ষমা।
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ পরং তেজ আনৃশংস্যমথার্জবম্।।

(মহাভারত, বিরাটপর্ব ২৮/১৪-৩২)

"যে নগরে এবং গ্রামে রাজা যুধিষ্ঠির থাকতে পারেন সেই দেশের মানুষ দানশীল, উদার এবং জিতেন্দ্রিয় হবে। খারাপ কাজ করতে তারা লজ্জা পাবে।

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকতে পারেন সেখানকার মানুষ প্রিয়ভাষী, সর্বদা ইন্দ্রিয়-জয়ী, শ্রীময়, সত্যপরায়ণ, হৃষ্ট, পুষ্ট, পবিত্র এবং চতুর হবে। যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির থাকতে পারেন সেখানকার লোকেরা অন্যের গুণে দোষারোপ করে না। তারা অন্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নয়, অহংকারী, পরশ্রীপরায়ণ না হয়ে সকল ধর্মের অনুসরণকারী হবে। সেখানে খুব বেশি করে বেদধ্বনি, যজ্ঞের পূর্ণাহুতি এবং বড় বড় দক্ষিণাসহ অনেক যজ্ঞ হতে থাকবে। সেখানে মেঘ থেকে প্রয়োজনানুসারে সর্বদা ভাল বৃষ্টি হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বসুন্ধরা হবে ক্লেশশূন্য এবং প্রচুর খাদ্য উৎপাদনকারী। সেখানে পুষ্টিকর খাদ্য, রসাল ফল, সুগন্ধী পুষ্প এবং শুভ শব্দযুক্ত বাণী থাকবে। যেখানে যুধিষ্ঠির থাকতে পারেন সেখানে সুখ-স্পর্শ বাতাস প্রবাহিত হবে। সেখানকার মানুষদের ধর্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান ছল চাতুরী মুক্ত থাকবে এবং ভয় সেখানে কোনোভাবে প্রবেশ করবার স্থান পাবে না। সেখানে অনেক গরু থাকবে এবং সেগুলি রোগা পাতলা হবে না। সেখানে দুধ, দই এবং ঘি রসময় এবং হিতকারী হবে। সেখানে খাদ্য বস্তু সুস্বাদু ও গুণবর্ধক হবে। যেখানে যুধিষ্ঠির থাকতে পারেন সেই দেশে রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ গুণান্বিত হবে এবং রূপ (দৃশ্য)ও রমণীয় দৃষ্ট হবে। এই ত্রয়োদশ বৎসরের পদার্পণে রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকবেন সেখানে সকল দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) ধর্ম পালনে তৎপর থাকবেন এবং ধর্মও স্বয়ং নিজগুণমণ্ডিত হয়ে থাকবে। হে তাত! যে দেশে পান্ডবেরা রয়েছেন সেখানে সকল মানুষ পরস্পর প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ, সন্তুষ্ট, পবিত্র এবং অকাল মৃত্যু থেকে মুক্ত। সেখানকার লোকেরা দেবতা ও অতিথিদের পূজায় সর্বান্তঃকরণে প্রেমময়, ইষ্ট এবং দানে উৎসাহী এবং নিজ নিজ ধর্মে অটল। যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির থেকে থাকবেন সেখানকার মানুষেরা অশুভ ত্যাগ করে শুভের প্রত্যাশী। যজ্ঞে প্রীতি উৎপাদনকারী এবং শুভ ব্রতকে ধারণ করে থাকে। হে তাত! যেখানে যুধিষ্ঠির আছেন সেখানকার মানুষেরা অসত্য কথা ত্যাগ করেন। শুভ, কল্যাণকর এবং মঙ্গলকারী কাজে যুক্ত, কল্যাণ-প্রত্যাশী এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা নিত্য, পরমসুখ দানকারী শুভ কর্মে তৎপর থাকে। হে তাত! এই রকম যে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সত্য, ধৈর্য, দান, পরাশান্তি, অবিচলিত ক্ষমা, লজ্জা, শ্রী, কীর্তি, মহাতেজ, দয়া, সারল্য প্রভৃতি গুণ নিত্য বিরাজ করে সেই ধর্মরাজকে ব্রাহ্মণেরা যখন চিনতে পারেন না তখন সাধারণ মানুষ কেমন করে চিনতে পারবে!"

অতএব সকলকেই ধর্মপরায়ণ হতে হবে। বিশেষ করে ধর্মাচার্য এবং ধর্মপ্রেমী যাঁদের বলা হয় (যাঁদের মধ্যে এখন অল্পকিছু মহাত্মাদের বাদ দিলে অধিকাংশ লোক স্বার্থে রত) তাঁদের অজ্ঞান-নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে ধর্ম পালনের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হতে হবে এবং পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদী সভ্যতার গোলক ধাঁধা থেকে মুক্ত হয়ে সকলকে প্রেম, বিনয় এবং নম্রতার সঙ্গে ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করে সেই পথে আনার চেষ্টাই করতে হবে।

(৩) ঈশ্বর এবং সংসার

একজন সজ্জন নিম্নলিখিত প্রশ্ন করেছেন—

প্রঃ— বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র তথা অন্যান্য মতের গ্রন্থরাজি দেখলে প্রায়ই বোঝা যায় যে কর্ম অনুসারে জীবাত্মা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। তাই যদি হয় তাহলে সংসার যখন প্রথম সৃষ্ট হয় এবং প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জরে (দেহে) শুদ্ধ, নির্মল, কর্মশূন্য আত্মার প্রবেশ ঘটে, তখন কোন্ কর্ম আত্মার প্রতি প্রযুক্ত ছিল? যদি আত্মার আসা-যাওয়া স্বাভাবিক হয়ে থাকে তাহলে ভক্তির প্রয়োজন কী?

উত্তর—গুণ এবং কর্ম অনুসারেই জীবাত্মা চিরকাল ধরে চুরাশি লক্ষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে আসছে। মানুষ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রকৃতি রচিত যোনিগুলি সৃষ্টির আদিতেই প্রকট হয়েছিল এবং সৃষ্টির অবসানে সেই প্রকৃতির মধ্যেই তেমনভাবে বিলীন হয়ে যায়, যেমনভাবে সোনায় প্রস্তুত নানা রকম অলঙ্কার শেষাবস্থায় সোনাতেই বিলীন হয়ে যায়। তার কারণ হল প্রকৃতি অনাদি। যাকে জীবাত্মা বা ব্যষ্টিচৈতন্য বলা হয়, এই প্রকৃতির সঙ্গে তার অনাদি কাল থেকে সম্বন্ধ চলে আসছে। অবশ্যই এই সম্বন্ধ অনাদি হলেও প্রযত্ন করলে তাকে ত্যাগ করা যায়। এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকেই মুক্তি বলা হয় আর এই মুক্তির জন্য ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনের কথা বলা হয়েছে।

আত্মার আসা যাওয়া এমন স্বাভাবিক নয় যে তার অবসান করার কোনও উপায় নেই। যদি এই কথা বলা হয় যে 'জীবাত্মার আসা-যাওয়া যখন সর্বদা স্বতঃসিদ্ধ তাহলে তাকে সবসময় থাকতেই হবে ; কেননা যে বস্তু অনাদি তা চিরকাল থাকে।' কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। কেননা জীবাত্মার আসা-যাওয়া অজ্ঞান-জনিত। অজ্ঞান অথবা ভুল এমন এক জিনিস যে অনাদি হলেও প্রকৃত জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই কথা সকল বিষয়েই প্রসিদ্ধ। কোনো মানুষের যখন নতুন কোনো বিষয়ে জ্ঞান হয় তখন সেই বিষয়ে তার আগে যে অজ্ঞান ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেই অজ্ঞানতা যথার্থ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তো অনাদিই ছিল, তার প্রারম্ভের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন ঐহিক জ্ঞানের দ্বারা ঐহিক অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় তখন পরমার্থ বিষয়ক

যথার্থ জ্ঞান হলে অনাদিকাল থেকে অবস্থিত অজ্ঞানতার বিনষ্ট হওয়ায় আশ্চর্য কী আছে? বরং তাতে এই বিশেষতাই আছে যে, পরমাত্মা নিত্য হওয়ার কারণে তাঁর জ্ঞানও নিত্য। এই জ্ঞানের জন্যই ভক্তি প্রভৃতি সাধনা করা উচিত।

প্রঃ—প্রথম যখন জগৎ-সংসার সৃষ্ট হয় তখন তাতে কি করে মানুষ, পশু, পাখি, উদ্ভিদ প্রভৃতি আকার (শরীর) সৃষ্ট হয়েছিল? তত্ত্বগুলির পারস্পরিক সংযোগে সবগুলি কি নিজে থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল? একথা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে এখনও তো সেই প্রকৃতি, তত্ত্ব এবং আত্মা রয়েছে, কিন্তু নিজে থেকেই তো কোনো আকার আর গঠিত হচ্ছে না। আর যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে স্বয়ং শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমাত্মা স্থূল শরীর ধারণ করে নিজের হাতে প্রত্যেকটি আকার (শরীর) গঠন করেছেন, তাহলে সাধুরা পরমাত্মাকে নিরাকার কেন বলেছেন? স্ত্রী-পুরুষের মিলন ব্যতীত স্থূল শরীর গঠিত হওয়া সম্ভব নয়। যদি কোনো ভাবে গঠিত হয়েও যায় তাহলে সেই একদেশীয় ব্যক্তি সর্বব্যাপী হতে পারে না।

উত্তর—প্রকৃতির প্রারম্ভে সৃষ্ট কোন জগৎ সংসারের কথা মেনে নেওয়া যায় না। প্রারম্ভের কথা মেনে নিলে এটি প্রমাণিত হবে যে প্রথমে সংসার ছিল না। কিন্তু তা নয়। সৃষ্টি-বিনাশরূপ প্রবাহমান সংসার চিরকাল ধরেই আছে, একথা মেনে নেওয়া হয়েছে। যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে, প্রারম্ভ কালে কোনো এক সময়ে সংসারের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে তার দ্বারা সংসারের অনাদিত্ব মিথ্যা হয়ে যাবে। কেবল শাস্ত্রের কথাই নয়, যুক্তির দ্বারাও এটি প্রমাণিত হতে পারে না। আগে থেকে যদি একটিই শুদ্ধ বস্তু থাকত, সংসারের কোনো বীজ না থাকত তাহলে তা কী কারণে, কেমন করে এবং কেন সৃষ্ট হয়েছে? একথা অবশ্যই সত্য যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অলৌকিক জিনিসও ঘটাতে পারেন। কিন্তু বিনা কারণে জীবের কোনো কর্ম না থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর কেন ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি যুক্ত জগৎকে সৃষ্টি করলেন? যদি বিনা কোনো কারণে ঈশ্বর এই ভেদময় সৃষ্টি ঘটিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর মধ্যে বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের দোষ এসে যায়। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে তা থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

যদি এমন কথা বলা হয় যে ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা ছাড়াই কেবল প্রকৃতির দ্বারাই জগতের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে প্রথম কথা হলো এই যে প্রকৃতি জড় বলে তা হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতি যখন প্রথমে শুদ্ধ ছিল তখন আগে কখনও বীজ ও কারণ ছাড়া তার মধ্যে নানা প্রকারের বিকৃতি কী করে দেখা

দিল? প্রকৃতির স্বভাব যদি এমনই হয় তাহলে এর পূর্বেও তার তেমনই হওয়া উচিত ছিল আর যদি আগেও এই রকমই ছিল তাহলে বিকৃতি-প্রকৃতি অর্থাৎ জগৎ অনাদি এইটিই সিদ্ধ হয়। অতএব 'প্রথমে প্রকৃতি শুদ্ধ ছিল, স্বাভাবিকভাবে অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছায় অকারণেই সংসার সৃষ্ট হয়েছে' এমন কথা শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে প্রমাণিত হয় না। এ থেকে এই কথাটিই বুঝে নেওয়া দরকার যে পরমাত্মা, জীব, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য—তাবৎ যোনিসহ সংসারকর্ম এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ—এই সবই অনাদি। এইগুলির মধ্যে প্রকৃতির কর্মরূপ সংসার এবং কর্ম সৃষ্টি-বিনাশের প্রবাহরূপে অনাদি থাকে। এদের কোনো স্থায়ী একটিমাত্র রূপ থাকে না। এইজন্য প্রকৃতির কর্মরূপ সংসার এবং কর্মকে আদি-অন্তবিশিষ্ট, ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য এবং বিনাশশীল বলা হয়। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ অনাদি, তবে তা সান্ত। এই বিষয়ের বিশেষ বর্ণনার জন্য 'কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়' এবং 'ভ্রম অনাদি ও সান্ত' শীর্ষক লেখা দেখা যেতে পারে।

গভীর চিন্তা এবং শাস্ত্র বিচার করলে এইটিই দেখা যায় যে প্রকৃতিও অনাদি এবং সান্ত। বেদান্ত শাস্ত্র প্রকৃতিকে পরমেশ্বরের একটি অংশে আরোপিত বলে মনে করে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে বোধ হয়ে গেলে অনাদি প্রকৃতিও অবিদ্যমান হয়ে যায়। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্র যা খুবই তার্কিক দর্শন এবং যা প্রকৃতি-পুরুষকে অনাদি এবং নিত্য বলে মনে করে সেই দুটিওতো প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে অনাদি এবং সান্ত বলেই মনে করে। এদের সংযোগের অভাবকেই দুঃখের অবিদ্যমানতা বলে মনে করে এবং তাকেই মুক্তি বলে। আর এটিও স্বীকার করে যে জীব মুক্ত অথবা কৃতকৃত্য হয়ে যায়, তারই জন্য প্রকৃতির বিনাশ হয়। প্রকৃতির অবস্থান তাদের কাছেই যাদের কাছে জ্ঞান নেই।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ। (যোগ. ২/২২)

এই দর্শনগুলি একথাও বলেছে যে প্রকৃতি এবং পুরুষের পৃথক পৃথক উপলব্ধি দুইয়ের সংযোগে হয়ে থাকে। এই সংযোগের হেতু হল অজ্ঞান। জ্ঞান হলে সেই আত্মার 'কেবল' অবস্থাই জানা যায়। যদি সকলের মুক্তি হয়ে যায় তাহলে সিদ্ধান্তানুসারেও প্রকৃতির অবিদ্যমানতা সম্ভব। কেননা মুক্ত জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়। অজ্ঞানতার কারণে অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি থাকে। কিন্তু অজ্ঞানীর দৃষ্টির কোন মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীর দৃষ্টিই সত্য। অতএব সকলে জ্ঞানপ্রাপ্ত হলে কোনো দিক থেকেই প্রকৃতির অবস্থান সিদ্ধ

হতে পারে না। এইসব সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এইটিই প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতি এবং জীবের কর্মও অজ্ঞানতার মত অনাদি এবং সান্ত। একমাত্র আত্মাই এই রকম পরম বস্তু যা অনাদি, নিত্য এবং সত্য।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে অনেক পদার্থকে সত্য বলে মানা হয়েছে। কিন্তু অল্প চিন্তা করলেই তাদের তত্ত্ব এবং অবস্থান অলীক বলে বোঝা যায়। যেমন বৃষ্টিতে বালির ভিত ধসে যায় অথবা যেমন স্বপ্নে দেখা অনেক জিনিসের অস্তিত্ব ঘুম ভাঙ্গার পর স্বতন্ত্র রূপে না থেকে একমাত্র দ্রষ্টাই থেকে যায়, তেমনই চিন্তা করলে ভিন্ন ভিন্ন সত্তা অবিদ্যমান হয়ে গিয়ে একমাত্র আত্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় সত্তাকে মান্য করলে স্বভাব অথবা যাকে প্রকৃতি বলা হয় সেটিকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু তার অবস্থান জ্ঞান না থাকা পর্যন্ত। যে স্বপ্ন দেখে তার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে স্বপ্নে দেখা বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার পর স্বপ্নের আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবীর যে অস্তিত্ব থাকে সেই রকম অস্তিত্বই সংসার থেকে জেগে উঠলে আকাশ প্রভৃতির থেকে যায়। অতএব একথা ভেবে দেখা দরকার যে স্বপ্নের আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবীর অনুপরমাণুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন্ মূলধারে অবস্থিত?

এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে আকার অথবা শরীর সৃষ্টি-বিনাশের রূপে অনাদি। এখন এই প্রশ্নটি থেকে যায় যে সৃষ্টির আদিতে এইগুলি প্রথমে কি করে সৃষ্ট হয়েছে? নিজে থেকেই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি নিরাকার পরমেশ্বর সাকার- রূপে প্রকট হয়ে তাদের সৃষ্টি করেছেন? অথবা নিরাকার রূপের দ্বারাই এগুলি সাকার রূপ প্রাপ্ত হয়েছে? যদি নিরাকার ঈশ্বর সাকার হয়ে থাকেন তাহলে তিনি একদেশীয় হয়ে যাওয়ায় সর্বব্যাপী কি করে থাকতে পারেন?

এই প্রশ্নটি এমন কিছু নয় যে তার জন্য খুব বেশী চিন্তা করা দরকার। শান্তভাবে চিন্তা করলে তার সমাধান অনায়াসেই হয়ে যায়। মহাসর্গের আদিতে পরমেশ্বর রূপ পিতা এবং প্রকৃতিরূপ মাতার মিলনেই সকল জীবের গুণ-কর্মানুসারে শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। গীতায় ভগবান বলেছেন—

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিনগর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ (১৪/৩-৪)

'হে অর্জুন! আমার মহৎ ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক মায়া সকল ভূতের যোনি অর্থাৎ গর্ভস্থান এবং আমি সেই যোনিতে চেতনরূপ বীজকে স্থাপন করি। এই জড়-চেতনের মিলনে সর্বভূত সৃষ্ট হয়। হে অর্জুন! নানা প্রকারের যোনিতে যতগুলি মূর্তি অর্থাৎ শরীর সৃষ্ট হয় সেইসবগুলির মা হল ত্রিগুণাত্মক মায়া আর আমি হলাম বীজ স্থাপনকারী পিতা।'

যদি এই কথা জিজ্ঞাসা করা হয় যে আরম্ভের সময় যখন দুটি পদার্থ নিরাকারই ছিল তাহলে এই দুটির সংযোগে স্থূল দেহের সৃষ্টি কি করে হলো? তার উত্তর হলো যেমন আকাশে সূর্যের কিরণে জল নিরাকার রূপে অবস্থান করে অথচ সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম জলই বায়ুর সংঘর্ষে ধূম্ররূপ প্রাপ্ত হয়ে মেঘ হয়ে যায় এবং স্পষ্টরূপে ব্যক্ত জলের রূপ পরিগ্রহ করে অন্তিমে বরফের চাঁই হয়ে যায়, তেমনই এই সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতিতে বিলীয়মান জগৎ-সংসারও প্রকৃতি এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে সংঘর্ষে বরফের চাঁইয়ের মত মূর্তিরূপে প্রকট হয়ে যায়। একথা তো মানতেই হবে যে আকাশে বরফের চাঁই নেই, থাকলে সেখানে তা অবস্থান করতে পারত না। আকাশের আকারহীন অবস্থাও স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু দেখতে দেখতেই নির্মল আকাশে মেঘের উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞানের আলোকে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে সূর্যের কিরণে অবস্থিত নিরাকার পরমাণুরূপ জলই মেঘ এবং স্থূল জলের রূপ পরিগ্রহ করে। অনুরূপভাবে আকাশে নিরাকার রূপে অবস্থিত আগুনও কখনো কখনো মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের রূপে চমকায়। কোথাও যদি বজ্র হয়ে পড়ে তো সেই জায়গাটিকে পুড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। যখন আগুন এবং জলের মতো স্থূল পদার্থও নিরাকার থেকে সাকারে পরিণত হতে পারে তখন নিরাকার ঈশ্বর এবং প্রকৃতির সংযোগে নিরাকার জগৎ সংসারের সাকার রূপ পরিগ্রহ করা এমন কী বড় কথা?

এটিও বুঝে নেওয়ার বিষয় যে কোনো সাকার বস্তু যেখানে উৎপন্ন হয় তার লয়ও হয় সেইখানেই। বায়ুর দ্বারা নির্মল নিরাকার আকাশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আবার সেই আকাশেই শান্ত হয়ে যায়। তেজের সঙ্গে সংঘর্ষে জলের সৃষ্টি, ঠাণ্ডায় তা বরফ হয়ে যায়। আবার সেই জলকে গরম করলে দ্রবীভূত হয়ে বাষ্পরূপে পরিণত হয়ে শেষপর্যন্ত আকাশে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে। এইভাবে জীবের শরীরও সৃষ্টির আদিতে গুণকর্মানুসারে প্রকৃতিতেই সৃষ্ট হয় এবং অন্তিমে সেইখানেই বিলীন হয়ে যায়। এই আদি-অন্তের প্রবাহ অনাদি।

প্রকৃতির রূপ কখনও সক্রিয় হয় আবার কখনও হয় অক্রিয়। এইটি তার স্বভাব। যখন সত্ত্ব, রজ, তম তিনটি গুণ সাম্যাবস্থায় স্থিত থাকে তখন এই গুণাত্মক প্রকৃতি অক্রিয়রূপে থাকে আর যখন তিনটি গুণই বিষম অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তখন প্রকৃতির রূপ সক্রিয় হয়ে যায়। সক্রিয় প্রকৃতি ঈশ্বরের সম্বন্ধের দ্বারা গর্ভস্থ জীবকে মূর্ত রূপে প্রকট করে।

ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।। (গীতা ৯/১০)

'হে অর্জুন! আমার অধিষ্ঠানবশতঃই আমার মায়া চরাচরসহ সমগ্র জগতকে রচনা করে এবং এই হেতুতেই এই জগৎ আগমন-গমন রূপ চক্রে ঘূর্ণিত হতে থাকে।'

পরমেশ্বর নিরাকার থেকেও সাকার রূপ ধারণ করে কিভাবে সর্বব্যাপী থাকেন সেই কথা বোঝাবার জন্য আগুনের উদাহরণ সামনে রাখতে হবে। এই নিরাকার আগুন সর্বত্র ব্যাপ্ত। তা আমাদের দেহের ভিতরে আছে এবং আমাদের গৃহীত খাদ্যকে হজম করায়। আগুন না থাকলে খাদ্য হজম হতো না আর তা যদি ব্যক্ত হতো তাহলে তা দেহকে ভস্মীভূত করে দিত। তাতে প্রমাণিত হয় যে আমাদের ভিতরে অব্যক্ত আগুন আছে। এই সর্বব্যাপী নিরাকার অব্যক্ত আগুন ইন্ধন এবং সংঘর্ষের ফলে সাকার হয়ে যায়। আগুন যখন সাকার রূপ ধারণ না করে তখন তা কাষ্ঠাদিতে নিরাকাররূপে বর্তমান থাকে। না থাকলে তা সংঘর্ষের ফলে প্রকট হোত কি করে? আবার সেই আগুনই যখন নিভিয়ে দেওয়া হয় তখন তা আবার নিরাকাররূপে পরিণত হয়ে যায়। যখন তা শিখারূপে একটি স্থানে প্রকট হয় তখন কেউই একথা বলতে পারে না যে, আগুন যখন এখানে প্রকটিত হয়েছে তখন তা আর অন্যান্য স্থানে নেই। এটি নিশ্চিত যে এক অথবা একাধিক স্থানে একই সঙ্গে আগুন প্রকটিত হলেও নিরাকার আগুন ব্যাপকরূপে সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। অনুরূপভাবে পরমাত্মাও মায়ার সম্বন্ধে এক অথবা অনেক স্থানে প্রকট হলেও সেই একই সময়ে তিনি নিরাকার ব্যাপক রূপে সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন। তাঁর সর্বব্যাপকতা এবং পূর্ণতার মধ্যে কখনও কোনরকম ন্যূনতা থাকে না। আগুনের দৃষ্টান্তও কেবল বোঝাবার জন্য দেওয়া হলো। বাস্তবে পরমাত্মার সর্বব্যাপকতার সঙ্গে আগুনের সর্বব্যাপকতার কোনো রকম তুলনা হতে পারে না।

প্রঃ—ঈশ্বর প্রকৃতি এবং সংসার সৃষ্টি করেছেন। এতে তাঁর কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর—প্রকৃতিকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি। প্রকৃতি সেই জিনিসেরই নাম যা চিরদিন ধরেই স্বাভাবিক। চরাচর জগৎকে অবশ্যই ভগবান সৃষ্টি করেছেন। এই কাজকে সেই ন্যায়াকারী, সর্বব্যাপী, দয়াময়, পরমাত্মার অহেতুক দয়া বলেই মনে করা উচিত। জীবের পূর্ব জন্মে যে রকম গুণ এবং কর্ম ছিল সেই গুণ-কর্মানুসারে ভগবান তাদের দেহবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেন। স্বার্থ, আসক্তি এবং অহৈতুক ন্যায়কারী হওয়ার কারণে জীবের গুণ-কর্মানুসারে সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ভগবানকে অকর্তা বলেই মনে করা হয়। কিন্তু জীবের যাতে দুঃখ দূর হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি জীবকে তার সীমার মধ্যে যতটুকু সদয় বিধান পেতে পারে তা সতত দিয়ে থাকেন। এমনকি কখনও কখনও নিজের প্রকৃতিকে বশ করে তিনি সগুণ সাকার রূপে আত্মপ্রকাশ করে জীবের কল্যাণে সচেষ্ট হন। এই রকম অকারণ দয়ালু এবং পরম সুহৃদ পরমাত্মার ভজনা করা জীব মাত্রের কর্তব্য।

(৪) ঈশ্বর এবং পরলোক

ঈশ্বর, মায়া, জীব, সৃষ্টি, কর্ম, মোক্ষ, পরলোক প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকজন বন্ধুর মনে প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলি খুবই গভীর এবং তাত্ত্বিক। এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর তো পরমেশ্বরই জানেন এবং যে মহাপুরুষেরা শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁরাও জানেন। আমার মতো মানুষের পক্ষে তো এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। তবু বন্ধুদের অনুরোধে নিজের সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করছি। বিজ্ঞজনেরা ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

প্র. — ঈশ্বর আছেন, না নেই?

উ. — ঈশ্বর অবশ্যই আছেন।

প্র. — ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কী?

উ. — ঈশ্বর স্বতঃই প্রমাণ। তার জন্য অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সকল প্রমাণের সিদ্ধিও তাঁরই সত্তায় প্রমাণিত হয়। তোমার প্রশ্নই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কেননা যা নেই সে সম্পর্কে তো প্রশ্ন হতে পারে না। যেমন 'বন্ধ্যার সন্তান আছে, না নেই'—এমন প্রশ্ন হতেই পারে না।

প্র. — সন্দেহবশতও তো প্রশ্ন হতে পারে। আমার মনে সংশয় আছে। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ আপনি দিন।

উ. — যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্বেই আমাদের সকলের অস্তিত্ব, তবুও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করার প্রয়াস বালকোচিত ব্যাপার। তা সত্ত্বেও সন্দেহাকুল মানুষের শঙ্কা নিরসনের জন্য শ্রুতি-স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জলে-স্থলে ঘোষিত করছে। যেগুলির উৎপত্তি ঈশ্বরকে জানার জন্যই। যথা—

'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ' (গীতা ১৫/১৫)
'ঈশাবাস্যমিদ ँ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'
(যজুর্বেদ ৪০/১)
'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' (যোগ ১/১০)
'আত্মা দ্বিবিধ আত্মা পরমাত্মা চ' (তর্কসংগ্রহ)

প্রমাণের বিশেষ বিস্তার 'কল্যাণ'-এর 'ঈশ্বরাঙ্ক'-তে দেখা যেতে পারে।

প্র. — আপনি কি যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন?

উ. — যদিও যে ঈশ্বরের দ্বারাই সকল যুক্তির সিদ্ধি হয়ে থাকে সেই ঈশ্বরকেই যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা অনধিকার চেষ্টা, তবু সংশয়াকুল এবং নাস্তিকদের বোঝবার জন্য বিভিন্ন সজ্জন 'কল্যাণ'-এর ঈশ্বরাঙ্কে এবং তার পরিশিষ্টাঙ্কে অনেক রকমের যুক্তি উত্থাপিত করেছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি পদার্থগুলির সৃষ্টি এবং নানাপ্রকার যোনির মধ্যে বিভিন্ন রকম অদ্ভুত জিনিসের জন্ম ও তাদের নিয়মিত সঞ্চালন ক্রিয়া লক্ষ্য করলে এটা প্রমাণিত হয় যে কর্তা ছাড়া সৃষ্টি এবং সঞ্চালক ছাড়া নিয়মিত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। যিনি এগুলির সৃষ্টি ও পালন করেন তিনিই ঈশ্বর। জীবের সুখ, দুঃখ, জাতি, আয়ু, স্বভাবের পার্থক্যজনিত গুণও কর্মানুসারে বিভাজন করা জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত জড় প্রকৃতির দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। কেননা সৃষ্টির প্রত্যেক কাজে সর্বত্র প্রয়োজন দেখা যায়। এরকম প্রয়োজনসঙ্কুল সৃষ্টির রচনা এবং বিভাগ নির্ণয় করা কোনো পরম চৈতন্যময় কর্তা ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

প্র. — ঈশ্বরের স্বরূপ কেমন?

উ. — ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সকল গুণান্বিত, নির্বিকার, অনন্ত, নিত্য, বিজ্ঞান-আনন্দঘন।

প্র. — ঈশ্বর সগুণ, না নির্গুণ?

উ. — সেই চিন্ময় পরমাত্মা সগুণ আবার নির্গুণও। এই ত্রিগুণাত্মক সমগ্র সংসার সেই পরমাত্মার কোনো একটি অংশে অবস্থিত। যে অংশে এই সংসার অবস্থিত সেই অংশের নাম সগুণ, আর সংসার বিমুক্ত অনন্ত অসীম যে নিত্য বিজ্ঞান আনন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপ তার নাম নির্গুণ। সগুণ এবং নির্গুণ দুটির সম্মিলিত সমগ্রতাকেই ঈশ্বর বলা হয়েছে।

প্র. — সেই সগুণ ঈশ্বর নিরাকার, না সাকার?

উ. — তিনি সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। নিরাকাররূপে ব্যাপ্ত আগুন যেমন সংঘর্ষজনিত সাধনগুলির দ্বারা সাধকের কাছে প্রকট হয়ে যায় তেমনই সর্বান্তর্যামী দয়ালু পরমাত্মা নিরাকাররূপে সমগ্র চরাচরে ভূত-প্রাণীদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং ধর্মকে স্থাপনা করবার জন্য ও জীবকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ভক্তের ভাবানুসারে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি সাধনাগুলির দ্বারা

কখনও সখনও সাকাররূপে প্রকটিত হন। যেখানে ভগবান সাকাররূপে প্রকট হন সেখানে একথা মনে করা ঠিক নয় যে তিনি সেখানেই সীমাবদ্ধ ; বরং একথাই মনে করতে হবে যে তিনি সগুণ ও নির্গুণ রূপে সর্বত্র অবস্থিত রয়েছেন অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন সমগ্র ব্রহ্মই সগুণ-সাকার-স্বরূপে প্রকট হয়ে থাকেন। এই সগুণ পরমাত্মা সৃষ্টির উৎপত্তি, পালন এবং বিনাশকালে সদা সর্বদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে বিরাজ করেন।

প্র. — মায়া কাকে বলে?

উ. — ঈশ্বরের শক্তির নাম মায়া। একে প্রকৃতিও বলা হয়।

প্র. — প্রকৃতির স্বরূপ কী?

উ. — যা অনাদি (প্রাকৃত), কারও থেকে যার উৎপত্তি হয়নি এবং যা অন্য সব কিছুর উৎপত্তির কারণ তাকেই প্রকৃতি বলা হয়।

প্র. — এই মায়া স্বতন্ত্র, না পরতন্ত্র?

উ. — পরতন্ত্র।

প্র. — কার পরতন্ত্র?

উ. — ঈশ্বরের।

প্র. — এই মায়া কি অনাদি-অন্ত, নাকি অনাদি-সান্ত?

উ. — অনাদি-সান্ত।

প্র. — যে বস্তু অনাদি তা তো অনন্তই হওয়া উচিত?

উ. — এমন কোনো নিয়ম নেই।

প্র. — একটা উদাহরণ দিন যা অনাদি হয়েও সান্ত।

উ. — সূর্য-চন্দ্রাদি সকল দৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্থাৎ তাদের না জানা হলো অনাদি। কিন্তু মানুষ যে সময় যে বস্তুকে যথার্থ বলে জেনে যায় সেই সময় সেই বস্তুর সম্পর্কে তার অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। এইভাবে এই মায়াও অজ্ঞতার মতো অনাদি-সান্ত।

প্র. — এই মায়া সৎ, না অসৎ?

উ. — সৎ এবং অসৎ দুই-ই। অনাদি হওয়ায় সৎ এবং সান্ত হওয়ায় অসৎ। আসলে একে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না, কেননা তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা সান্ত হয়ে যাওয়ায় একে সৎ বলা যায় না এবং চিরকাল ধরে প্রতীতি চলে আসছে বলে একে অসৎও বলা যায় না। এইজন্য মায়াকে সৎ-অসৎ দুটি থেকেই স্বতন্ত্র এবং অনির্বচনীয় বলা হয়েছে।

প্র. — মায়া জড় না চেতন?

উ. — জড়, কেননা যে বস্তু দৃশ্যমান এবং যার বিকার হয় তা তো জড়ই।

প্র. — মায়ার স্বরূপ কী?

উ. — যা কিছু দৃশ্যমান, শ্রবণীয় এবং বোদ্ধ সেগুলি সবই মায়ার কারণ। তাই সেগুলিই মায়ার স্বরূপ।

প্র. — মায়া কত রকমের হয়?

উ. — দু রকমের, বিদ্যা এবং অবিদ্যা।

প্র. — বিদ্যা কাকে বলা হয়?

উ. — বিদ্যা তাকেই বলা হয় যার দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি রচনা করেন এবং গুণকর্মানুসারে যথযোগ্য উচ্চ-নীচ যোনির বিভাগ করেন আর সাকার রূপে প্রকট হয়ে বিদ্যার দ্বারা ধর্ম স্থাপনা করে জীবকে উদ্ধার করেন।

প্র. — অবিদ্যা কাকে বলা হয়?

উ. — অজ্ঞানতাকে বলা হয়। এর দ্বারা সকল জীব মোহিত হচ্ছে অর্থাৎ নিজেদের স্বরূপ ও কর্তব্যকে ভুলে যাচ্ছে।

প্র. — জীবের স্বরূপ কী?

উ. — জীব নিত্য আনন্দ চৈতন্যময় (দ্রষ্টা) এবং ঈশ্বরের অংশ। প্রকৃতি এবং তার কর্ম থেকে ভিন্ন ও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়ায় প্রকৃতির সম্বন্ধে কর্তা এবং ভোক্তাও। (দেখুন গীতা, অধ্যায় ১৩, শ্লোক ২০, ২১)

প্র. — জীব ঈশ্বরের কী ধরনের অংশ?

উ. — বাস্তবে পৃথিবীতে এর সমতুল্য কোনো উদাহরণ নেই। যদি সূর্যের প্রতিবিম্বের মতো জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হয় তবে তা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেননা সূর্যমণ্ডল জড় আর তার প্রতিবিম্বটি কোনো বস্তু নয়। কিন্তু জীবাত্মা তো প্রকৃতপক্ষে নিত্য এবং চৈতন্যময়। যদি ঘটাকাশ এবং মহাকাশের উদাহরণ দেওয়া হয় তাও সমীচীন হবে না। কেননা আকাশ তো জড় আর ঈশ্বর চেতন। যদি স্বপ্নে দেখা জীবের উদাহরণ দেওয়া হয় তবে তাও সম্পূর্ণ সমীচীন হবে না। কেননা স্বপ্নে দেখা জিনিসের উৎপত্তি স্বপ্ন যে দেখে তার মোহ থেকে হয়, আর সেই মানুষ সেই মোহের অধীন থাকে। কিন্তু ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং অভ্রান্ত। উপরে উল্লেখিত উদাহরণগুলি অপেক্ষা যোগীর সৃষ্টির উদাহরণ সর্বোত্তম। কেননা যোগী তাঁর যোগশক্তির দ্বারা নিজের সৃষ্টিকে রচনা করতে পারেন এবং

তাঁর সৃষ্টিতে রচিত সকল জীব তাঁর অংশ এবং অধীনও। এইভাবে জীবকে ঈশ্বরের অংশ বুঝতে হবে।

প্র. — সৃষ্টির উৎপত্তি কি করে হয়ে থাকে?

উ. — শাস্ত্রে তার বর্ণনা আছে।

প্র. — শাস্ত্রে তো অনেক রকমের বর্ণনা আছে।

উ. — বিচার করে দেখলে সবগুলির পরিণাম মোটামুটি একই রকম বলে মনে হবে।

প্র. — মহাসর্গের প্রারম্ভে সৃষ্টির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? সংক্ষেপে এর বর্ণনা করুন।

উ. — মহাসর্গের আদিতে সর্বব্যাপী বিজ্ঞানানন্দঘন নিরাকার পরমাত্মার মধ্যে সৃষ্টিকে রচনা করবার জন্য একটি স্বাভাবিক উদ্রেক হয়েছিল 'এক আমি বহু রূপ হব'। তখন তাঁর শক্তিরূপ প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য দেখা দেয় ; অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থার মধ্যে অল্পবিস্তর তারতম্য এসে যায়। তাতে মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার থেকে মন এবং পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই মহাভূতগুলিকে যোগ এবং সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে তন্মাত্রা নাম দেওয়া হয়েছে। বৈশেষিক এবং ন্যায়শাস্ত্রে এদের পরমাণু মনে করা হয়। উপনিষদগুলিতে এদের 'অর্থ' নাম দেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু এগুলি ইন্দ্রিয়ের কারণ তাই এদের ইন্দ্রিয়ের অতীত বলা হয়েছে। গীতায় এই পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূতদের মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারসহ অপরা প্রকৃতি নাম দেওয়া হয়েছে। মূল প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই আটটি পদার্থের দ্বারাই সংসারের সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য এদের প্রকৃতিও বলা যায়। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে মনকে প্রকৃতি মনে করা হয়নি।

প্র. — সূক্ষ্ম মহাভূতগুলির উৎপত্তির ক্রম জানান।

উ. — সমষ্টিগত অহঙ্কার থেকে সূক্ষ্ম আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবীর বিষয়গুলির উৎপত্তি হয়েছে।

প্র. — এই আটটি পদার্থে উৎপত্তি হওয়ার পর সৃষ্টির উৎপত্তি কি করে হলো?

উ. — আকাশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম মহাভূতগুলি থেকে অর্থাৎ তন্মাত্রাগুলি থেকে শ্রোত্র (কর্ণ), চর্ম, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ — এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পর্যায়ক্রমে

উৎপত্তি হয়েছে। তারপর সেই পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূতগুলি থেকে বাক, হস্ত, পদ, লিঙ্গ, গুহ্য — ক্রমশঃ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়েছে। উপরে বর্ণিত আঠারটি তত্ত্বের মধ্যে অহঙ্কারকে বুদ্ধির অন্তর্গত মেনে নিয়ে বাকি সতেরটি তত্ত্বসমূহকে সমষ্টিগত সূক্ষ্ম-শরীর বলা হয়। যিনি এর অধিষ্ঠাতা তাঁকে হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা এবং ব্রহ্মা বলা হয়। সেই হিরণ্যগর্ভের দ্বারা তাঁর সমষ্টিগত অব্যক্ত শরীর থেকে জীবের গুণ ও কর্মানুসারে সমগ্র স্থূল লোক এবং স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয়েছে।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।।
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।।

(গীতা ৮।১৮-১৯)

'হে অর্জুন! সমগ্র দৃশ্যমান ভূতগুলি ব্রহ্মার দিনের প্রবেশকালে অব্যক্ত দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীর থেকে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মা যখন রাত্রিতে প্রবেশ করেন তখন সেই অব্যক্ত নামক ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীর লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই প্রকৃতির বশীভূত ভূত সমুদয়-ই উৎপন্ন হয়ে রাত্রির প্রবেশকালে লয় প্রাপ্ত হতে থাকে। আবার দিনের প্রবেশকালে উৎপন্ন হতে থাকে।'

কোনো কোনো আচার্য পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূতকে ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্গত বলে মনে করে পঞ্চপ্রাণকে শরীরের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কিন্তু পঞ্চপ্রাণকে বায়ুর অন্তর্গত বলেও মেনে নেওয়া যেতে পারে।

প্র. — কর্ম কত রকমের হয়?

উ. — তিন রকমের — সঞ্চিত, ভাগ্য (প্রারব্ধ) এবং ক্রিয়মাণ।

প্র. — এই তিন প্রকারের স্বরূপ জানান।

উ. — (১) বহু জন্ম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সম্পাদিত সুকৃতি-দুষ্কৃতিরূপ কর্মগুলির সংস্কারসমূহ—যেগুলি হৃদয়ে সংগৃহীত হয়ে আছে সেইগুলিকে সঞ্চিত বলে।

(২) পাপ-পুণ্য সঞ্চয়ের কিছু অংশ যা কোনো একটি জন্মে সুখ-দুঃখ রূপ ফল ভোগের নিমিত্ত সম্মুখস্থ হয় তার নাম ভাগ্য কর্ম (প্রারব্ধ কর্ম)।

(৩) নিজের ইচ্ছায় যে শুভাশুভ নতুন কর্ম করা হয় তাকে ক্রিয়মাণ কর্ম বলে।

প্র. — মোক্ষ কাকে বলা হয়?

উ. — সকল দুঃখ ও ক্লেশ* থেকে এবং সকল কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মায় স্থিত হওয়ার নাম মোক্ষ।

প্র. — মুক্ত পুরুষের কি পুনর্জন্ম হয়?

উ. — না।

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

(গীতা ১৪/২)

'হে অর্জুন! সেই পুরুষের সৃষ্টির শুরুতে পুনর্জন্ম হয় না এবং প্রলয় কালেও তিনি ব্যাকুল হন না।'

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

(গীতা ৮/১৬)

'হে কুন্তিপুত্র অর্জুন! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে।।

(ছান্দোগ. ৪/১৫/১)

'সেই মুক্ত পুরুষ আবার ফিরে আসেন না, আবার ফিরে আসেন না।'

প্র. — নতুন জীব উৎপন্ন হয়, না হয় না?

উ. — না। কেননা বিনা কারণে জীবের নতুন সৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্র. — এমন কথা মেনে নিলে তো জীবের সংখ্যা কমে যাবে।

উ. — হোক, তাতে কিসের আপত্তি?

প্র. — এই যুক্তিতে তো সকলের মুক্তি সম্ভব।

উ. — ঠিক আছে, তবে কেবল মানুষই মোক্ষের অধিকারী। মানুষের মধ্যেও লক্ষ কোটি জনের মধ্যে কোনও এক জনেরই মুক্তি হয়। ভগবান বলেছেন—

---

* 'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।'

(যোগসূত্র ২/৩)

অর্থাৎ অজ্ঞান, অহংতা-ভাব (চিৎ-জড়গ্রন্থি), রাগ, দ্বেষ এবং মরণভয় — এই পাঁচটি হলো ক্লেশ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।

(গীতা ৭/৩)

'হে অর্জুন! হাজার হাজার মানুষের মধ্যে যারা আমাকে লাভ করবার জন্য যত্নবান হন সেই যত্নশীল যোগীদের মধ্যে কোনো একজনই আমার প্রতি অত্যাসক্ত হয়ে আমাকে তত্ত্বগতভাবে জানে অর্থাৎ যথার্থ মর্মের সঙ্গে জানে।' এজন্য সকলের মুক্ত হয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

প্র. — অসম্ভবের মতো হলেও এই যুক্তিতে কোনো না কোনো দিন সকলের মুক্তি তো হতে পারেই। কেননা এতে তো কোনো বাধা নেই।

উ. — বাধার কি প্রয়োজন? আর উচিতও নয়। কেননা সকলের সমান অধিকার।

প্র. — তাহলে তো একদিন সৃষ্টির অবসান হয়ে যেতে পারে?

উ. — এমন হওয়াও প্রায় অসম্ভব, কেননা জীব অসংখ্য। তবুও সকল জীবের যদি মোক্ষপ্রাপ্তি হয়েও যায় তাতে আপত্তি কিসের?

প্র. — এইটিই যদি ন্যায্য হয় তাহলে এর আগে থেকেই সৃষ্টির অবসান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

উ. — না হয়ে থাকলেও সিদ্ধান্তে ক্ষতি কী হয়েছে?

প্র. — এই সিদ্ধান্তানুসারে সৃষ্টির অবসান তো হতে পারত।

উ. — বেশ, যদি হয়ে যায় তো খুব ভাল কথা। এইজন্য সব মহান্ পুরুষগণ সকলের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ।।

'সকলেই সুখী এবং নীরোগ হোক, সকলে যেন কল্যাণ বোধ করে ; কোনো লোকই যেন দুঃখের ভাগী না হয়। অর্থাৎ কেউ যেন দুঃখী না হয়।'

প্র. — মুক্তি প্রাপ্ত জীবেরা ফিরে আসে এই কথা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে ক্ষতি কী?

উ. — এই কথা যিনি মানেন তাঁর নিত্যমুক্তি হয় না। কেননা ফিরে আসার ভাবনা থাকলে সাধক চিরকালের জন্য মুক্ত হতে পারেন না।

প্র. — মুক্তি কত রকমের হয়?

উ. — দু রকমের। এক সদ্যমুক্তি এবং দুই ক্রমমুক্তি। বিজ্ঞান-আনন্দঘন ব্রহ্মে তদ্রূপ হয়ে যাওয়া হলো সদ্যমুক্তি আর অর্চি-মার্গের দ্বারা পরমাত্মার ধামে প্রবেশ হলো ক্রমমুক্তি।

প্র. — ক্রমমুক্তি কত রকমের?

উ. — চার রকমের। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য।

(ক) নিত্যধামে গিয়ে বসবাস করা হলো সালোক্যমুক্তি।

(খ) সগুণ ভগবানের সমীপে থাকা হলো সামীপ্যমুক্তি।

(গ) ভগবান সদৃশ স্বরূপ ধারণ করে থাকা হলো সারূপ্যমুক্তি।

(ঘ) সগুণ ভগবানে লয় হয়ে যাওয়া হলো সাযুজ্যমুক্তি।

প্র. — মুক্তির উপায় কী?

উ. — তত্ত্বজ্ঞান।

প্র. — তত্ত্বজ্ঞান কাকে বলে?

উ. — পরমাত্মাকে যথার্থরূপে, তিনি যেমন আছেন তেমনভাবেই তাঁকে জানার নাম তত্ত্বজ্ঞান। গীতায় ভগবান বলেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।

(গীতা ১৮/৫৫)

'হে অর্জুন! সেই পরা ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বগতভাবে ভাল করে জানে যে আমি যেমন এবং যেরকম প্রভাবশীল এবং সেই ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বগতভাবে জেনে তখন তখনই আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।'

প্র. — তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার অনেক সাধনের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে সত্যকার পথ কোনটি?

উ. — সবগুলিই ঠিক।

প্র. — প্রধান প্রধান পথ কয়টি?

উ. — তিনটি উপায় প্রধান। ভক্তিযোগ, সাংখ্যযোগ এবং নিষ্কাম কর্মযোগ। যথা—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।

(গীতা ১৩/২৪)

হে অর্জুন! অনেক মানুষ পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ধ্যানযোগের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা পরমাত্মাকে হৃদয়ে দেখতে পান। আবার অনেকে জ্ঞানযোগের দ্বারা অথবা নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা দেখেন।

প্র. — ভক্তিযোগ কাকে বলে?

উ. — ভগবানের স্বরূপকে নিষ্কাম প্রেমভাবের দ্বারা সদা সর্বদা চিন্তন করার নাম হলো ভক্তিযোগ।

প্র. — এই চিন্তন কি করতে হবে বিজ্ঞান-আনন্দঘন নির্গুণ ব্রহ্মকে, নাকি সগুণের?

উ. — বাস্তবে তো নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তন হতেই পারে না, চিন্তন সগুণেরই হয়। তবে নির্গুণের ভাবনা নিয়ে সেই বিজ্ঞান-আনন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মের যে চিন্তন করা হয় তাকে নির্গুণের চিন্তন বলেই মনে করা হয়।

প্র. — সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান কি সাকারের করা হবে, নাকি নিরাকারের করা হবে?

উ. — তা সাধকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিরাকারের করতে পারেন, সাকারেরও করতে পারেন। তবে নিষ্কাম প্রেমভাবের দ্বারা নিরন্তর করতে থাকাই শীঘ্র লাভদায়ক হয়ে থাকে।

প্র. — সাংখ্যযোগ কিসের নাম?

উ. — মায়ার দ্বারা উৎপন্ন গুণগুলি গুণের মধ্যেই আচরণ করে—এই কথা মনে করে এবং মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের দ্বারা সমস্ত ক্রিয়ায় কর্তৃত্বের অহমিকা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার মধ্যে একইভাবে নিত্য স্থিত হয়ে থাকার নাম হলো সাংখ্যযোগ।

প্র. — নিষ্কাম কর্মযোগের স্বরূপ কী?

উ. — ফল আর আসক্তি ত্যাগ করে ভগবৎ আজ্ঞানুসারে কেবল ভগবানের প্রতি প্রীতি হেতু কর্ম করার নাম হলো নিষ্কাম কর্মযোগ। এটি দু রকমের হয়, এক ভক্তি প্রধান, দ্বিতীয় কর্ম প্রধান।

প্র. — ভক্তি প্রধানের লক্ষণ কী?

উ. — নিষ্কাম প্রেমভাবে সবসময় ভগবানের চিন্তা করতে করতে ভগবানের আজ্ঞানুসারে কেবল ভগবানের প্রীতি হেতু কর্ম করার নামই হলো ভক্তি প্রধান নিষ্কাম কর্মযোগ।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।

(গীতা ১৮/৫৭)

'হে অর্জুন! তুমি সকল কর্ম অন্তরের সঙ্গে আমাকে অর্পণ করে আমার পরায়ণ হয়ে সমত্ব-বুদ্ধিরূপ নিষ্কাম কর্মযোগকে অবলম্বন করে নিরন্তর আমাতে তোমার চিত্তকে নিবিষ্ট কর।

প্র. — কর্মপ্রধানের স্বরূপ কী?

উ. — কর্মপ্রধানেও ভক্তি থাকে, কিন্তু তা সাধারণভাবে থাকে। ফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের আজ্ঞানুসারে সমত্ব বুদ্ধি নিয়ে কর্ম করে যাওয়ার নাম কর্মপ্রধান নিষ্কাম কর্মযোগ।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।

(গীতা ২/৪৮)

'হে ধনঞ্জয়! আসক্তিকে ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যোগে স্থিত হয়ে কর্ম কর। এই সমত্ব ভাবকেই যোগ বলা হয়ে থাকে।'

প্র. — পরলোক আছে, না নেই?

উ. — অবশ্যই আছে।

প্র. — তার প্রমাণ কী?

উ. — শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ বিভিন্ন শাস্ত্র এই কথা ঘোষণা করেছে।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে।।

(কঠোপনিষদ্ ১/২/৬)

'যে ধনের মোহে আত্মহারা হয়, সেইরকম ভ্রান্ত, মূঢ় অবিবেকী মানুষের পরলোকের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। কেবল এই লোকই আছে, পরলোক বলে কিছু নেই—এই কথা যারা মনে করে তারা আমার মৃত্যু-বসে বার বার পতিত হয়, অর্থাৎ তাদের বারংবার জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।

(গীতা ১৪/১৮)

'সত্ত্বগুণে স্থিত পুরুষ স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করেন, আর রজোগুণে স্থিত রাজস পুরুষ মধ্যমে অর্থাৎ মনুষ্যলোকেই থেকে যায় এবং তমোগুণের কার্য নিদ্রা, প্রমাদ এবং আলস্য স্থিত তামস মানুষেরা অধোগতিকে অর্থাৎ কীট, পশু প্রভৃতি নীচ যোনিকে প্রাপ্ত করে।' —এই রকম শ্লোকগুলিতে কর্মানুসারে পরলোক প্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখার কলেবর বৃদ্ধি হবে ভেবে এবং এসব কথা তো প্রসিদ্ধ, সেকথা মনে করে শাস্ত্রের প্রমাণগুলির উল্লেখ করা হলো না।

প্র. — যুক্তি প্রমাণ দিন।

উ. — প্রাণীদের গুণ, কর্ম, স্বভাব, জাতি,আয়ু, সুখ, দুঃখাদি ভোগগুলির পারস্পরিক ভিন্নতা দেখলে ভূত এবং ভবিষ্যৎ জন্মের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(ক) শিশু জন্মেই কাঁদে। পরে কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও ঘুমায়। মা যখন তার মুখে স্তন দেন তখন সে দুধকে টানে এবং ভয়ে তাকে কাঁদতে দেখা যায়। আরও কিছু সে করে। শিশুর এই আচরণ তার পূর্বজন্মের দিকে লক্ষিত। কেননা এই জন্মে তো সে ঐ সব শিক্ষা লাভ করেনি। পূর্বজন্মের অভ্যাস থেকেই এইসব লক্ষণ তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়।

(খ) একই সময়ে কেউ মানুষ, কেউ পশু, কেউ কীট, কেউ পাখি ইত্যাদি যোনিতে জন্মায়। তাদের মধ্যেও গুণ, কর্ম, স্বভাব, আয়ু, সুখ-দুঃখাদির ভোগ সম পরিমাণে দেখা যায় না।

(গ) একই দেশে এবং একই জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছে এমন শিশুদের মধ্যে স্বভাব, আচরণ, আয়ু, সুখ-দুঃখাদি ভোগের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে খুবই ভিন্নতা দেখা যায়। এরকম ভিন্নতা দেখা যায় যমজ শিশুদের মধ্যেও।

— এইসব যুক্তির দ্বারা পূর্বজন্ম প্রমাণিত হয়। আর এই জন্ম পূর্বজন্মের কাছে পরলোক। তাতেই পরলোক প্রমাণিত হয়। যত দিন পর্যন্ত এই কালের মানুষদের জ্ঞান না হচ্ছে তত দিন এই রকম গুণ, কর্ম এবং স্বভাবকে অনুসরণ করে ভাবী জন্ম হতে থাকবে।

প্র. — পরলোককে না মানলে ক্ষতি কী?

উ. — পশুদের চেয়েও বেশি উচ্ছৃঙ্খলতা এসে যাবে এবং উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের মধ্যে মিথ্যা, কপটতা, চুরি, ডাকাতি, হিংসা প্রভৃতি পাপ কাজ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি অবগুণগুলির বৃদ্ধি হয়ে তার পতন হবে। তার পরিণামে তারা ভীষণ দুঃখপ্রাপ্ত হয়।

প্র. — পরলোককে মানলে কী লাভ?

উ. — পরলোক সত্য, আর সত্যকে সত্য বলে মেনে নেওয়াতেই মঙ্গল। কেননা আত্মা নিত্য। শরীরের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। (গীতা ২/২০)। তাই এই জন্মে কৃত শুভাশুভ কাজের ফল পরবর্তী জীবনে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। যখন বাস্তবিকভাবে এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া হবে তখন মানুষ জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা প্রভৃতি ভাল কাজের দ্বারা তথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, প্রভৃতি ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা সকল দুরাচার, দুর্গুণ এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মাকে লাভ করবে। এজন্য পরলোককে অবশ্যই মেনে নেওয়া উচিত।

(৫) ঈশ্বর দয়ালু এবং ন্যায়কারী

সচ্চিদানন্দঘন অখিল বিশ্বেশ্বর পরমদয়ালু পরমেশ্বরের সত্তাকে স্বীকার করেন এমন প্রায় সকল মতের মানুষ এই কথা স্বীকার করবেন যে, ঈশ্বর দয়ালু এবং ন্যায়কারী। ঈশ্বরের মধ্যে কেবল দয়া প্রদর্শন অথবা কেবল ন্যায় করার একাঙ্গী ভাবই নেই, উপরন্তু তাঁর মধ্যে এই দুটি গুণ একই সময়, একই সঙ্গে পূর্ণরূপে থাকে এবং তিনি জীবের সঙ্গে ব্যবহার করার সময় দুটি ভাবকে একই সঙ্গে কার্যকর করেন। এই প্রসঙ্গে কোনো কোনো লোক এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে "ন্যায় এবং দয়া দুটি গুণ একই সঙ্গে কিভাবে থাকতে পারে? আদালতে ন্যায়াসনে বসে বিচারপতি যদি দয়ার বশবর্তী হয়ে দণ্ডযোগ্য অপরাধী ব্যক্তিকে একবারেই দণ্ড না দেন অথবা যা দণ্ড দেওয়া উচিত তার চেয়ে কম দেন তাহলে তাঁর ন্যায় করার কাজে কি বাধা সৃষ্টি হয় না? কিংবা তিনি যদি অপরাধীকে তার প্রাপ্য দণ্ড দেন তাহলে তাঁর দয়া কি একেবারে বেকার হয়ে যায় না? ঈশ্বর সম্পর্কেও এমন কথা কেন ভাবা যাবে না?"

এই সংশয়ের উত্তর দেওয়া সহজ কাজ নয়। পরমাত্মার গুণাগুণ বিচার করা এবং তা নিয়ে টিকা-টিপ্পনি করা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো বালখিল্যতা। কিন্তু নিজের চিত্ত বিনোদনের জন্য পরমাত্মার গুণগান করার ভাবনা নিয়ে তার যৎকিঞ্চিত চেষ্টা করা যেতে পারে। বাস্তবে মানুষের সৃষ্ট আইনের সঙ্গে ঈশ্বরের বিধানের তুলনা করা যেতে পারে না। মানুষ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আইন যদি প্রণয়ন নাও করে তাহলেও তার উপরে পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাব অবশ্যই পড়ে। ভবিষ্যতের দৃষ্টিতেও তাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল বলা যায় না। আসক্তি বা অন্য কোনো কারণে তাতে নানাভাবে ভুল করার অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ভুল করবার লেশমাত্র অবকাশ থাকে না। তাছাড়া ঈশ্বর দয়া, ন্যায় এবং ঔদার্যের অনন্ত নিধি হওয়ার কারণে তাঁর বিধানে দয়া, ন্যায় এবং ঔদার্যের বাহুল্য থাকে। প্রকৃত কথা হলো এই যে জগতকে সত্য বিবেচনাকারী মানুষ স্বার্থশূন্য না হওয়ার কারণে ন্যায়, দয়া এবং ঔদার্যে ভরা আইন প্রণয়ন করতেই পারে না। সর্বপ্রকারে স্বার্থশূন্য,

সকলের সুহৃদ, দয়ার সাগর মহাপুরুষ—যার মধ্যে সহৃদয়তা, দয়া, প্রেম, বাৎসল্য প্রভৃতি গুণাবলীর অন্ত পাওয়া যায় না, তিনি যদি বা সেই রকম আইন প্রণয়ন করতেও পারেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই কাজ করা সম্ভব নয়। তাই যদিও মানুষের প্রণীত আইনের সঙ্গে ঈশ্বরের বিধানের তুলনা হতেই পারে না, তবু চিন্তা করলে মানুষের মধ্যেও একই সঙ্গে দয়া ও ন্যায় থাকতে পারে। তার জন্য কিছু কল্পিত উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

রামলাল নামে একজন লোকের কাছ থেকে নারায়ণপ্রসাদ নামের একজন ব্যবসায়ী দু হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। নারায়ণপ্রসাদ ছিলেন একজন সৎ মানুষ। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধায় পড়ে যাওয়ায় তাঁর সমস্ত রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র, এমনকি স্ত্রীর বিবাহের গহনাও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে এক জায়গায় চাকরী করা শুরু করেছিলেন। এত অল্প টাকায় তাঁর বড় সংসারের কোনো রকমে ভরণ-পোষণ চলত। কিন্তু চতুর্দিকের বেকারীর মধ্যে এর বেশি উপার্জনের সম্ভাবনা ছিল না। রামলাল টাকার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করল। কিন্তু নারায়ণপ্রসাদ কোনোভাবেই টাকা দিতে পারল না। রামলাল আদালতে নালিশ করল। যে বিচারকের কাছে মামলা পড়েছিল তিনি খুবই সৎ, আইনজ্ঞ, ন্যায়কারী এবং দয়ালু ছিলেন। নারায়ণপ্রসাদ বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়ে বলল "হুজুর, আমাকে তো শেঠ রামলালের দু হাজার টাকা ফেরৎ দিতেই হবে এবং মরবার আগেই আমি তা দেব। কিন্তু এখন আমার অবস্থা খুবই খারাপ। আমার বাড়িতে একটি পয়সাও নেই। কোনো সম্পত্তিও নেই। আপনি ভালভাবে খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমি এক জায়গায় মাসে চল্লিশ টাকা মাইনেতে চাকরী করি। বাড়িতে ছেলেপুলে নিয়ে আটজনের সংসার। খুব কষ্টে তাদের প্রতিপালন করি। তাহলেও যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করে আমি রামলালকে বছরে দুশো টাকার কিস্তিতে তার টাকা শোধ করব। এর পরেও যদি রামলাল আমাকে বাধ্য করেন এবং আপনি আমাকে জেলে পাঠান তাহলে আমি জেলে চলে যাব। কিন্তু দেউলিয়া হব না। তবে এই অবস্থায় আমার ছেলেপুলেদের মাথায় বিপদ ভেঙ্গে পড়বে। এখন হুজুরের যা ইচ্ছা তাই করুন।"

নারায়ণপ্রসাদের সত্য কথা শুনে বিচারক প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "ভাই, তুমি তোমার মহাজনকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করাও, তোমার এই রকম অবস্থায় সে নিশ্চয়ই তোমার শর্তে রাজী হয়ে যাবে।"

নারায়ণপ্রসাদ রামলালকে অনেক বোঝাল, অনেক কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু রামলাল বলল— "আমি কোনো কথাই শুনব না।" আদালতে মামলা পেশ করা হলো। নারায়ণপ্রসাদকে দু হাজার টাকা রামলালকে দিতে হবে এটি প্রমাণিত হলো। বিচারক খোঁজ করে জেনেছিলেন যে নারায়ণপ্রসাদ তার নিজের অবস্থা যা জানিয়েছিল তা সর্বৈব সত্য, রামলাল নিজেও তা স্বীকার করেছে। এই অবস্থায় রামলালের আপত্তি সত্ত্বেও বিচারক নারায়ণপ্রসাদের কথানুসারে বছরে ২০০ টাকার কিস্তিতে ২০০০ টাকার ডিগ্রি দেন। বিচারকের দয়া দেখে নারায়ণপ্রসাদ বিহ্বল হয়ে যায়। এই মীমাংসোর ফলে বিচারককে কি অন্যায়কারী বলে মনে করা হবে? তাঁর এই পদক্ষেপকে কি উৎকোচ গ্রহণের ফল বলে মনে করা হবে, একে কি তাঁর দয়া প্রদর্শন বলে মনে করা হবে না? এতে দয়া এবং ন্যায় দুটিই আছে। এখানকার আইনেই যখন এমন হয় তখন শ্রীভগবান তাঁর ভক্তের ইচ্ছানুসারে কোনো মীমাংসা করে দিলে তাতে তাঁর দয়া বা ন্যায়ে কোনো দোষ হবে কি করে?

এবার ফৌজদারী মামলার দুটি দৃষ্টান্ত দেখুন—

গোবিন্দরাম এবং রামপ্রসাদ একই মহল্লায় থাকত। তারা নিজেদের মধ্যে সব সময় তর্ক-বিতর্ক করত। তর্কের মধ্যে মারামারির সম্ভাবনাও থাকে। একদিন পরস্পর শাস্ত্র আলোচনা করার সময় গোবিন্দের ভিন্ন মত শুনে রামপ্রসাদের রাগ হয়ে গেল। ক্রোধে মানুষের বুদ্ধি নাশ হয়। অতএব সে গোবিন্দরামকে দুচার ঘা বসিয়ে দিল। গোবিন্দরাম তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করল। রামপ্রসাদ একথা জানতে পারামাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সব কথা জানিয়ে এল। সে বলেছিল "আমরা ধর্মের বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করছিলাম। গোবিন্দরাম আমাকে ন্যায়সঙ্গত কথাই বলেছিল। কিন্তু আমার ভাবনা তার বিপরীত থাকায় আমার রাগ হয়ে যায়। তার ফলে আমি এই অপরাধ করে ফেলেছি। যা কিছু দোষ তা সবই আমার। এই কাজের জন্য আমার খুবই অনুশোচনা হচ্ছে। এখন আপনি যে আদেশ করবেন আমি তাতেই রাজী।" ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন "ভাই, এখানে আমি কিছু করতে পারি না। তুমি গোবিন্দরামের কাছে যাও। তার কাছে ক্ষমা চাও। সে ইচ্ছা করলে তোমাকে ক্ষমা করতে পারে। তোমার পক্ষে এইটিই সবচেয়ে সহজ উপায়।" ম্যাজিস্ট্রেটের কথা শুনে রামপ্রসাদ গোবিন্দরামের কাছে গিয়েছিল এবং তার পায়ে পড়ে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং বলেছিল

"আমি এখন তোমার চরণাশ্রিত, আমি অবশ্যই অপরাধী, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।" তার কাকুতি-মিনতি শুনে এবং তার মনে সত্যকার অনুশোচনা দেখে গোবিন্দরাম রাজী হয়ে যায় এবং সে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করে। ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্ত মঞ্জুর করে রামপ্রসাদকে নিঃশর্তে মুক্তি দেন। এতে কেউ কি মনে করতে পারে যে গোবিন্দরাম বা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অন্যায় করেছিলেন অথবা তাঁরা দয়া প্রদর্শন করেননি? একবার ভক্ত অম্বরীশের প্রতি দোষ করায় দুর্বাসা মুনিকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুও তাঁকে অম্বরীশের প্রতি শরণাপন্ন হতে বলেছিলেন। সেখানে গেলে অম্বরীশ চক্রের কাছে অনুনয় বিনয় করে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। দয়া এবং ন্যায় দুটি ক্রিয়া একই সঙ্গে সাধিত হয়।

শিবরাম নামে এক ভাল স্বভাবের সদাচারী মানুষ একটি গ্রামে থাকত। সেই গ্রামে একজন ডাকাতের বাড়ি ছিল। শিবরাম কখনও কখনও তার কাছে ডাকাতির গল্প শুনত। কু-সঙ্গের ফল খুব খারাপ হয়। শিবরামের মন একদিন লুব্ধ হলো। লোভ তার বুদ্ধিকে নাশ করল। পরিণামের কথা না ভেবে সে নন্দরাম নামে এক গৃহীর বাড়িতে ডাকাতি করল এবং তিন হাজার টাকা নগদ এবং কিছু গয়না লুট করল। আত্মরক্ষার জন্য প্রহরীকে সে দু-চার ঘা লাঠিও বসিয়ে দিল।

সে টাকা-পয়সা নিয়ে বাড়িতে গেল এবং নিজের স্ত্রীকে সব কথা বলল। শিবরামের স্ত্রী খুবই সাধ্বী রমণী ছিল। স্বামীর এই কুকীর্তি শুনে তার খুব দুঃখ হলো। সে স্বামীর পায়ে পড়ে ধর্মের কথা বলল এবং সেই টাকা তখনই ফেরত দিয়ে আসতে বলল। শিবরাম আসলে ছিল ভাল মানুষ। ডাকাতি করা তার পেশা ছিল না। অসৎ সঙ্গে তার বুদ্ধি নাশ হয়েছিল। স্ত্রীর কথায় তার অপরাধ তার কাছে দীপালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। স্ত্রীর পরামর্শ মত সে তখনই টাকা নিয়ে কালেক্টরের বাংলোয় গেল এবং তাঁকে টাকা ও গয়না দিয়ে আত্মসমর্পণ করে মিনতির সুরে বলল "আমি বড় অপরাধ করেছি। অসৎ সঙ্গে আমার মনে লোভ সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে আমার মতিভ্রম হয়। আমি বেচারা নন্দরামকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছি এবং এমন অপকর্ম করেছি যা আমার বাপ-ঠাকুর্দা কখনও করেননি। আমার অপরাধ কোনোভাবে ক্ষমার যোগ্য নয়। তবু আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি আমাকে বাঁচান। ভবিষ্যতে আমি আর কখনও এমন কুকর্ম করব না।" তার কথা কালেক্টর

বিশ্বাস করলেন। তাঁর মনে হলো যে লোকটার মতলব যদি খারাপ হতো তাহলে সে মাল নিয়ে হাজির হতো না। কালেক্টর লোকটিকে সেখানে আটকে রেখে পুলিশকে দিয়ে নন্দরামকে ডেকে পাঠালেন। নন্দরাম পুলিশের কাছে এত্তেলা করতে যাচ্ছিল। আর তখনই একজন কনস্টেবল তার কাছে এসে বলল "তোমার বাড়িতে যে ডাকাতি করেছে সে বামাল সমেত কালেক্টর সাহেবের বাড়িতে হাজির হয়েছে। সাহেব তোমাকে এখনই ডেকেছেন।" মালপত্র পাওয়া গিয়েছে শুনে নন্দরামের খুব আনন্দ হল আর সে তখনই কনস্টেবলের সঙ্গে সাহেবের বাংলোয় চলে গেল। তাকে দেখে শিবরাম তার পায়ে পড়ল এবং কেঁদে কেঁদে তার অপরাধ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। নন্দরাম তার কোনও কথা শুনল না এবং বলল 'তোকে জেলে না পাঠিয়ে আমি ছাড়ব না।' মামলা কোর্টে গেল, কালেক্টর সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে শিবরাম সেই কথাই বলল যা সে তাঁর বাংলোয় বলেছিল। তখন সাহেব নন্দরামকে জিজ্ঞাসা করলেন 'এর চালচলন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা বল তো।' নন্দরামকে বলতে হলো 'আমি একে চিনি। এ ভাল পরিবারের লোক। ডাকাতদের সংসর্গে এসেই এর দুর্বুদ্ধি হয়ে থাকবে। কিন্তু এর অবশ্যই শাস্তি হওয়া দরকার। তা না হলে এ আবার এই কাজ করবে।' কালেক্টর দয়ালু ছিলেন। তিনি শিবরামের সরলতা ও সত্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে শিবরামকে ছেড়ে দিলেন। এই কাজ করার জন্য কি কালেক্টরকে অন্যায়কারী মনে করা হবে? এইভাবে সৎ ও সরল হৃদয়ে ভগবানের শরণ নিলে তিনিও মুক্ত করে দেন।

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এইসব উদাহরণ তো সাধারণ অপরাধকে নিয়ে। খুনের মামলায় বিপক্ষের লোকেরা রাজী হয়ে গেলেও তো বিচারক অপরাধীকে ছেড়ে দেন না। আর যদি ছেড়ে দেন তাহলে তাঁর কাজকে অন্যায় বলেই মনে করা হয়। এর উত্তর দেওয়ার আগে এটি বোঝা উচিত যে খুন বা মানুষকে হত্যা তিনভাবে করা হয়। ন্যায়ের জন্য, ভুলবশত এবং জেনেশুনে অন্যায়ভাবে। ন্যায়ের জন্য খুনকে তো অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হয় না। নিঃস্বার্থভাবে ধর্মকে রক্ষার জন্য, লোকহিতার্থে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যে নরবধ হয় তাতে হত্যাকারী দণ্ডনীয় হয় না। অপরাধীকে আইনানুযায়ী যে বিচারক মৃত্যুদণ্ড দেন তাঁকে অথবা যে জল্লাদ কোনো অপরাধীকে ফাঁসি দেয় তাকে কেউ অপরাধী মনে করে না।

ডাকাতদের হাত থেকে ধন-প্রাণকে রক্ষা করবার জন্য যে তাকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করে তাকে তো পুরস্কারের পাত্র বলে মনে করা হয়। সম্প্রতি এক বাঙালী যুবতী খারাপ উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকে পড়া এক যুবককে মেরে ফেলে। সে ধরা পড়ে, কিন্তু আদালত তাকে প্রশংসা করে ছেড়ে দেয়। অবশ্য মানুষের বিচারে এমন ভুলও ঘটতে পারে, যার ফলে ন্যায়পরায়ণ মানুষও কখনও কখনও দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সর্বত্র দৃষ্টি আছে যে অন্তর্যামীর তাঁর কখনও এমন ভুল হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকারের খুন ভুলবশত হয়ে থাকে। এইরকম খুনের অপরাধীকে তো দণ্ডনীয় মনে করা হয়। কেননা তার অসতর্কতার জন্যই তো নরহত্যা হয়েছে। কিন্তু তার অপরাধকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অপরাধের তুলনায় খুবই লঘু মনে করা হয়। এমন অপরাধী চেষ্টা করলে মুক্ত হতে পারে, না হলে চেষ্টার ত্রুটির ফলে তার কিছু দণ্ডও হতে পারে।

তৃতীয় প্রকারের হত্যা ক্রোধ, লোভ, শত্রুতা প্রভৃতির কারণে জেনে বুঝে করা হয়। এইরকম অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে সে বিচারালয়ে প্রায়ই দণ্ড থেকে মুক্তি পায় না। এর মধ্যে প্রথমটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। খড়্গবাহাদুর নামক নেপালী যুবক অত্যাচারী হীরালাল আগরওয়ালকে মেরে ফেলেছিল। তার লঘু দণ্ডও হয়েছিল। কিন্তু লোকেদের অনুরোধে ভাইসরয় তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়টির জন্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

রাজপুতানার একটি গ্রামে রামসিংহ নামে এক রাজপুত যুবক জঙ্গলে পাহাড়ের নিচে লক্ষ্যভেদের অভ্যাস করছিল। তার পাশে তার বন্ধু সজন সিংহ দাঁড়িয়েছিল। নিশানায় গুলি ছোঁড়বার জন্য সে বন্দুকে একটু চাপ দিচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি মানুষকে সামনে দিয়ে সে যেতে দেখে। তাকে বাঁচাবার জন্য সে তার হাতটা ঘুরিয়েছিল। ঘোড়াটায় চাপ পড়ে। তাতে গুলি বেরিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়ান সজন সিংহের হৃদয় ভেদ করে চলে যায়। সে ধড়াম করে পড়ে যায়। রামসিংহের চেতনা লুপ্ত হয়। পুলিশ আসে। খুনের অপরাধে রামসিংহকে ধরা হয়। এক তো তার নিজের হাতে বন্ধুকে মেরে ফেলার জন্য দুঃখ এবং দ্বিতীয়ত এই রাজসংকট। তার খুবই দুর্দশা। আদালতে মামলা ওঠে। রামসিংহ সমস্ত ঘটনা যথার্থ বিবৃত করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। হাকিম সজন সিং-এর বাড়ির লোকেদের জিজ্ঞাসা করেন 'আপনারা সত্য বলুন

তো রামসিংহের কোনও দোষ ছিল কিনা? ও যে ভুলের কথা বলছে সে বিষয়ে আপনাদের কী ধারণা?' তাঁরা বলেন 'আমরাও এই কথা বিশ্বাস করি যে তার মনে সজন সিংহকে মারবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। সে এর বন্ধুই ছিল। আমরাও তখন সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এর অসতর্কতার ফলেই সে মারা যায়। অতএব এর দণ্ড পাওয়া উচিত।' হাকিম তার অবস্থা এবং সত্যতা বিশ্বাস করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে তাকে বিনা শর্তে ছেড়ে দেন। এই রকম যিনি দয়া প্রদর্শন করলেন তাঁকে কি অন্যায়কারী বলা যেতে পারে? যখন মানুষ এইরকম দয়া এবং ন্যায়ের আচরণ এক সঙ্গে করতে পারে, তখন শরণাগত হলে ন্যায় রক্ষা করার সময় পরমাত্মা তার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

এই দৃষ্টান্ত থেকে একটি প্রাচীন কাহিনী বা গাথা স্মরণে আসছে। তাতে ভুল বশত অপরাধ করায় একজন পরম ধার্মিক মানুষকেও দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ইতিহাসে রাজা দশরথের কথা আছে। তাঁর হাতে মা-বাবার ভক্ত শ্রবণকুমার মারা গিয়েছিল। এই কাহিনী নিয়ে লোকেরা এই প্রশ্ন করেন যে যখন অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য রাজা দশরথকেও ক্ষমা করা হয়নি, তখন একথা কি করে মেনে নেওয়া যায় যে ভুলবশত কৃত অপরাধ ক্ষমা করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস থেকে যা পাওয়া যায় তা হলো—

রাজা দশরথ একবার হিংস্র পশুদের শিকার করবার জন্য রাত্রে বনে গিয়েছিলেন। এক স্থানে তিনি হাতির গর্জনের মত শব্দ শুনে তীক্ষ্ণ শব্দভেদী বাণ ছুঁড়েছিলেন। সেই মুহূর্তে কারও করুণ আর্তনাদ শোনা গেল "আরে আমার মতো এক নির্দোষ তপস্বীকে বিনা অপরাধে কে মারল? আমি কার কী ক্ষতি করেছি যে আমাকে এইভাবে মারা হলো, এখন আমার বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা কে করবে? তাঁদের খাওয়া-দাওয়া কে করাবে?" এই করুণ কথা শুনে দশরথের মনে খুব কষ্ট হলো, তিনি ব্যথিত হয়ে দৌড়ে নদীর তীরে গিয়ে দেখেন যে এক জটাধারী তপস্বী ঋষি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে। দশরথ ক্ষমা চাইলে ঋষি বলেছিলেন, "আমার অন্ধ মা-বাবা তৃষ্ণার্ত রয়েছেন। আমি তাঁদের জন্য জল নিতে এসেছিলাম। ঘড়া ভর্তি করার সময় শব্দ হয়েছে। তাই শুনে তুমি বাণ মেরেছ। আমার মা-বাবা আমার পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। তুমি গিয়ে তাঁদের এই ঘটনা বলো, তাঁদের প্রসন্ন করো যাতে তাঁরা তোমাকে অভিশাপ না দেন। আমার দেহ থেকে বাণটা বার করে দাও, আমার বড়ই কষ্ট

হচ্ছে। তোমার ব্রহ্ম হত্যার পাপ হবে না, কেননা আমি শ্রবণকুমার নামে বৈশ্য পুত্র।" এতে দশরথ তার দেহ থেকে বাণটা বার করে দেন এবং সেই বাণ বার হতেই শ্রবণের মৃত্যু হয়। রাজা জল নিয়ে শ্রবণের মা-বাবার কাছে যান। তাঁরা ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পায়ের শব্দ শুনে তাঁরা দেরী করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দশরথ নিজের নাম-ঠিকানা জানিয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে সমস্ত কথা জানান এবং তাঁদের জল পান করতে অনুরোধ করেন। বৃদ্ধ দম্পতি মূর্ছিত হয়ে যান। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে বলেন, "রাজা, নিজের এই অশুভ কর্ম তুমি যদি নিজে এসে না বলতে তাহলে তোমার মাথা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই কাজ তুমি ভুল করে করেছ, জেনে বুঝে যদি করতে তাহলে সমস্ত রঘুকুল ধ্বংস হয়ে যেত। এখন আমাদের দুজনকে সেইখানেই নিয়ে যাও।" দশরথ দুজনকে সেখানে নিয়ে যান। তাঁরা ছেলের শরীর স্পর্শ করে সেখানেই পড়ে যান এবং নানাভাবে বিলাপ করতে থাকেন। দুঃখিত ঋষি মরার সময় বলেন, "দশরথ, আজ যেমন আমি পুত্র শোকে মারা যাচ্ছি, তেমনই তোমার মৃত্যুও পুত্র শোকের কারণেই হবে।" এই কথা বলে তাঁরা দুজনে পরলোকে যাত্রা করেন।

তারপর রাজা যজ্ঞ করেন এবং তার ফলস্বরূপ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন নামে তাঁর চার পুত্র হয়েছিল। শ্রীরামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল এবং সেই পুত্র শোকের কারণেই রাজার মৃত্যু হয়েছিল। এই হলো ইতিহাস। এতে রাজা অবশ্যই শাস্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই দণ্ড বাস্তবে খুবই কম ছিল। ছেলে বনবাসী হয়েছিল, শ্রবণের মতো তার চির বিদায় হয়নি। আমার তো মনে হয় যে রাজা যদি বিশেষ চেষ্টা করতেন তাহলে সম্ভবত এই দণ্ডও তাঁকে ভোগ করতে হতো না। রাজার ব্যাকুলতা দেখে শ্রবণ তো নিজে থেকেই তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং মা-বাবাকে বোঝাবার জন্য দশরথকে সেখানে যেতে বলেছিলেন। শ্রবণের মা-বাবারও যদি বিশেষ দয়া হতো তাহলে সেখান থেকেও দশরথ নিঃশর্ত মুক্তি পেয়ে যেতেন। যতটা চেষ্টা তিনি করেছিলেন কাজও ততটাই হয়েছিল। চেষ্টা করাটাও প্রায়শ্চিত্ত। এমন হতে পারে যে রাজা দশরথ সেই সময় পরমেশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনা করতেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় শ্রবণকুমারের বাবার মনে পবিত্রতা ও দয়ার উদ্রেক হতো এবং তিনি দশরথকে ক্ষমা করে দিতেন। যদি এমন হতো তাহলে ঈশ্বরের বিচারে কোনও দোষ হতো না।

কথা হোল, মানুষের দ্বারা যে কোনো অপরাধই করা হোক না কেন, ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তার অনুকূলে প্রায়শ্চিত্ত করলে কোনও রকম শাস্তি ভোগ না করেই পাপের ক্ষমা হয়ে যেতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির দ্বারাও ফলভোগের মতো পাপের বিনাশ হতে পারে। কেননা প্রায়শ্চিত্তও এক রকমের দণ্ডভোগ।

অবশ্য বর্তমানে উল্লেখিত তৃতীয় প্রকারের ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করলে তার জন্য দয়া প্রদর্শন আইনের দ্বারা এমনভাবে স্বীকৃত হবে না যার দৃষ্টান্ত দিয়ে ঈশ্বরের দয়া বোঝান যেতে পারে। কিন্তু এই কথা তো সকলকেই মেনে নিতে হবে যে প্রকৃত ন্যায়কারী প্রজাহিতৈষী রাজার আইন প্রণয়ন এবং সেই আইনানুযায়ী অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। ন্যায়কারী রাজা অপরাধীকে দণ্ড দিয়ে তাকে শিক্ষা দিতে এবং তাকে সংশোধন করতে চান। বিদ্বেষবশত তাকে দুঃখ দিতে এবং অকারণে তাকে হত্যা করতে চান না। বিদ্বেষ ভাবাপন্ন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষেরই কেবল হত্যা করার ইচ্ছা হতে পারে। এসব সত্ত্বেও ন্যায়পরায়ণ রাজার তুলনা ঈশ্বরের সঙ্গে কখনই হতে পারে না। ঈশ্বরের আইন দয়া, সহৃদয়তা এবং জীবের প্রতি কল্যাণকরই হয়ে থাকে। আমরা তাকে কল্পনাও করতে পারি না।

ঈশ্বরের দণ্ডও বর প্রদানের মতো। ঈশ্বরের বিচারে ফরিয়াদী এবং আসামী উভয়েরই পরিণামে হিত এবং উদ্ধার হয়। এইটিই তার বৈশিষ্ট্য। যে অপরাধী পরম কারুণিক পরমাত্মার আইনানুসারে নিজের ভুলকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করে ভবিষ্যতে আর কখনও অপরাধ না করার প্রতিজ্ঞা করে এবং অন্তরের সঙ্গে ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ করে আর ঈশ্বরের কঠিনতম আদেশকে, তাঁর ভীষণতম বিধানকে, তাঁর প্রত্যেকটি বিচারকে সানন্দে স্বীকার করে নেয় ও তাকে পুরস্কার বলে মনে করে এবং সেই সঙ্গে নিজ কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা না চেয়ে দণ্ড গ্রহণে আনন্দিত হয়, সেই রকম সরল চিত্তে সর্বস্ব প্রদানকারী শরণাগত ভক্তকে ভগবান তার অপরাধ থেকে মুক্ত করে তাকে অভয় দান করেন। তাতে দয়ালু ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতাই প্রমাণিত হয়। এইরকম ভাববিশিষ্ট ভক্তকে দণ্ড থেকে মুক্ত করাই পরমাত্মার রাজত্বে দয়া এবং ন্যায্য নিয়ম। এইভাবে ভগবানের মধ্যে দয়া এবং ন্যায় দুটি একই সঙ্গে থাকে।

গীতায় ভগবান স্পষ্টতই বলেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

(৯/৩০-৩১ ; ১৮/৬৬)

'যদি কোনো অতিশয় দুরাচারীও অনন্য চিত্তে আমার ভক্ত হয়ে আমাকে নিরন্তর ভজনা করে তাহলেসে সাধু রূপে মান্য, কেননা সে যথার্থ সিদ্ধান্তকারী। সে ভালভাবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরমেশ্বরকে ভজনা করার তুল্য আর কিছুই নেই।' 'অতএব সে খুব তাড়াতাড়ি ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং চিরশান্তি লাভ করে। হে অর্জুন! তুমি এই অতীব সত্য কথাটি জেনে নাও যে আমার ভক্ত (কখনও) বিনষ্ট হয় না।' 'এইজন্য সকল কর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মা আমাতেই অনন্য চিত্তে শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না।'

(৬) ঈশ্বর-তত্ত্ব

প্র. — সর্বজ্ঞ, সর্বেশ, সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যে ঈশ্বরকে ইঙ্গিত করা হয়, সেই ঈশ্বর কিসের জ্ঞাতা, ঈশ, অন্তর্যামী? তিনি যার জ্ঞাতা, ঈশ প্রভৃতি তার নামরূপ কী? তিনি কি তা থেকে ভিন্ন? না অভিন্ন?

উ. — বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম অনাদি এবং অনন্ত। তাঁর কোনো একটি অংশে ত্রিগুণাত্মক মায়াসহ জড়-চেতনাময় সমগ্র বিশ্ব-সংসার বিদ্যমান। ব্রহ্মের যে অংশে এই সংসার সেই অংশকে সগুণ ব্রহ্ম এবং যে অংশে সংসার নেই সেই অংশকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়। সেই সগুণ ব্রহ্মকেই সর্বজ্ঞ, সর্বেশ, সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়। তিনি এই মায়াসমেত জড়-চেতন সমগ্র সংসারের জ্ঞাতা, ঈশ এবং অন্তর্যামী। তাঁরই সকাশে মন মনন করে, বুদ্ধি সিদ্ধান্ত নেয়, এবং সমগ্র জগৎ সংসার প্রকাশিত হয়। তিনি অনন্ত, অপার, অনাদি, অচল, ধ্রুব, নিত্য, সত্য এবং আনন্দময়।

মায়া জড় এবং বিকারযুক্ত। মায়াকেই প্রকৃতি বলা হয়। এই প্রকৃতি পরমেশ্বরের শক্তি এবং তাঁর অধীন। এঁর দুটি ভাগ—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। যার দ্বারা সৎ-অসৎ সকল পদার্থকে যথার্থরূপে জানা যায় সেই জ্ঞানশক্তির নাম বিদ্যা ; এবং যার দ্বারা আবৃত হয়ে সমস্ত জীব মোহিত হয়ে থাকে তার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যার নাশ উপরোক্ত বিদ্যার দ্বারাই হয়। চব্বিশটি তত্ত্বের দ্বারা বিভক্ত জড় সংসার প্রকৃতিরই বিস্তার অথবা কার্য (বিকার)। মূল প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্রাগুলির উৎপত্তি হয়। আবার অহঙ্কার থেকে মন এবং পঞ্চতন্মাত্রাগুলি থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি স্থূল মহাভূতের উৎপত্তি হয়ে থাকে।* এইভাবে মূল প্রকৃতির সঙ্গে চব্বিশটি তত্ত্বকে মানা হয়েছে।

মায়ার দ্বারা আবৃত ব্যষ্টি-চেতনকে জীব বলা হয়। এই জীব মায়ার সম্বন্ধবদ্ধ হয়ে অনেক এবং অসংখ্য। পরমাত্মার অংশ হওয়াতেও মায়ার সঙ্গে

---

*চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই পাঁচটি হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। হাত, পা, মুখ, গুহ্য এবং লিঙ্গ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এইগুলি পঞ্চতন্মাত্রা। ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এগুলি পঞ্চ মহাভূত।

সম্বন্ধবদ্ধ থাকার কারণে একে জীব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আর মায়ার এই সম্বন্ধ অনাদি এবং সান্ত। সেই মায়ার অবিদ্যা অংশ অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জীব মোহগ্রস্ত থাকে। বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হলে জীব পরমাত্মাকে লাভ করে। আর আগুন যেমন ইন্ধনকে জ্বালিয়ে স্বয়ং শান্ত হয়ে যায় তেমনই অবিদ্যা অথবা অজ্ঞানকে বিনষ্ট করে বিদ্যা বা জ্ঞানও শান্ত হয়ে যায়। তখন মায়া থেকে মুক্ত জীব কেবল অবস্থা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একীভূত হয়ে যায়।

জীবসমূহের দুটি ভাগ আছে, স্থাবর এবং জঙ্গম। দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি চলমান জীবকে জঙ্গম এবং বৃক্ষ, লতা, পর্বত প্রভৃতি স্থির থাকে যেসব জীব, তাদের স্থাবর বলা হয়।

পরমেশ্বর এই জড়-চেতনময় সংসার থেকে ভিন্ন, আবার অভিন্নও। যেমন, হয় পুরুষ থেকে স্বপ্নের সৃষ্টি এবং আকাশ থেকে বায়ুর সৃষ্টি। বায়ুর উৎপত্তি হয় আকাশ থেকে এবং তার আধারও আকাশ। আকাশ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় বায়ু তা থেকে অভিন্ন। আবার আকাশে আকাশ থেকে আলাদা হয়ে থাকে বলে প্রতীত হয়, সেজন্য তা আকাশ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে যে মানুষ স্বপ্ন দেখে তার থেকেই স্বপ্নের সৃষ্টি হয় এবং সেই মানুষই সেই স্বপ্ন-জগতের আধার। মানুষ থেকে সৃষ্ট হওয়ায় স্বপ্ন তার থেকে অভিন্ন এবং স্বপ্ন-কালে তাকে পৃথক মনে হওয়ায় তা মানুষটি থেকে ভিন্ন। এইভাবে সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণ হওয়ায় তা ভিন্ন এবং অভিন্ন দুইই। তিনিই ঈশ, জ্ঞাতা, ব্যাপক এবং অন্তর্যামী। জীবের কাছে স্বপ্ন সৃষ্টি মোহ বশে প্রতীত হয় আর ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতীতি হয় নিজের যোগশক্তি অথবা লীলা থেকে। ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং জীব পরতন্ত্র।

প্র. — আবরণ বা বন্ধন আছে, না নেই? যদি থাকে তাহলে তা কার? এবং তা কি স্বাভাবিক, নাকি আগন্তুক? যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে তার দ্বারা মুক্তি কিভাবে হতে পারে, আগন্তুক হলেই বা কিভাবে হতে পারে? আবরণ কাকে বলে এবং সেই আবরণে কে আচ্ছাদিত?

উ. — আবরণ বা বন্ধন আছে, আবার নেইও। বিশ্ব সংসার যার কাছে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় তার কাছে বন্ধন আছে আর যার কাছে তা মনে হয় না তার বন্ধন নেই। এই বন্ধন স্বাভাবিক নয়, আগন্তুকও নয় কিন্তু তা অনাদি সান্ত। আবরণ বা বন্ধন অজ্ঞান অথবা অবিদ্যাকে বলা হয়। মায়ার দ্বারা মোহিত জীবই এই আবরণে আচ্ছদিত। তাই এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াস

অবশ্যই করতে হবে। বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় হলো তত্ত্বজ্ঞান, যা সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ প্রভৃতি সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

প্র. — পূজা কে করে এবং কাকে করে? ব্রহ্ম দেশ, কাল, নিমিত্তের উর্ধ্বে, না নয়? যদি না হন তাহলে তিনি বদ্ধ, আর যদি হন তাহলে তিনি অসাধ্য। সেই পূজা কেমন এবং তা থেকে কী লাভ?

উ. — পূজা করে জীবেরা আর তা করে পরমেশ্বরকে। ব্রহ্ম দেশ, কাল, নিমিত্তের উর্ধ্বে এবং তার ভিতরেও। কেননা দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি সব কিছু সেই ব্রহ্মের অংশীভূত এবং তাঁর অধীন। অতএব তিনি এগুলির দ্বারা বদ্ধ নন। তাঁর পূজাদি অবশ্যই করা উচিত। পূজার প্রকার দুটি—

(ক) সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সমগ্র চরাচর জীবের আত্মা। এজন্য সমগ্র চরাচরের জীবকে পরমেশ্বরের স্বরূপ মনে করে ফলের আসক্তি ত্যাগ করে, নিষ্কাম প্রেমভাবে, নিজের নিজের বর্ণাশ্রম অনুসারে কর্মের দ্বারা তাঁর সেবা-সৎকার করা হলো সেই সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মের পূজা। ভগবান বলেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।

(গীতা ১৮/৪৬)

'যে পরমাত্মা থেকে সকল ভূতের উৎপত্তি হয়েছে আর যাতে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত রয়েছে সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধিকে লাভ করতে পারে।'

(খ) নিজের নিজের ভাব এবং রুচি অনুসারে সেই সর্বব্যাপী বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মার, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি কোনো একজনের মানসিক অথবা পার্থিব প্রতিমাকে নিমিত্ত করে, সেই পরমেশ্বরের প্রভাবকে উপলব্ধি করে এবং প্রেমভাবে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা তাঁর অর্চনা করা হলো সাকার পরমেশ্বরের পূজা করা। (গীতা ৯/২৬)

এইভাবে পূজা করলে মানুষ এই দুঃখরূপ সংসার-বন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করে।

❀ ❀ ❀

(৭) প্রেমেই পরমাত্মাকে পাওয়া সম্ভব

মানুষ স্বভাববশতঃ দুঃখের প্রতি বিরাগ এবং আনন্দের প্রতি প্রেমের ভাব রাখে। পৃথিবীতে কোনো মানুষই দুঃখ পেতে এবং সুখ থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। কিন্তু ভুলবশতঃ তারা দুঃখজনক বস্তুর মধ্যে সুখের আশা করে তাতে আটকে যায়। শিকারীরা পাখি ধরবার জন্য দানা ছড়ায়। বোকা পাখি সেই দানাকে তাকে ধরবার ফাঁদ না বুঝে তাতেই সুখ বলে মনে করে। আগুনকে রমণীয় এবং সুখকর মনে করে পতঙ্গ তাতে ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরে। এইভাবে আমরাও প্রকৃতির ছড়ান জালকে সুখকর মনে করে তাতে ফেঁসে যাই। যেমন কোনো চালাক পাখি অন্য পাখিকে আটকে যেতে দেখে দানার মোহে আকৃষ্ট হয় না, তেমনই জ্ঞানী পুরুষেরাও এই ভোগসামগ্রীতে আকৃষ্ট হন না। কিন্তু যারা অজ্ঞানী তারা এতে ফেঁসে গিয়ে বারংবার দুঃখে পতিত হয়। স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, শরীরাদি বিষয়ের প্রতি আসক্তির মত বাঘ, সিংহ প্রভৃতি পশুও ততটা দুঃখদায়ী নয়। মোহবশতঃ তারা রমণীয় বলে মনে হয়, কিন্তু পরিণামে তারা দুঃখে পরিপূর্ণ।

এই পদার্থগুলির মধ্যে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। যা স্থায়ী নয় তা শেষে যখন চলে যায় তখন দুঃখ দেয়। এগুলির ভোগের মধ্যেও সুখ নেই। মিষ্টি খাওয়ার সময় প্রথমে ভাল মনে হয়, কিন্তু বেশি ভক্ষণ করলেই অরুচি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে স্ত্রী প্রভৃতিরাও অরুচিকর বলে মনে হতে থাকে। অর্থেও সুখ নেই। মনে করুন কোনো লোকের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা এসে গেল। সে বাড়ি, গাড়ি করে খুব আনন্দে মেতে উঠল। ভাগ্যদোষে তার অর্থনাশ ঘটল। আনন্দের বস্তুগুলি চলে যেতে লাগল। এখন বিগত দিনের কথা মনে পড়লেই তার দুঃখ হয়। অন্য ধনী লোকেদের চলতে ফিরতে এবং আনন্দ করতে দেখলে তার মনে হিংসার উদ্রেক হয়। তেমনই নারী-সম্ভোগাদির ফলে ধাতু ক্ষীণ ইত্যাদির কারণে খুব কষ্ট হয়। তখন মনে হয়, অসুখ সেরে গেলে আর এমন করব না। কিন্তু মোহবশে আবার সেই রাস্তাতেই চলে। এই রকম পরলোকের ভোগও দুঃখরূপ। অর্থ উপার্জন করতে, তাকে রক্ষা করতে,

তাকে কাজে লাগাতে এবং তা খোয়া গেলে কষ্ট হয়। ধন রোজগারেও অন্যায় হয়। মন চায় না, কিন্তু লোভ চাপ দিতে থাকে যে একবার এই রকম কর, তারপর আর করবো না। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, হৃদয়ে যুদ্ধ বেঁধে যায়। সাত্ত্বিকী এবং তামসী বৃত্তিগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দেয়। অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বিড়াল যেমন পায়রাকে কব্জা করে ফেলে তেমনই তামসী বৃত্তি তাকে দাবিয়ে দেয়। খুব কম লোকই এ থেকে বাঁচে। ধনসম্পদ জড়ো করার পর সেগুলিকে রক্ষা করতে খুব কষ্ট হয়। হাতে করে কাউকে কিছু দেওয়া যায় না। এই অবস্থাতেই মৃত্যু এসে যায়। তখন মনে হয় 'হায়! এ আমি কী করলাম। মিছামিছিই অর্থ উপার্জন করেছি। এখন ছেড়ে দিতে হচ্ছে।' এইভাবে দুঃখ সাগরে ডুবে গিয়ে সে মরে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, সংসারের সমস্ত ভোগ হলো মধুর প্রলেপ লাগান বিষের মতো। এ কেবল দেখতেই মনোরম আর এর সুখ হলো মেনে নেওয়া মাত্র। এ কেবল মৃগতৃষ্ণা, এর মধ্যে আনন্দের লেশমাত্র নেই। তাহলে এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কী? প্রকৃত সুখ একমাত্র পরমাত্মাতেই আছে। তিনিই পরম আনন্দস্বরূপ। এই কথাই সাধু, মহাত্মা এবং শাস্ত্র বলেছেন। এই সুখের কাছে ত্রিলোকের রাজত্বও তুচ্ছ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।

(৬/২২)

'যে অবস্থা লাভ করলে অন্য কোনো লাভকে এর চেয়ে বেশি সুখকর বলে মনে হয় না এবং ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ যে অবস্থায় স্থিত হলে যোগী ভীষণ দুঃখেও বিচলিত হন না।'

এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর দেহকেও যদি খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়া হয় তাহলে তিনি বিচলিত হন না। বাড়ি ঘর সবকিছু যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলেও তাঁর আনন্দে কোনো রকম ঘাটতি পড়ে না। তিনি তো পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে স্বয়ং পরমানন্দ হয়ে যান। তাঁর কোনো জিনিসেরই প্রয়োজন হয় না।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

(গীতা ২/৪৬)

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় পেয়ে গেলে যেমন কুয়ার আর প্রয়োজন থাকে না, তেমনই সেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হলে আর কোনো জিনিসের জন্য প্রত্যাশা থাকে না। এই রকম অতুল আনন্দ পরমাত্মার প্রতি প্রেম হলেই পাওয়া যেতে পারে। অতএব স্ত্রী-পুত্র, ধন-মানের মতো অনর্থ সৃষ্টিকারী দুঃখদায়ক বস্তুসমূহের উপর থেকে ভালবাসা সরিয়ে নিয়ে সেই আনন্দময়ের প্রতি ভালবাসা রাখা উচিত। তাতে অখণ্ড একরস পরমানন্দ লাভ হবে। এই কথা থেকে এই বিষয়টিই প্রমাণিত হলো যে, জগৎ সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এবং পরমানন্দের প্রতি ভালবাসাতেই কল্যাণ হয়।

ভালবাসার স্বরূপ কী ?

প্রকৃতপক্ষে ভালবাসার স্বরূপ অনির্বচনীয়। সে সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। তবে কিছুটা অনুমান করা যায়। ভালবাসা জাগ্রত হলে এর জন্য আর বলতে হয় না। যে লোভী তাকে বলতে হয় না যে তুমি টাকা-পয়সাকে ভালবাস। বাপ-ঠাকুর্দা কখনও পরশপাথর দেখেননি। কিন্তু যে লোভী তার কাছে পরশ পাথর খুবই প্রিয়। তার নাম শুনলেই মুখে হাসি ফোটে। অনুরূপভাবে ভগবানের প্রতি ভালবাসা হলে তাঁর নাম শুনলেই আনন্দ হয়। লোভীর যেমন ধনসম্পদের এবং কামুকের যেমন সুন্দরী নারীর কথা শুনতে ভাল লাগে তেমনই ভগবৎ-প্রেমীর ভগবানের কথা প্রাণ-প্রিয় মনে হয়। যেমন নিজের প্রিয় বন্ধুর নাম শুনলেই তার দিকে মন চলে যায় এবং তার কথা শুনতে ভাল লাগে, তেমনই ভগবৎ প্রেমীর ভগবানের কথা ভাল লাগে। ভালবাসা এবং মোহের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। ভালবাসা হলো বিশুদ্ধ আর মোহ কামনার দ্বারা কলঙ্কিত। মোহর মধ্যে স্বার্থ আছে, তা চলে যেতে পারে, কিন্তু ভালবাসা স্বার্থশূন্য এবং নিত্য। শিশুদের মায়ের প্রতি এক মোহ থাকে। সেজন্য তারা মায়ের কাছে থাকতে চায়, কিন্তু তাঁর আদেশানুসারে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে না। ভালবাসায় এরকম হয় না। সেখানে তো নিজের প্রেমাস্পদকে কি করে সুখ দেওয়া হবে, কি করে তার কোনো প্রিয় কাজ করা হবে, সেই চিন্তাই মনে মনে চলতে থাকে। তবে এমন লোক খুবই কম। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যেই এরকম ভাব প্রায়ই পাওয়া যায়।

হেতু রহিত জগ যুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী।।
উমা রাম সম হিত জগ মাহীঁ। গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ।।
সুর নর মুনি সব কৈ য়হ রীতী। স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতি।।

ভগবান রাম মিত্রতার লক্ষণ জানাবার সময় সুগ্রীবকে বলেছিলেন—

জে ন মিত্র দুখ হোহিঁ দুখারী। তিন্হহি বিলোকত পাতক ভারী।।
নিজ দুখ গিরি সম রজ করি জানা। মিত্রক দুখ রজ মেরু সমানা।।
জিন্হ কে অসি মতি সহজ ন আঈ। তে সঠ কত হঠি করত মিতাঈ।।
কুপথ নিবারি সুপন্থ চলাবা। গুন প্রগটৈ অবগুনহি দুরাবা।।
দেত লেত মন সঙ্ক ন ধরঈ। বল অনুমান সদা হিত করঈ।।
বিপতি কাল কর সতগুন নেহা। শ্রুতি কহ সন্ত মিত্র গুন এহা।।
সখা সোচ ত্যাগহু বল মোরেঁ। সব বিধি ঘটব কাজ মৈঁ তোরেঁ।।

ভগবান একে এইভাবেই পালন করেছেন। সীতার বিরহ দুঃখ সহ্য করে প্রথমে সুগ্রীবের ভীষণ দুঃখকে দূর করে দিয়েছিলেন।

শুদ্ধ ভালবাসা কেবল সজ্জনদের মধ্যেই থাকে। সংসারে মোহ এবং কামই বেশি। মনে হয় যে ভাই অথবা স্ত্রী খুবই ভালবাসে, কিন্তু এতেও মোহ থাকে। তা যদি না হোত তাহলে তাদের আচরণ তাঁর মনের মতো হতো, যে কথায় সে সুখী হত সেই কথা তারা শুনত এবং সেই কাজ করত। সে যদি খদ্দর পরে এবং সেটাকে ভাল বলে মনে করে তাহলে তার ছেলে, ভাই এবং স্ত্রীও খদ্দর পরত। কিন্তু সে রকম তো খুব কমই হয়। তার কারণ ভালবাসা কম, মোহ কিংবা কামই বেশি। তার ফলে তাদের আচরণ তাদের ইচ্ছানুসারেই হয়ে থাকে। এই রকম স্ত্রীরা নিজেদের সুখের জন্যই তাদের স্বামীদের ভালবাসে, স্বামীদের সুখের জন্য নয়। এর নাম ভালবাসা নয়। ভগবানের প্রতি এরকম মোহ থাকাও ভাল, কিন্তু ভালবাসা হলো অন্য জিনিস। ভালবাসার মধ্যে যদি বিশুদ্ধ ভাব থাকে তাহলে সে সম্পর্কে কী আর বলার থাকতে পারে! প্রকৃতপক্ষে সাধকদের কাছে এই ভালবাসা সহজ। অর্থের প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা এই ভালবাসায় পরিশ্রম কম। তার কারণ অর্থকে কেবল আমরাই ভালবাসি, অর্থ জড় হওয়ার কারণে তা আমাদের ভালবাসতে পারে না। কিন্তু ভগবান তো জড় নন। তিনি পরম প্রেমী, আমরা তাঁকে যতটা ভালবাসি তিনি তার চেয়ে বেশি আমাদের ভালবাসেন। তাতে সিদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এই

রকম, মহাত্মাদের আমাদের প্রতি ভালবাসাও আমাদের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। আমরা যদি একবার ভালবাসতে চাই, তাহলে তাঁরা চারবার ভালবাসেন। তাতে তাঁদের কোনো স্বার্থ থাকে না।

মায়ের ভালবাসাতেও মোহ এবং কাম থাকে। শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান এবং সেবা প্রভৃতির স্বার্থ থাকে। কারও কারও মধ্যে কেবল মোহ থাকে। যেমন, এক বৃদ্ধার নাতি ছিল, সে তাকে খুব স্নেহ করত, কোনো ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। কেননা সে জানত যে নাতি বড় হবার আগেই সে মারা যাবে। তেমনই একজন মায়ের একটি দুরাচারী, কুটিল ছেলে ছিল। সে মা-বাবা এবং সংসারের অন্য সকলকে বিরক্ত করত। ছেলেটি চুরি করল, সে জেলে গেল, মা তার জন্য কাঁদল। তার কাছ থেকে কোনো রকম সুখের আশা ছিল না। তাহলেও সে তাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তার কারণ ছেলের প্রতি তার মোহ ছিল। ভালবাসা এ থেকে ভিন্ন। পরমাত্মার মধ্যে স্বার্থরহিত অনন্য ভালবাসা থাকলেই পরম লাভ হয়ে থাকে। তাঁর প্রতি ভালবাসা আছে, তাও নিষ্কাম, কিন্তু যা আছে তা সামান্য—এতে তাড়াতাড়ি ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। বিশুদ্ধ এবং অনন্য প্রেমই হলো ভগবৎ প্রাপ্তির মূল্য। স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর জন্য অথবা স্বর্গসুখের জন্য যে ভালবাসা তা ভগবানের প্রতি ভালবাসা নয়, তা হলো যা ভোগ করা হবে তার প্রতি। যদিও মুক্তির জন্য ভালবাসা থাকা ভাল, কিন্তু সর্বোত্তম প্রেম হলো যা কেবল ভালবাসার জন্যই হয়ে থাকে। আর এরই নাম বিশুদ্ধ প্রেম। সাধু এবং সৎসঙ্গীদের পারস্পরিক ভালবাসাকেও নিঃস্বার্থ বলা যায় না। যদি তা হতো তাহলে সাধুরা কেন চাইতেন যে তাঁদের সৎসঙ্গে অধিক সংখ্যক লোক আসুক এবং ঠিক সময়ে আসুক। এতেই বোঝা যায় যে কিছু স্বার্থ আছে। অবশ্য সেই স্বার্থ উত্তম। সৎসঙ্গীদের মধ্যেও নানা রকমের স্বার্থ থাকে। কেউ আসেন অর্থের লোভে, কেউ আসেন ভজন-ধ্যান বাড়াবার আশায়, কেউ আসেন মান পাবার জন্য, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে কিছু না কিছু লাভ তো হবেই। এই রকম স্বার্থ থাকে। যদি সৎসঙ্গীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় তো তাঁরা তা শোনেন না। অসতর্ক হয়ে থাকেন। সাধু যদি কখনও কোনো কারণে নিজের স্বার্থের কথা বলতে থাকেন তাহলে লোকেরা সম্ভবত দু চার বার তা শুনে নেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ভক্তির প্রচারের সময়েও যদি প্রচারকের স্বার্থ দৃষ্টিগোচর হয় তো

লোকেরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন। হঠাৎ সাধুরা যদি পরীক্ষা নেন তাহলে সম্ভবত কেউই তাতে উত্তীর্ণ হবে না, লোকেরা হয়ত তাঁকে পাগল মনে করবে কিংবা মনে করবে স্বার্থপর এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করবে। একটি দৃষ্টান্ত—

একটি গ্রামে দুজন সাধক ছিলেন। তাঁরা প্রতিদিন গ্রাম থেকে রুটি চেয়ে আনতেন এবং গ্রামের বাইরে একটি গাছের নিচে বসে একবারে সেগুলি খেয়ে নিতেন এবং সেখানেই দিনরাত ভজন-ধ্যানে মেতে থাকতেন। ভজনে তাঁদের নিমগ্নতা দেখে লোকেরা তাঁদের কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে। তাঁদের কীর্তি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। রাজার কানেও তাঁদের কথা গিয়ে পৌঁছায়। রাজাও তাঁদের দর্শন করবার কথা ভাবেন। লোকেরা তাঁদের কাছে গিয়ে বলেন যে, আজ তাঁদের দর্শন করতে মহারাজা স্বয়ং আসবেন। তাঁরা দুজনে ভাবলেন যে, এ তো মহা বিপত্তি হলো। সাধক যদি কোথাও মান-সম্মান পেতে থাকেন এবং তাতেই যদি তাঁর নিমগ্নতা হয়, তাহলে তাঁর পতনে দেরী হয় না। এই কথা চিন্তা করে তাঁরা রাজাকে দূর থেকে আসতে দেখে রুটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দেন। রাজার বাহন ইতিমধ্যে সেখানে এসে পৌঁছায়। তাঁদের পাতলা-মোটা এবং এক-আধটা রুটির জন্য লড়তে দেখে রাজা মনে মনে বুঝে নেন যে, সেখানে কোনো বিশিষ্টতা নেই। রাজা সেখান থেকে ফিরে যান। স্বার্থের লোক দেখানো দৃশ্য দেখেই যখন প্রেম দূর হয়ে গেল তখন প্রকৃত স্বার্থের মধ্যে তো প্রেম থাকতেই পারে না। এজন্য পরমাত্মার সঙ্গে স্বার্থশূন্য প্রেমই করা উচিত। প্রকৃত অনন্য বিশুদ্ধ প্রেমের মতো কোনো বস্তু জগতে নেই। এর দ্বারাই পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় এবং এইটিই তার মূল্য। যখন এই ভালবাসা জাগ্রত হয় তখন সেটি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু ভাল লাগে না। আমরা ভগবানের পূজা করি। তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন না। তার কারণ কী? প্রেম নেই। যদি প্রেম থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন। গীতায় ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা হলো—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ।।

(৯/২৬)

ভগবান আমাদের ফল-ফুল এবং পত্রের জন্য লালায়িত নন, তিনি প্রেমের জন্য ক্ষুধার্ত। তিনি পৃথিবীতে প্রকৃত প্রেমিকের সন্ধান করেন। সে-ই প্রকৃত প্রেমী যে ভগবানের জন্য নিজের ছাল চামড়া ওঠাতে থাকলেও সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন থাকতে পারে। যে বস্তুগুলিকে সে নিজের বলে মনে করে সেগুলিকে ভগবান গ্রহণ করে নিলে সে খুবই প্রসন্ন হয়। সে মনে করে যে তার ফলে তার অহংকার দূর হয়ে গেল। কথাটিও ঠিক। যে জিনিসকে মানুষ নিজের বলে মনে করে তাকে কোনো শ্রেষ্ঠ মানুষও স্বীকার করেন না। তাহলে ভগবান তাকে কি করে গ্রহণ করতে পারেন? ভগবান যখন আমাদের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন, তখন আমাদের অহঙ্কার দূর হয়ে যায়। বাস্তবে সব কিছুই তো ভগবানের, আমরা ভুলবশতঃ সেগুলিকে নিজেদের বলে মনে করে থাকি। এই ভাবটিকে দূর করতে হবে। যেদিন ভগবান বস্তুসহ আমাদের গ্রহণ করবেন, সেই দিনই ভগবান আমাদের হয়ে গিয়েছেন বলে বুঝে নিতে হবে।

যখন ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা হয়ে যায় তখন আর সংসারে কারও জন্য ভীতি থাকে না এবং কারও প্রতি আকর্ষণও থাকে না, আর যে কোনো রকম অপমানকেও গ্রাহ্য করে না। যেমন প্রবল বন্যার স্রোতে গঙ্গাতীরের সমস্ত গাছ বাহিত হয়ে যায়, সেই রকম ভালবাসার প্রবল স্রোতে অপমানাদি সব কিছুই প্রবাহিত হয়ে যায়। যেমন ধ্যানমগ্ন যোগীর বৃত্তি ভগবানের প্রতি প্রবাহিত হতে থাকে তেমনই প্রেমধারাও ভগবৎমুখী হতে থাকে। এই অবস্থার আনন্দ বর্ণনাতীত। এর ফলে অহঙ্কারের দ্বারা উৎপন্ন লজ্জা, ভয়, মান প্রভৃতি সব দোষ দূর হয়ে যায়। ভগবানও সব সময় এই রকম প্রেমীর অধীন থাকেন। যিনি ভগবানের কাছে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দেন ভগবানও তাঁর কাছে নিজে সব কিছু সঁপে দেন। ভালবাসা বৃদ্ধি পেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে যেমন সমুদ্র তরঙ্গায়িত হতে থাকে, তেমনই ভগবানের মিষ্টি মৃদু হাসি দেখে প্রেমিক ভক্তের হৃদয়েও প্রেমের সমুদ্রের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে ওঠে। তাঁর হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র উত্তোলিত হয়, উপচে পড়ে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাণী গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। চোখ এবং নাক থেকে প্রেম ধারারূপে প্রবাহিত হতে থাকে এবং শেষে ভ্রুকুটিও ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে সেই প্রেমীকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়। তাঁর অবস্থা অচল প্রতিমার মতো হয়ে যায়।

ভগবানের জন্য যখন ব্যাকুলতা জাগে তখন ভগবানও ভক্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সীতা অশোক বনে রামের জন্য বিলাপ করেন, তাতে রামও সীতার জন্য ব্যাকুল হয়ে বনে বনে সীতার সন্ধান করতে থাকেন।

আজ যদি আমরা ভগবতী রুক্মিণী বা দ্রৌপদীর মতো ব্যাকুল হই তাহলে ভগবানও সেই রকম ব্যাকুল হয়ে আমাদের দর্শন দেবার জন্য অবশ্যই উপস্থিত হবেন। বিধির দ্বারা ভগবান প্রসন্ন হন না। তিনি চান প্রেম। প্রেমে নিয়মের প্রয়োজন নেই। যেখানে নিয়ম সেখানে উচ্চ শ্রেণীর প্রেমের অভাব বুঝতে হবে। প্রেমে বিধি বিধান সম্পূর্ণরূপে স্বভাবতই থাকে না। নিয়ম ভাঙ্গার দরকারই হয় না। তা নিজে থেকেই ভেঙ্গে যায়। এই রকম অবস্থাতেই সত্যকার প্রেম বিকশিত হয়। এখানে কোনো রকম প্রদর্শন করার ভাব থাকে না। ভক্ত প্রেমরূপ হয়ে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নরূপে মিলিত হয়। এইটিই বিশুদ্ধ প্রেম, ভগবানের এইটিই প্রকৃত স্বরূপ। ভাগ্যবতী গোপীদের মধ্যে এই প্রকৃত প্রেমই ছিল। তাদের প্রেমকে দেখে জড় জীবও বিগলিত হয়ে যেত, মানুষের আর কি কথা! সেই প্রেমবিবশতায় লীন বায়ু প্রেমকে প্রবাহিত করে। প্রেমী যেখানে বিচরণ করে সেখানকার সকল বস্তু প্রেমময় হয়ে যায়। প্রেমী যাকে স্পর্শ করে এবং যেখানে তার চরণধূলি পড়ে সেই সবই প্রেমস্বরূপ হয়ে যায়। এই রহস্যের কথা একমাত্র ভগবৎপ্রেমীই জানেন। এমন প্রেম কেবল ভগবানকে ছাড়া আর কারও প্রতি হতে পারে না। যে প্রেমের কথা শুনে শ্রীউদ্ধব প্রেমের প্রবাহে বাহিত হয়েছিল, তা যদি আমরা শুনি তাহলে আমাদেরও সেই দশা হবে। কিন্তু তা আমরা কোথায় শুনতে পাব? ছলনার দ্বারা এ জিনিস হতে পারে না। প্রকৃত হলে তবেই তা হতে পারে।

যখন একটি সুন্দরী নারীর কটাক্ষে ঘায়েল হয়ে মানুষ সারা জগতে কেবল নারীকেই দেখতে থাকে এবং তাতেই সে বেশি আনন্দ পায় আর সেজন্য পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়—যা কিনা নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়, তখন যে ব্যক্তি সেই পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা শ্যামসুন্দরের কটাক্ষ বাণ লক্ষ্য করেছেন তাঁর দশা কেমন হবে? তিনি কী অনুপম আনন্দে বিভোর থাকবেন! তিনি জগতে কী অবলোকন করতে থাকবেন! এ জিনিস তো কল্পনাতেই আসতে পারে না আর এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোন জিনিসও নেই। কেউ যদি

একে ধূলিকণা এবং তাকে ধূলিময় পৃথিবী অথবা একে দর্পণের সূর্য এবং তাকে প্রকৃত সূর্য বলে তাহলেও তা উচিত হবে না। যেমন বরফের পিণ্ড সমুদ্রের গভীরতা মাপতে পারে না তেমনই এই আনন্দের অনুমানও করা যায় না। বাস্তবে সেই ভগবৎপ্রেমী বরফের পুতুলের মতো ভগবৎস্বরূপই হয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা আশা করা যায় না। কেননা তিনি ভগবানের কাছ থেকে আলাদা থাকতে পারেন না এবং তাঁর স্থিতি অন্য কেউই বলতে পারে না। যদিও পরমেশ্বরকে লাভ করার পরেও প্রেমীর পূর্ব দেহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তবে তা প্রেমরূপই। তিনি যেদিকে যান সেদিকেই প্রেমের বর্ষণ হতে থাকে। বৃষ্টির মতো তাঁর দৃষ্টিও লোকেদের প্রেমসুধার দ্বারা সিক্ত করে দেয়। এমন মানুষের দর্শনও পাওয়া কঠিন। তাহলে ভগবানের দর্শন পাওয়ার তো কথাই নেই! কিন্তু প্রেম জেগে উঠলে তাঁকে পাওয়া খুবই সহজ। ভগবান দয়াময়। তিনি যদি আমাদের কাজ লক্ষ্য করেন, তাহলে আমাদের নিস্তার পাওয়া কঠিন। কিন্তু তিনি এরকম করেন না। তিনি প্রেমের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দেন। এই কথাটি যারা জানে তারা তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে প্রাপ্ত করে নেয়।

ভগবান শ্রীরামের প্রেমে বিভোর ভরত যখন চিত্রকূটে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর প্রেমকে দেখে জড়েরা চেতন এবং চেতনেরা জড়বৎ হয়ে গিয়েছিল। যখন ভরতকে কেবল দর্শন করেই জড় চৈতন্যময় এবং চেতনেরা জড়রূপ হয়ে গিয়েছিল তখন স্বয়ং ভরতের কী দশা হয়েছিল তা কেবল ভরতই বলতে পারেন। এই রকমের স্বার্থশূন্য প্রেমকেই শুদ্ধ, অলৌকিক এবং উজ্জ্বল প্রেম বলা হয়। এতে মালিন্য নেই, ব্যাভিচারও নেই। এ দেদীপ্যমান দীপ্তি, সূর্যের মতো নয়, তবে পরম জ্ঞানবন্ত নির্মল জ্যোর্তিময়। এ অমৃতের চেয়েও বেশি অমরতা প্রদানকারী এবং বেশি স্বাদিষ্ট। এই প্রকৃত আনন্দময় সত্য স্বরূপের জন্য আমাদের প্রয়াস করা উচিত। ক্ষণিক সুখরূপ ভোগের প্রতি, যা বাস্তবে কেবল দুঃখ তার প্রতি বিরাগ করা এবং সেই প্রেমময় পরমাত্মার প্রতি মন নিমগ্ন করে তাঁর প্রতিই প্রেম করা উচিত। যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের অবিচ্ছিন্ন স্বরূপ প্রকাশিত হবে তখনই আমরা পরমাত্মাকে লাভ করব। অতএব পাঠক-পাঠিকারা যদি এই কথা বিশ্বাস করেন এবং তাঁরা পরমেশ্বর প্রাপ্তির সাধনায় তৎপর হয়ে তাঁকে পাওয়ার জন্য

পূর্ণ বিশ্বাসী হন, তাহলে তাদের আন্তরিকভাবে এই অনিত্য, দুঃখেভরা, ভ্রান্তিবশত সঠিক মনে করা সাংসারিক ভোগগুলিকে মন থেকে ত্যাগ করতে হবে। এগুলি থেকে প্রবৃত্তিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় আনন্দ প্রেমভোরে নিমগ্ন হতে হবে। পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য প্রেমই হলো প্রধান উপায়।

(৮) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

ঈশ্বরের সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলি শুনে আমি বিস্মিত হই না। কেননা এই বিষয়টি বুদ্ধির সীমার বাইরে। কেউ কেউ যে ঈশ্বরকে মেনেও মানে না তাতেই বিস্মিত হওয়া উচিত। ঈশ্বরের তত্ত্বকে না জেনে ঈশ্বরকে যাঁরা মানেন তাঁরা বলেন যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, কর্মফলদাতা, সত্য-বিজ্ঞান-আনন্দঘন। তাঁরা এইভাবে ঈশ্বরের স্বরূপের কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের সৃষ্ট বিধানগুলি পালন করেন না। এই রকম মানুষদের মেনে নেওয়া কেবল কথার কথা। এই রকম মানুষদের মূর্খতার ফল হলো এই যে আজ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। ঈশ্বরকে একেবারেই যাঁরা মানেন না তাঁদের চেয়ে যাঁরা অন্ধভক্তিতে ঈশ্বরকে মানেন তাঁদের উত্তম মনে করেও তাঁদের আমি এই জন্যই নিন্দা করছি যে অন্ধভক্তিকারী মানুষেরাও অনীশ্বরবাদ প্রচারের একটি বড় কারণ হয়েছেন। যাঁরা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে ঈশ্বরকে মানেন তাঁদের মেনে নেওয়াটাই প্রশংসনীয়। কেননা যাঁরা ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানেন তাঁদের আচরণ পরমেশ্বরের মর্যাদার প্রতিকূল হয় না। বরং তাঁদের আচরণ প্রমাণসিদ্ধ এবং সম্মানীয় হয়। ভগবান বলেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।

(গীতা ৩/২১)

'শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যে আচরণ করেন অন্য মানুষেরাও সেই আচরণই করে থাকেন। সেই মানুষেরা, যা প্রমাণ করে দেন অপর লোকেরা সেগুলিকেই অনুসরণ করে।' এইরকম মানুষেরাই ঈশ্বরবাদের প্রকৃত প্রচারক। আমি তো এক সাধারণ মানুষ। যদিও ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ তবু সাধু-সন্তদের সঙ্গ থেকে এবং নিজের চিন্তনের ফলে উৎপন্ন আমার ভাবের কিছু অংশ আমি আমার সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে নিজের মনোবিনোদনের জন্য পাঠকদের সেবায় উপস্থাপিত করছি। সজ্জনেরা আমাকে অর্বাচীন মনে করে আমার ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করবেন। ঈশ্বরের বিষয় খুবই গভীর এবং রহস্যপূর্ণ।

এই বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। আমার মতন সাধারণ মানুষ তো কোন ছার!

১। (ক) ঈশ্বর বিনা কারণে সকলের প্রতি দয়া করেন। প্রত্যুপকার ছাড়াই ন্যায় বিধান করেন এবং সকলকে সমান জ্ঞান করে সকলকে ভালবাসেন। এজন্য তাঁকে মান্য করা কর্তব্য আর কর্তব্য পালন করাই মানুষের মনুষ্যত্ব।

(খ) ঈশ্বরকে মেনে নিলে তাঁকে লাভ করবার জন্য তাঁর গুণ, প্রেম, প্রভাব জানার ইচ্ছা হয় এবং তাঁর নাম জপ করবার, স্বরূপকে ধ্যান করবার, গুণগুলির শ্রবণ-মননের চেষ্টা হয়। তাতে মানুষের পাপ, দোষ এবং দুঃখের বিনাশ হয়ে যায় এবং তারা পরমানন্দ লাভ করে।

(গ) ভালভাবে উপলব্ধি করে ঈশ্বরকে মেনে নিলে মানুষের দ্বারা কোনো রকম দুরাচার হতে পারে না। যাদের মধ্যে দুরাচার দেখা যায়, বাস্তবে তারা ঈশ্বরকে মানে না। মিথ্যাই তারা ঈশ্বরবাদী হয়ে আছে।

(ঘ) আন্তরিকভাবে যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন তাঁরা সব সময় জয়লাভ করেন। শাস্ত্রগুলিতে ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতো অনেক জীবন্ত উদাহরণ আছে। বর্তমানেও এমন মানুষ দেখা যায় যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে মেনে তাঁর শরণাগত হওয়ায় যথেষ্ট উন্নতি করেছেন।

(ঙ) সকল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগুলির সার্থকতাও ঈশ্বরকে মান্য করার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। কেননা সকল শাস্ত্রের ধ্যেয় ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করার মধ্যেই নিহিত।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ মধ্যে তথা চান্তে হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।

(মহাভারত, স্বর্গারোহণ অধ্যায় ৬)

২। (ক) কর্ম অনুসারে ফলের বিধানকারী সর্বব্যাপী পরমাত্মার সত্তা না মানায় মানুষের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের মধ্যে মিথ্যা, কপটতা, চুরি-ডাকাতি, হিংসাদি পাপ কর্ম এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি অবগুণগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তাদের পতন ঘটায়। তার পরিণামে তারা বেশি দুঃখে পতিত হয়।

(খ) ঈশ্বরকে না মানলে ঈশ্বর সম্পর্কিত তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান করা যায় না আর তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান না করলে জ্ঞান হয় না। এবং বিনা জ্ঞানে কল্যাণ হতে পারে না।

(গ) ঈশ্বরকে না মানলে কৃতঘ্নতার দোষ হয়। কেননা যে পুরুষ সমগ্র সংসারের সৃষ্টি ও পালন কর্তা, সকলের সুহৃদ, সেই পরমপিতা পরমাত্মাকেই যখন মানে না তাহলে এরা যদি নিজেদের জন্মদাতা ও জন্মদাতৃ বাবা-মাকেও না মানে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কী আছে? আর আজন্ম উপকারী মা-বাবাকে যারা মানে না তাদের মতো কৃতঘ্ন আর কে আছে?

(ঘ) ঈশ্বরকে না মানলে মানুষের আধ্যাত্মিক স্থিতি নষ্ট হয়ে যায়। এবং তার মধ্যে পশুত্ব এসে যায়। পৃথিবীতে যারা ঈশ্বরকে মানে না তাদের দিকে ভাল করে দেখলে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরকে না মানলে আরও অনেক বড় বড় ক্ষতি হয়। কিন্তু বিস্তৃত হয়ে যাবার ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করা হলো না।

৩। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ চাওয়া কোনো রকম আশ্চর্যের কথা নয় এবং তাতে কোনো বুদ্ধিমত্তাও নেই। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা খুবই সাধারণ কথা। যে বিষয় স্থূল বুদ্ধিতে বোঝা যায় না সেই বিষয়ে বুদ্ধিমান লোকেদেরও সংশয় উৎপন্ন হয়। সাধারণ মানুষদের তো তা হতেই পারে। তবে চিন্তার কথা হলো যে পরমাত্মা স্বতঃ প্রমাণিত এবং যে পরমাত্মার দ্বারা সব প্রমাণ সিদ্ধ হয় তার সম্পর্কে প্রমাণ চাওয়া তো আশ্চর্যেরই কথা। এ যেন কেউ নিজের সম্পর্কেই প্রশ্ন করছে 'আমি আছি, না নেই'? এই প্রশ্নের মতোই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা এক ব্যর্থ প্রয়াস। যদি বলা হয় যে 'আমি তো প্রত্যক্ষ, ঈশ্বর তো তেমন নন' তাহলে সেকথা তো বলা যেতে পারে। তবে আসল কথা হলো এই যে পরমাত্মা তার চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ। কেউ বলতে পারে, 'পরমাত্মা আমাদের চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ কিভাবে?' এর উত্তর হলো স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত পদার্থগুলি যখন জাগ্রতাবস্থায় থাকে না তখন এই সংশয় উঠতে পারে যে জাগ্রত অবস্থায় যে পদার্থগুলি দেখা হয় সেগুলিও কারও দেখা স্বপ্ন। যেমন স্বপ্নের পদার্থগুলির পরিবর্তন স্বপ্নের অবস্থাতেই দেখা যায়, সেই রকম জাগ্রত অবস্থায় পদার্থগুলির পরিবর্তন জাগ্রত অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু যা থেকে এই সবগুলির সত্তার সৃষ্টি আর সব কিছুর বিনাশ হলেও যার নাশ হয় না, যা সকলের আধার এবং অধিষ্ঠান—সেই নির্বিকার পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অবস্থা আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই রকম প্রত্যক্ষ অবস্থা সেই সব মহাপুরুষের মধ্যে থাকে যাঁদের মহিমা সকল শাস্ত্র কীর্তন করে। যাঁরা

সূক্ষ্মদর্শী কেবল তাঁরাই সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করে থাকেন। এই বিষয়ের প্রমাণ হলো শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্র এবং মহাত্মা পুরুষদের বাণী। যাঁরা নিজেরা সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক তাঁরা শ্রুতি, স্মৃতি এবং মহাত্মাদের প্রদর্শিত পথ অনুসারে সাধনার দ্বারা চেষ্টা করে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। পরমাত্মার অস্তিত্বের সিদ্ধির জন্য যুক্তি প্রমাণও আছে। কার্যের সিদ্ধির দ্বারা কারণকে নিশ্চয় করাকে যুক্তি প্রমাণ বলে। পৃথিবীতে কোনো বস্তুর সৃষ্টি এবং তার সঞ্চালন কোনো কর্তা ছাড়া হতে দেখা যায় না। এতে এইটিই প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী, সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দিশা, কাল প্রভৃতির সৃষ্টি এবং নিয়মানুসারে সেগুলির সঞ্চালন করবার জন্য কোনো একটি খুবই প্রবল শক্তি আছে। সেই শক্তিকেই পরমাত্মা বলে মনে করা উচিত। যদি বলা হয় যে 'কর্তা ছাড়াই প্রকৃতি থেকে সব কিছু নিজে নিজে উৎপন্ন হয়ে যায়, তাতে কর্তার কোনো প্রয়োজন থাকে না ; যেমন গাছ থেকে বীজ এবং বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন হয় নিজে নিজেই এও সেই রকম,' তো সেই কথা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রথমে এই কথা বুঝতে হবে যে প্রথমে বীজের সৃষ্টি হয়েছিল, নাকি গাছের! যদি বলা হয় গাছ, তো সেই গাছ কোথা থেকে এল? আর যদি বলা হয় যে প্রথমে বীজ তাহলে প্রশ্ন হবে সেই বীজ এল কোথা থেকে? যদি বলা হয় যে দুটির সৃষ্টি হয়েছে একসঙ্গে তাহলে প্রশ্ন হবে সেই সৃষ্টি হয়েছিল কার দ্বারা? কেননা বিনা কারণে কোনো কাজের সৃষ্টি অসম্ভব। যা থেকে এবং যাঁর দ্বারা বীজ, গাছ প্রভৃতি উৎপত্তি হয়েছে তিনিই পরমাত্মা।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উত্থিত হয় তা হলো এই প্রকৃতি জড়, না চেতন? যদি জড় হয় তাহলে তো চৈতন্যের সত্তা-প্রকাশের সাহায্য ছাড়া পদার্থের উৎপাদন ও সঞ্চালন সম্ভব নয়। আর যদি তাকে চেতন বলা হয় তবে আমার কোনো বিরোধ নেই ; কেননা চেতন শক্তিই হলেন পরমাত্মা। তাঁর দ্বারাই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি হয়েছে। কেবল সৃষ্টিই নয়, চৈতন্যের সত্তা ব্যতীত এই সংসারের সঞ্চালন নিয়মানুসারে হতেই পারে না। যন্ত্রী ছাড়া ক্ষুদ্রতম যন্ত্রকেও সঞ্চালিত হতে দেখা যায় না। যা কিছু সঞ্চালিত হয়, সেগুলির সঞ্চালক না থাকলে সেগুলি নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যার দ্বারা নিয়মানুসারে এই সংসারের সঞ্চালন হয় তাকেই পরমাত্মা মনে করা উচিত। সর্বব্যাপী,

সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরমাত্মা ছাড়া জীব তার কৃতকর্মের ফল যথাযোগ্যভাবে ভোগ করতে পারে না। যদি বলা হয় যে মানুষের কৃতকর্মের ফল কর্তা তার কর্মানুসারে নিজে থেকেই পেয়ে যায় তাহলে তা যুক্তিযুক্ত হবে না। তার কারণ কর্ম জড় হওয়ায় তার পক্ষে যথাযোগ্য ফল বিভাগ করবার শক্তি নেই। আর জীব তো খারাপ কাজের ফল স্বয়ং ভোগ করতে চায় না। চোর চুরি করে আর রাজা তাকে সেই অপরাধের জন্য দণ্ড দেন। চোর তো নিজে থেকে জেলখানায় যায় না আর সেই চৌর্য কর্ম তাকে জেলে পাঠাতে পারে না। রাজার আদেশে নিযুক্ত কর্মীরা তাকে চুরি অপরাধের জন্য জেলে যাওয়ার দণ্ড দেয়। তেমনই যারা পাপ কাজ করে তাদের পরমেশ্বরের নিযুক্ত অধিকারী দেবতারা পাপকাজের জন্য দুঃখরূপ দণ্ড দেন। ঠিক এইভাবেই জীবেরা তাদের কৃত সুকৃতির জন্য ফলরূপ সুখ নিজে থেকে ভোগ করতে সক্ষম নয়। যেমন কোনো রাজার আইন অনুসারে চলা মানুষদের রাজা অথবা তাদের নিযুক্ত অধিকারীরা পুরস্কৃত করে থাকেন তেমনই সুকৃতিকারী মানুষেরা তাঁদের কৃত কর্মের জন্য পরমাত্মার দ্বারা নিযুক্ত অধিকারীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফল পেয়ে থাকেন।

অজ্ঞানতার দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে থাকার কারণে জীবেদের আপন কর্মানুসারে স্বাধীনভাবে একটি শরীর থেকে অন্য শরীরে প্রবেশ করবার সামর্থ্য এবং জ্ঞানও নেই।

তাছাড়া সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজের প্রয়োজন সর্বত্র দেখা যায়। কোনো পরম বুদ্ধিমান চৈতন্যময় কর্তা ছাড়া আর কারও পক্ষে এই রকম প্রয়োজন-ভরা সৃষ্টিকে রচনা করা সম্ভব নয়।

উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা না থাকলে সংসারের উৎপত্তি হতে পারে না। তার সঞ্চালনও সম্ভব নয়। আর জীবেরা তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফল যথাযথ পেতে পারে না। প্রয়োজনে ভরা সৃষ্টির রচনাও অসম্ভব।

ঈশ্বর 'স্বতঃসিদ্ধ'। কেননা সমস্ত প্রমাণের সিদ্ধি ঈশ্বরের প্রমাণ থেকেই সিদ্ধ হয়ে থাকে। তাই তাঁর জন্য অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বর যে আছেন শাস্ত্রই তার প্রমাণ। সকল শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণের তাৎপর্যও হলো ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করা। তার অসংখ্য প্রমাণ বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়।

যজুর্বেদ—

ঈশাবাস্যমিদ্ঁ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

(৪০/১)

'এই জগতে, যা কিছু আছে তা সবই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।'

ব্রহ্মসূত্র—

'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।।'

(১/২-৩)

'যাঁর দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রতিপালন হয় তিনি ঈশ্বর। শাস্ত্রের হেতু হওয়ায় অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা এবং শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত, তিনি ঈশ্বর।'

গীতা—

সর্বস্য চাহং হৃদি সংনিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।

(১৫/১৫)

'আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে স্থিত এবং আমার দ্বারাই স্মৃতি ও জ্ঞানের উদ্ভব ও বিলোপ হয়ে থাকে। আর সকল বেদের দ্বারাই আমি জ্ঞাতব্য। বেদান্তের কর্তা এবং আমিই বেদগুলিকে জানি।'

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।

(১৮/৬১)

'হে অর্জুন! শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণীর অন্তর্যামী পরমেশ্বর নিজের মায়ার দ্বারা তাদের কর্ম অনুসারে চালিত করেন। তিনি ভূত প্রাণীদের হৃদয়ে স্থিত।'

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্।।

(১৩/১৭)

'সেই ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহের জ্যোতি এবং মায়ার অতীত—এই কথা বলা হয়ে থাকে। আর তিনি বোধস্বরূপ এবং জ্ঞাতব্য। তাঁকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় এবং তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।'

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।

(১৫/১৭)

'ঐ দুটি (ক্ষয় এবং অক্ষয়) অপেক্ষা উত্তম অন্য এক পুরুষ আছেন। তিনি ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে সকলের প্রতিপালন করেন। তিনি অবিনাশী এবং পরমাত্মা, এমন কথাই বলা হয়েছে।'

যোগদর্শন—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।
তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।
পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।

(সমাধিপাদ ২৪-২৬)

'অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়)—এই পাঁচটি ক্লেশ থেকে, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি কর্ম থেকে সুখ-দুঃখাদি ভোগের থেকে এবং সকল কামনা থেকে মুক্ত বিশেষ পুরুষ (পুরুষোত্তম) হলো ঈশ্বর। সেই পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞতার জ্ঞান নিরতিশয়। তিনি অতীতের ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা এবং শিক্ষক। কেননা তিনি কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হন না।'

উপনিষদ্—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম।।

(তৈত্তেরীয়. ৩/১)

'যাঁর দ্বারা ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং সৃষ্ট প্রাণী যাঁর অনুগ্রহে জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পরে যাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তাঁকে তুমি জান। তিনিই ব্রহ্ম।'

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।।
(শ্বেতাঃ ৬/১১)

'একজন দেবতাই (পরমাত্মা) ভূতসমূহের অন্তস্থলে বিরাজমান, তিনি সর্বব্যাপী, ভূতসমূহের অন্তরাত্মা। তিনিই সকল কর্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতের নিবাসস্থান, সাক্ষী, চেতন, কেবল এবং নির্গুণ।'

ভগবতে ভগবান বলেছেন—

অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ।।
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্।।
(৪/৭/৫০-৫১)

'হে ব্রাহ্মণ! আমিই ব্রহ্মা, আমিই শিব এবং জগতের পরম কারণ। আমিই আত্মা এবং ঈশ্বর অন্তর্যামী আমি, আমিই স্বয়ং প্রকাশ এবং নির্গুণ। আমি আমার নিজের ত্রিগুণাত্মক মায়াতে সমাবিষ্ট হয়ে বিশ্বে পালন, পোষণ এবং সংহার ক্রিয়ায় রত থেকে কর্মানুসারে নাম ধারণ করি।'

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের অন্তর্গত ১৪৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
লোকাধ্যক্ষং স্তবন্নিত্যং সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ।।৬।।
ব্রহ্মণ্যং সর্বধর্মজ্ঞং লোকানাং কীর্তিবর্ধনম্।
লোকনাথং মহদ্ভূতং সর্বভূতভবোদ্ভবম্।।৭।।
পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ।
পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণম্।।৯।।
পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্।
দৈবতং দেবতানাং চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা।।১০।।

'সেই অনাদি, অনন্ত, সর্বলোকব্যাপী, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্ব লোকের অধ্যক্ষ—যে তাঁকে সর্বদা স্তুতি করে সে সকল দুঃখ লঙ্ঘন করে যায়।' 'যিনি পরম, সকল ধর্মের জ্ঞাতা, লোকসমূহের কীর্তি বর্ধনকারী, লোকনাথ, সকল

ভূতের সৃষ্টিকর্তা মহান ভূত'। 'যিনি তেজের পরম এবং মহান পুঞ্জ, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তপোরূপ, যিনি পরম মহান্ ব্রহ্মরূপ এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।' 'যিনি সকল পবিত্র বস্তুর মধ্যে পবিত্রতম, যিনি মঙ্গলগুলির মধ্যে মঙ্গলরূপ, যিনি দেবতাদের পরম দেবতা এবং যিনি সকল প্রাণীর অবিনাশী পিতা।'

বাল্মীকী রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড—

কর্তা সর্বস্য লোকস্য শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিদাং বিভুঃ।
অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব।
লোকানাং ত্বং পরো ধর্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ।।

(১১৭/৬, ১৪)

ব্রহ্মা বললেন, 'হে রাঘব! আপনি সকল লোকের কর্তা, জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভু। আপনি সকল লোকের আদি, মধ্য ও অন্তে বিরাজিত অক্ষর ব্রহ্ম এবং সত্য, আপনি সকল লোকের পরমধর্ম বিষ্বক্সেন চতুর্ভুজ হরি।'

জৈন, বৌদ্ধ এবং চার্বাক প্রভৃতি কয়েকটি মতকে বাদ দিলে এমন কোনো বেদ-শাস্ত্র নেই যাতে ঈশ্বরের প্রতিপাদন করা হয়নি। এমনকি মুসলমান, খ্রীষ্টানরাও ঈশ্বরকে মানেন। যথা—

কোরাণ—পূর্ব এবং পশ্চিম সব ঈশ্বরেরই। তুমি যেদিকেই তোমার মুখ ঘোরাবে, সেখানেই ঈশ্বরের অবস্থান আছে। ঈশ্বর বাস্তবে খুবই উদার, তিনি সর্বশক্তিমান।

যীশু বলেছেন—ঈশ্বরের প্রতি যার বিশ্বাস এবং যে ভগবানের শক্তির আশ্রিত সে সংসারকে পার করে যাবে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের খুবই দুর্গতি হবে।

৪। মানুষ যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে তাহলে যে ন্যায়কারী এবং পরম দয়ালু ঈশ্বরের সত্তা এবং তাঁর দয়া প্রতি পদে দেখতে পাবে। প্রাচীন এবং অর্বাচীন অনেক মহাত্মার জীবনীতে এই রকম ঘটনার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি নিজের সম্পর্কে এই বিষয়ে কী আর বলব? অবশ্যই আমি এইটুকু নিবেদন করতে পারি যে সর্বশক্তিমান বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মার সত্তা এবং দয়ার উপর তথা তাঁর উপর অবলম্বিত মহাত্মাদের জীবন ও ঘটনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে অবশ্যই লাভ হয়।

❀ ❀ ❀

(৯) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাব

গীতা জ্ঞানের অগাধ সমুদ্র। এর ভিতরে জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার নিহিত। এর তত্ত্ব আলোচনা করতে বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত এবং তত্ত্বালোচক মহাত্মাদের বাণীও কুণ্ঠিত হয়। কেননা এর পূর্ণ রহস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তাঁর পরে এর সঙ্কলনকর্তা ব্যাসদেব এবং শ্রোতা অর্জুনের কথা বলা যায়। এই রকম অগাধ রহস্যময়ী গীতার অভিপ্রায় এবং মহত্ত্ব আমার পক্ষে বর্ণনা করা একটি সাধারণ পাখির আকাশের ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা করার মতো। গীতা অনন্ত ভাবসমূহের অগাধ জলরাশি। রত্নাকরের গভীরে ডুব দিলে যেমন রত্ন পাওয়া যায় তেমনই গীতা সাগরের গভীরে নিমজ্জন করলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিত্য নতুন বিশিষ্ট ভাবরত্নরাশি উপলব্ধি করেন।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী—এটি সকল উপনিষদের সার। সূত্রগুলিতে যেমন বিশেষ ভাবের সমাবেশ আছে তেমনই তার চেয়েও উচ্চতর ভাবের সমাবেশ এর শ্লোকগুলিতে পরিপূর্ণ। এর শ্লোকগুলিকে শ্লোক না বলে মন্ত্র বলা উচিত। ভগবানের মুখ নিঃসৃত হওয়ায় এগুলি বস্তুত মন্ত্রেরও অধিক পরম মন্ত্র। তবু এগুলিকে কেন শ্লোক বলা হয়? তার কারণ, নারী এবং শূদ্ররা যেমন বেদমন্ত্র উচ্চারণে বঞ্চিত থাকে সেই রকম এই বেচারীরা যাতে এই অনুপম গীতা শাস্ত্র থেকে বঞ্চিত না হয়। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের কল্যাণের জন্য এই তাত্ত্বিক গ্রন্থরত্ন অর্জুনকে উপলক্ষ করে সংসারে প্রকাশিত করেছেন। এর প্রচারকদের প্রশংসা করে ভগবান ভক্তদের মধ্যে একে প্রচার করার জন্য স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন—সেই প্রচারক যেই হোক না কেন—

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।

(গীতা ১৮/৬৮-৬৯)

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রীতি পরবশ হয়ে এই পরম রহস্যময় গীতা শাস্ত্র আমার ভক্তদের কাছে বলবে সে অবশ্যই আমাকে লাভ করবে। আমার অতিশয় প্রিয় এই কাজের চেয়ে বড়ো কাজ করার মতো কেউ মানুষের মধ্যে

নেই এবং তার চেয়ে বড়ো আমার প্রিয় আর কেউ হবেও না।"

গীতার প্রচার-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ এবং শিথিল নয়। ভগবান একথা বলেননি যে অমুক জাতি এবং বর্ণাশ্রমের মধ্যে অথবা অমুক দেশে এর প্রচার করা উচিত। ভক্ত হলে তিনি মুসলমান হোন, খ্রীষ্টান হোন, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র যাই হোন সকলেই এর অধিকারী। তবে ভগবান একথা অবশ্যই বলেছেন—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।। (গীতা ১৮/৬৭)

"তোমার কল্যাণের উদ্দেশ্যে কথিত গীতারূপ এই পরম রহস্যকে কোনো কালে তপরহিত মানুষের কাছে বলা উচিত নয়। আর যে ভক্তিরহিত, শুনতে অনিচ্ছুক এবং আমার নিন্দাকারী তার কাছেও বলা উচিত নয়।"—এই নিষেধও যথার্থ। ব্রাহ্মণ হয়েও সে যদি অভক্ত হয় তাহলে সে এর অধিকারী নয়। শূদ্রও যদি ভক্ত হয় তাহলে সে অধিকারী। জাত-পাত, উচ্চ-নীচের কোনো বন্ধন এতে নেই। অনধিকারীদের সম্পর্কে তো আরও বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি সবই ঠিক। ভক্তদের জন্য যখন সোজাসুজি আদেশ দেওয়া হয়েছে তখন যিনি ভক্ত তিনি নিন্দা করতে পারেন না। ভক্তের মধ্যে নিজের ভগবানের অমৃতবচন শোনার উৎকণ্ঠা থাকে। প্রেমী ভক্তের কাছে নিজের প্রিয়তমের কথা শোনার বিষয়ে কোনো সংশয়ই থাকে না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকায় তাঁর মধ্যে সাধনা তো এসেই গিয়েছে। তাতে এইটিই প্রমাণিত হয় যে যিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হবেন তিনিই গীতার অধিকারী। এর প্রত্যেকটি শ্লোককে মন্ত্র অথবা সূত্র যা কিছু মনে করে তাকে যতই গুরুত্ব দেওয়া হোক তা পর্যাপ্ত নয়। মাখন যেমন দুধের সার তেমনই গীতাও সকল উপনিষদের সারাংশ। সেইজন্য ব্যাসদেব বলেছেন—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

উপনিষদগুলি হল গাভী, ভগবান গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হলেন দোহনকারী, পার্থ হলেন গোবৎস, গীতারূপ মহান অমৃতই হল দুধ। উত্তম বুদ্ধি সম্পন্ন অধিকারী হলেন তার ভোক্তা।

গীতার এইরকম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেলে মানুষের অন্য কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। এতে সকল শাস্ত্রের পরিসমাপ্তি। গভীরে ডুব দিলে এর মধ্য থেকে অনেক অনুপম রত্ন পাওয়া যায়। বেশি মনন করলে জ্ঞানের ভাণ্ডার

খুলে যায়। তাই বলা হয়েছে—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥
(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৪৩/১)

গীতা ভগবানের স্বরূপ, শ্বাস—ভাব। এই শ্লোকের 'পদ্মনাভ' এবং 'মুখপদ্ম' শব্দ দুটিতে খুবই বিশিষ্ট ভাব রয়েছে। এদের মধ্যে যে ভিন্নতা এবং রহস্য আছে সে দিকেও মন দিতে হবে। ভগবানকে 'পদ্মনাভ' বলা হয়। কেননা তাঁর নাভি থেকে পদ্ম বার হয়েছে এবং সেই পদ্ম থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মার মুখ থেকে চারটি বেদ নিঃসৃত হয়েছে এবং সকল শাস্ত্রে সেই বেদেরই বিস্তার করা হয়েছে। এখন গীতার উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তা করুন। তা স্বয়ং পরমাত্মার মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত হয়েছে। সুতরাং গীতা হলো ভগবানের হৃদয়। তাই একথা মানতে হয় যে গীতার মধ্যে সকল শাস্ত্র সমাবিষ্ট। যিনি কেবল গীতার সম্যক অনুশীলন করেছেন তাঁর অন্য শাস্ত্রের ব্যাপকতার প্রয়োজন নেই। তাঁর কল্যাণের জন্য গীতার একটি শ্লোকই যথেষ্ট।

এখন 'সুগীতা'-র অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। এটা ঠিক যে কেবল গীতা পাঠেই পাঠকের কল্যাণ হতে পারে। কেননা ভগবান শপথ করেছেন—

অধ্যেষ্যতে চ য় ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।
(গীতা ১৮/৭০)

পাঠকের মধ্যে ঘাটতি এইটুকুই যে সে তার তত্ত্ব জানে না। এর চেয়ে উত্তম হল সে যে এর অর্থ এবং ভাবকে জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে এটি পাঠ করবে। এইভাবে যে একটি মাত্র শ্লোক পাঠ করে তাকে ঐ লোকটির অপেক্ষা বড় মনে করা হবে। এই হিসাব অনুসারে গীতার পাঠ শেষ করতে যদিও দুটি বছর লাগবে তবু ৭০০ শ্লোকের কেবল নিত্য পাঠের অপেক্ষা তার ফল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে। আবার অর্থ এবং ভাব উপলব্ধি করে যিনি গীতার পাঠ করেন তাঁর চেয়েও তিনিই বড় যিনি তাঁর জীবনকে গীতার অনুসারে পরিচালনা করেন। তিনি যদি দু বছরে একটি মাত্র শ্লোককে কাজে লাগান তাহলেও তিনিই বড়। কিন্তু সর্বোত্তম হলেন তিনি যিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্তির সাধনামণ্ডিত শ্লোকগুলির মধ্যে একটিকেও ধারণ করেন। একজন লোক লক্ষ লক্ষ শ্লোক পাঠ করে ফেললেন। আর একজন পাঠ করলেন সাতশটি এবং তৃতীয়জন কেবল

একটি। কিন্তু আমাদের এইটি মানতে হবে যে যিনি কেবল একটি শ্লোককেও আচরণে পর্যবসিত করেন তিনি লক্ষ লক্ষ শ্লোককে যিনি কেবল পাঠই করেন তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর গীতার সবকটি শ্লোককে অধ্যয়ন করে যিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে জীবনে কার্যান্বিত করেন তাঁকেই 'গীতা সুগীতা' করে নিতে হয়। গীতা-অনুসারে যিনি জীবন যাপন করেন সেই জ্ঞানী গীতার চৈতন্যময় মূর্তি।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে গীতার শ্লোকগুলির মধ্যে যদি কেবল একটিকেও কাজে লাগালে মানুষের কল্যাণ হয় তাহলে সেগুলির সঠিক নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কেননা গীতার প্রায় সব শ্লোকই জ্ঞানপূর্ণ এবং কল্যাণকর। তাহলেও সমগ্র গীতার এক তৃতীয়াংশ শ্লোক এমন্ বৈশিষ্টপূর্ণ বলে মনে হয় যার মধ্য থেকে একটিও ভালভাবে বুঝে কার্যান্বিত করলে অর্থাৎ সেই অনুসারে নিজের আচরণ পরিচালনা করলে মানুষ পরমপদকে লাভ করতে পারে। সেই শ্লোকগুলির পূর্ণ তালিকা না দিয়ে পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ নিচে করা হচ্ছে—

অধ্যায়—২, শ্লোক ২০, ৭১ ; অ.—৩, শ্লো.—১৭-৩০ ; অ.—৪, শ্লো.—২০-২৭ ; অ.—৫, শ্লো.—১০, ১৭, ১৮, ২৯ ; অ.—৬, শ্লো.—১৪, ৩০, ৩১, ৪৭ ; অ.—৭, শ্লো.—৭, ১৪, ১৯ ; অ.—৮, শ্লো.—৭, ১৪, ২২ ; অ.—৯, শ্লো.—২৬, ২৯, ৩২, ৩৪ ; অ.—১০, শ্লো.—৯, ৪২ ; অ.—১১, শ্লো.—৫৪, ৫৫ ; অ.—১২, শ্লো.—২, ৮, ১৩, ১৪ ; অ.—১৩, শ্লো.—১৫, ২৪, ২৫, ৩০ ; অ.—১৪, শ্লো.—১৯, ২৬ ; অ.—১৫, শ্লো.—৫, ১৫ ; অ.—১৬, শ্লো.—১ ; অ.—১৭, শ্লো.—১৬ ; এবং অধ্যায় ১৮, শ্লো.—৪৬, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৫, ৬৬।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির একটিকেও যিনি কার্যান্বিত করেন তিনি মুক্ত হয়ে যান। যিনি গীতার অর্থ এবং ভাব উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা-প্রেমের সঙ্গে তার অনুসরণ করেন তাঁর প্রতিটি রোমকূপে গীতা সেইভাবে অধিষ্ঠান করে, যেমনভাবে পরম ভাগবত হনুমানের প্রতিটি রোমকূপে রাম সমাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে গীতা পাঠ করেন তখন মনে হয় যে তাঁর প্রতিটি রোমকূপ থেকে যেন গীতার সুমধুর সঙ্গীত রস প্রবাহিত হচ্ছে।

গীতার বিষয়-বিভাগ

গীতার বিষয় খুবই গভীর এবং রহস্যপূর্ণ। সাধারণ মানুষদের তো কথাই

নেই, এতে বড় বড় বিদ্বানেরাও মোহিত হয়ে যান। কেউ কেউ তো নিজেদের ধারণানুসারেই এর অর্থ করে থাকেন। তাঁরা এ থেকে তাঁদের মতানুসারে সমাধান পেয়ে যান। কেননা এতে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান সব বিষয়েরই সমাবেশ আছে। আর যেখানে সে বিষয়টি এসেছে সেখানে ভগবান সেই বিষয়টির যথার্থ প্রশংসা করেছেন। তাই নিজেদের মতকে পুষ্ট করার জন্য বিদ্বানেরা এতে তাঁদের অনুকূল সামগ্রী পেয়ে যান। এজন্য এঁরা কাদার ঢেলার মতো নিজেদের সিদ্ধান্তকে টেনে গীতার মতের অনুকূলে নিয়ে যান। যাঁরা অদ্বৈতবাদী (এক ব্রহ্মকে যাঁরা মানেন) তাঁরা গীতার প্রায় সমস্ত শ্লোককে অভেদের দিকে, যাঁরা দ্বৈতবাদী তাঁরা দ্বৈতের দিকে আর কর্মযোগীরা কর্মের দিকে একে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ জ্ঞানীদের কাছে এই গীতা শাস্ত্র জ্ঞানের, ভক্তের কাছে ভক্তিযোগের এবং কর্মযোগীর কাছে কর্মের প্রতিপাদক বলে প্রতীত হয়। ভগবান অর্জুনের কাছে খুবই গুরুত্ব সহকারে এই রহস্যময় গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। তা দেখে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ একে আত্মস্থ করে এবং উন্মুক্ত গলায় বলে যে তাদের সিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদন এই গ্রন্থে করা হয়েছে। কিন্তু ভগবান দ্বৈত, অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি কোনো বাদ বা ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি কিংবা বিশেষ দেশকে লক্ষ্য করে এটি রচনা করেননি। এতে না আছে কোনো ধর্মের নিন্দা, না আছে কোনো ধর্মের পুষ্টিকরণ। এটি এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং ভগবানের দ্বারা কথিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই একে প্রামাণিক বলে মেনে নেওয়া উচিত। অন্য শাস্ত্রের প্রমাণের প্রয়োজন এর নেই। এটি স্বয়ং অন্য শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ।

কোনো কোনো আচার্য বলে থাকেন যে এর প্রথম ছটি অধ্যায়ে কর্মের, দ্বিতীয় ছটি অধ্যায়ে ভক্তির এবং পরের ছটি অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের এই কথা কিছুটা মানা যায়। কিন্তু যদি মনোযোগের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে বোঝা যাবে যে দ্বিতীয় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সব অধ্যায়েই কমবেশি কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং গভীর বিবেচনা করলে গীতার বিভাগ নিম্নরূপ হওয়াই উচিত—

প্রথম অধ্যায়ে মোহ এবং স্নেহের কারণে অর্জুনের যে শোক ও বিষাদ হয়েছিল তার বর্ণনা থাকায় এই অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে অর্জুন-বিষাদ যোগ। এতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশের প্রসঙ্গ নেই। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল অর্জুনকে উপদেশের অধিকারী করে তোলা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে

সাংখ্য এবং নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা আছে। প্রধানত ২য় অধ্যায়ের ৩৯ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বিস্তৃতভাবে নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়কে নানা রকম যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ভক্তি এবং জ্ঞানের কথাও প্রসঙ্গত এসে গিয়েছে; যেমন, ৫ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক থেকে ২৬তম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের কথা এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১১শ পর্যন্ত ভক্তির কথা আছে। শেষ ছয়টি অধ্যায়ে ধ্যানযোগের প্রতিপাদন করা হয়েছে। অন্যভাবে আমরা এটিকে মনঃসংযোগের বিষয় বলতে পারি। এজন্য এর নাম হল আত্মসংযমযোগ। ৭ম থেকে ১২শ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তির রহস্যকে তত্ত্ব ও প্রভাবের দ্বারা নানা রকম যুক্তি উত্থাপন করে বোঝান হয়েছে। এইজন্য ভগবান ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এই ছটি অধ্যায়ের সমূহকে ভক্তিযোগ বা উপাসনাকাণ্ড নামও দেওয়া যায়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় দুটিতে তো প্রধানত জ্ঞানযোগের প্রতিপাদন আছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবানের রহস্য এবং ভক্তিযোগের কথা প্রভাব সহকারে বলা হয়েছে। ১৬শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদসম্পন্ন মানুষদের লক্ষণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও নীচ পুরুষদের আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান হয়। তাই একে অংশত জ্ঞানযোগ প্রতিপাদক মনে করলে কোনো আপত্তি নেই। ১৭শ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রায়ই নিষ্কাম-কর্মযোগ-বুদ্ধির দ্বারা যজ্ঞ, দান এবং তপাদি কর্মগুলির বিভাগ করা হয়েছে। অতএব একে নিষ্কাম-কর্মযোগ-বিষয়ের অধ্যায় বলেই মনে করা উচিত। ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান উপসংহাররূপে সকল বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। যথা, ১ থেকে ১২ পর্যন্ত এবং ৪১ থেকে ৪৮ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ, ১৩ থেকে ৪০ এবং ৪৯ থেকে ৫৫ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানযোগ আর ৫৩ থেকে ৬৬ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত কর্মসহ ভক্তিযোগ।

গীতোপদেশের প্রারম্ভ ও পর্যাবসান

গীতার মুখ্য উপদেশের প্রারম্ভ **'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'** প্রভৃতি শ্লোক থেকে হয়েছে। এইজন্য লোকেরা এটিকে গীতার বীজ বলেন। কিন্তু **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব'** (২।৭) প্রভৃতি শ্লোকগুলিকেও বীজ বলা হয়েছে ; কেননা অর্জুনের ভগবৎ-শরণ হওয়ার কারণেই ভগবানের দ্বারা একে গীতোপনিষদ্ বলা

হয়েছে। গীতার পর্যাবসান—সমাপ্তি শরণাগতিতে হয়েছে,যথা—

সর্বাধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

(১৮/৬৬)

"সকল ধর্ম অর্থাৎ সকল কর্মের আশ্রয়কে ত্যাগ করে কেবল এক আমাকেই—সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মার অনন্য শরণকে প্রাপ্ত কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুমি শোক কর না।"

প্রঃ—ভগবান অর্জুনকে কী শেখাতে চাইছিলেন?

উত্তর—তত্ত্ব ও প্রভাবসহকারে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ।

প্রঃ—গীতাতে প্রধানত ধারণ করার যোগ্য কতগুলি বিষয় আছে?

উত্তর—ভক্তি, কর্ম, ধ্যান এবং কর্মযোগ। এই চারটি বিষয় দুটি নিষ্ঠার (সাংখ্য ও কর্ম) অন্তর্গত।

প্রঃ—গীতা অনুসারে যে সিদ্ধ পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করেছেন তাঁর প্রায় সকল লক্ষণগুলির মালাকে গেঁথে রাখার সূতার মতো আধারস্বরূপ কী?

উত্তর—সমতা।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতঃ মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

(গীতা ৫/১৯)

যাঁদের মন সমত্ব-ভাবে অবস্থিত—তাঁরা ইহলোকে থেকেও এই জন্ম-মরণ রূপ সংসারকে অতিক্রম করেন। যেহেতু সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ এবং সমদর্শী সেই হেতু তাঁরা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন।

মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, মিত্র-শত্রু এবং ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের ক্ষেত্রে যাঁরা সমবুদ্ধি—গীতার দৃষ্টিতে তাঁরাই জ্ঞানী।

প্রঃ—গীতা কী শেখায়?

উত্তর—আত্মতত্ত্বের জ্ঞান এবং ঈশ্বরে ভক্তি, স্বার্থ ত্যাগ এবং ধর্মপালনের জন্য প্রাণোৎসর্গ। যিনি এই চারটির মধ্যে কেবল একটিকেও জীবনে সক্রিয় করে নেন—একটিকেও সম্যকভাবে অনুশীলন করেন তিনি স্বয়ং মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে অপরের কল্যাণ কর্মে সমর্থ হতে পারেন। যাঁর মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা হয়—যিনি চান যে খুব তাড়াতাড়ি পরমাত্মা লাভ করবো, তাঁকে ধর্মের জন্য নিজের প্রাণকে হাতের মুঠোয় ধরে থাকতে

হবে। যিনি ঈশ্বরের আদেশ মনে করে নিজের প্রাণকে ধর্মের বেদিতে বিসর্জন দেন, তাঁর প্রাণ-বিসর্জন প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার জন্যই হয়ে থাকে। ফলে ঈশ্বরকেও তখন তাঁর কল্যাণ করার জন্য বাধ্য হতে হয়। গুরু গোবিন্দ সিং-এর ছেলেরা যেমন ধর্মার্থে নিজেদের প্রাণকে আহুতি দিয়ে মুক্তি লাভ করেছিল তেমনই যিনি ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য সবকিছু আহুতি দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন তাঁর কল্যাণ সম্পর্কে কী সংশয় থাকতে পারে?

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।' (গীতা ৩/৩৫)

আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর মানুষ নির্ভয় হয়ে যায়। কেননা তিনি একথা ভালভাবেই বুঝে নেন যে আত্মার কখনও বিনাশ হয় না।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীতা ২/২০)

যতদিন মানুষের অন্তঃকরণে কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভয় থাকে ততদিন বুঝে নিতে হবে আত্মতত্ত্ব থেকে সে বহু দূরে অবস্থিত। ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার রহস্য সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান আছে সেই মানুষ ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণকে হোম করতে পারেন। এইটিই তাঁর পরীক্ষা। প্রকৃত স্বার্থত্যাগও এইটিই। ভগবৎ-বচনের গুরুত্ব এবং রহস্যকে যে ব্যক্তি বুঝেছেন তিনি প্রয়োজন হলে স্ত্রী, পুত্র, অর্থাদির কথা বাদ দিন, প্রাণোৎসর্গ করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হন না। তিনি তার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। যে মানুষ ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য পালনের তত্ত্ব জেনে নেন তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় মান-সম্মান প্রভৃতি বড় বড় স্বার্থেও বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। এমন মানুষদের জীবন- ধারণ কেবল ভগবানের প্রীত্যর্থে অথবা লোকহিতার্থেই হয়ে থাকে।

প্রঃ—গীতায় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোক কোন্‌টি?

উত্তর—**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

(গীতা ১৮/৬৬)

এই শ্লোকে কথিত শরণের প্রকারের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৯ম অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে এবং ১৮শ অধ্যায়ের ৬৫তম সংখ্যক শ্লোকে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

প্রঃ—ভগবান তাঁর প্রদত্ত উপদেশগুলির মধ্যে গুহ্যতম উপদেশ কোন্‌টিকে

বলেছেন?

উত্তর— **মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।'**
'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' প্রভৃতিকে (১৮।৬৫-৬৬)

প্রঃ—গীতা শোনাবার জন্য ভগবানের কী লক্ষ্য ছিল?

উত্তর—অর্জুনকে সম্পূর্ণরূপে নিজের শরণাগত করা।

প্রঃ—এর পূর্তি কোথায় হয়েছে?

উত্তর—১৮শ অধ্যায়ের ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।

'হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়ে গিয়েছে, আমি স্মৃতি লাভ করেছি, এজন্য আমি সংশয় রহিত হয়ে স্থিত হয়েছি। আমি আপনার আদেশ পালন করব।'

(১০) গীতোক্ত সাম্যবাদ

আজকাল পৃথিবীতে সাম্যবাদের খুবই আলোচনা হয়ে থাকে। সকল বিষয়ে সমতা আচরিত হোক একেই লোকেরা সাম্যবাদ মনে করে এবং এমন প্রয়াস করে থাকে যাতে সর্ব আচরণে সমতা থাকে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে পরমাত্মার এই অসম সৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রে সমতা কখনও হতে পারে না এবং হওয়ার কোনো প্রয়োজনও নেই। পৃথিবীতে সকলের আকৃতি একরকম নয় ; বুদ্ধি, বল, শরীর, স্বভাব, গুণ, কর্ম প্রভৃতিতেও সমতা নেই। এই রকম অবস্থায় দেশ, কাল, পাত্র এবং পদার্থে সর্বত্র আদর্শগতভাবে সমতা কখনই সম্ভব নয়। এর ফলে এই প্রকারের সাম্যবাদ সফল হতে পারে না, তা সফল হওয়া কখনও সম্ভবই নয়।

প্রকৃত সাম্যবাদের প্রকাশ ভারতীয় ঋষিদের প্রজ্ঞাতে ঘটেছিল। শাস্ত্রগুলিতে এর অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান জীবন্মুক্তের প্রধান লক্ষণরূপে 'সমতা'-কেই প্রতিপাদন করেছেন। এই 'সমতা'-ই সর্বোচ্চ সাম্যবাদ, এইটিই প্রকৃত একতা, এইটিই পরমেশ্বরের স্বরূপ। এটি ধর্মমণ্ডিত। এতে মর্যাদাহীন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অবকাশ নেই, এটি পরম আস্তিক, রসময়, শান্তিপ্রদ, রহস্যমণ্ডিত, সকল দুঃখের চির-বিনাশকারী। মুক্তিদাতা অথবা সাক্ষাৎ মুক্তিরূপই, এতে স্থিত হওয়ার নামই হলো ব্রাহ্মী স্থিতি। যে মানুষ এই সাম্যবাদে স্থিত তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি গুণাতীত, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই ভক্ত এবং তিনিই জীবন্মুক্ত। এই সাম্যবাদ কেবল কল্পনা নয় ; এটি আচরণযোগ্য এবং সকলেই এই আচরণ করতে পারে। এই সমতাই হলো পরমাত্মা। যিনি সর্বত্র এই সমতাকে প্রাপ্ত করেন, মনে করা যেতে পারে যে তিনি সমগ্র সংসারকে জিতে নিয়ে পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করে নেন। ভগবান গীতায় বলেছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।

(গীতা ৫/১৯)

'যাদের মন সমত্বভাবে স্থিত তারা জীবিতাবস্থাতেই সমগ্র সংসারকে জয় করেন, কেননা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ এবং সম। তার ফলে তারা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই স্থিত হয়ে যায়।'

এই সমতা যেখানে সেখানেই সর্বোচ্চ ন্যায় ; ন্যায়ই সত্য এবং সত্য পরমাত্মার স্বরূপ। যেখানে পরমাত্মা সেখানে নাস্তিকতা, অধর্মভাবনা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অসত্য, কপটতা, হিংসা প্রভৃতির কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং যেখানে এই সমতা আছে সেখানে কোনো রকম অনর্থ থাকতেই পারে না, সেখানে সৎগুণগুলির বিকাশ আপনা আপনি হয়ে যায়, কেননা আনুকূল্য-প্রতিকূলতা থেকেই রাগ-দ্বেষাদি সমস্ত দোষ এবং দুরাচারের উৎপত্তি হয়, এবং সমতায় সেগুলি থাকতেই পারে না। এজন্য সেখানে কোনো রকমের দোষ ও দুরাচারের স্থান নেই।

সমতা সাক্ষাৎ অমৃত, বৈষম্য হলো বিষ? সংসারে এটি খুবই প্রত্যক্ষ হয়। এজন্য সকল বস্তুতে, সমস্ত কর্মে, এবং সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চে যিনি সমতায় অধিষ্ঠিত তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ। এই সমতার তত্ত্বকে সহজভাবে ভাল করে বোঝাবার জন্য ভগবান গীতায় অনেকভাবে সকল ক্রিয়া, ভাব, বস্তু এবং প্রাণীদের মধ্যে সমতার ব্যাখ্যা করেছেন। যথা—

মানুষদের মধ্যে সমতা

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।। (৬/৯)

'(যে মানুষ) সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষী, বন্ধু, ধর্মাত্মা এবং পাপীদের সঙ্গেও সমমনোভাবাপন্ন তিনি অতি শ্রেষ্ঠ।'

মানুষ ও পশুদের মধ্যে সমতা

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। (৫/১৮)

'জ্ঞানীজনেরা বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর তথা চণ্ডালদেরও সমভাবে দেখে থাকেন।'

সকল জীবের মধ্যে সমতা

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। (৬/৩২)

'হে অর্জুন! যে যোগী নিজের আনুরূপ্য দ্বারা সকল বস্তুকে সমান দেখেন এবং সুখ ও দুঃখকেও (সমান দেখেন), সেই যোগীকে পরম শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে।'

কোথাও কোথাও ভগবান ব্যক্তি, ক্রিয়া, বস্তু এবং ভাবকে এক সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।

(১২/১৮)

'(যে মানুষ) শত্রু-মিত্রে এবং মান-অপমানে শৈত্য-উষ্ণে, সুখে-দুঃখে সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন এবং (সমগ্র সংসারে) আসক্তি বর্জিত, (তিনি ভক্ত)।'

এখানে শত্রু-মিত্র 'ব্যক্তি'বাচক, মান-অপমান 'পরকৃত ক্রিয়া', 'শৈত্যে-উষ্ণতা' বস্তু এবং 'সুখ-দুঃখ' হলো ভাব।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।

(১৪/২৪)

'(যিনি) সব সময় আত্মভাবে স্থিত থেকে দুঃখ-সুখকে সমান মনে করেন, (এবং) মাটি, পাথর এবং সোনার প্রতি সমভাবাপন্ন এবং ধৈর্যশীল; (তাছাড়া) যিনি প্রিয় এবং অপ্রিয়কে সমতুল্য মনে করেন এবং নিজের নিন্দা-স্তুতিতে সমভাবে থাকেন (তিনিই গুণাতীত)।'

এখানেও দুঃখ-সুখ হলো 'ভাব'; ইট, পাথর, কাঞ্চন হলো 'বস্তু'; প্রিয়-অপ্রিয় সর্ববাচক এবং নিন্দা-স্তুতি হলো 'পরকৃত ক্রিয়া'।

এইভাবে সর্বত্র যাঁর সমদৃষ্টি, আচরণে অহং-মমত্ব রেখেও যিনি সকলের প্রতি সর্বদা সমবুদ্ধি পোষণ করেন, যাঁর সমগ্র সংসারে সমদৃষ্টি রূপ আত্মভাব থাকে তিনি সমতাযুক্ত পুরুষ, আর তিনিই প্রকৃত সাম্যবাদী।

এই সমতার সম্বন্ধ প্রধানত আন্তরিকতায় পূর্ণ, এর মধ্যে সর্বত্র সমদর্শন আছে, সমবর্তন নেই অর্থাৎ উপরের ব্যবহারে সাদৃশ্যতা নেই। এই সমত্ব বাহ্যিক আচরণে সর্বত্র এক রকম হয় না। বাহ্যিক ব্যবহারে সমত্বভাব প্রদর্শন তো যারা দাম্ভিক ও শাস্ত্রকে অবহেলনা করে—তারাও করতে পারে। এই সমতার রহস্য এত গূঢ় যে কর্মে এবং আচরণে যথোচিত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এতে বাস্তবে কোনো বাধা আসে না। বরং দেশ, কাল, পাত্র, জাতির ভিন্নতার কারণে কোথাও কোথাও তো বাহ্যিক আচরণে বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গত এবং আবশ্যক মনে করা হয়। কিন্তু সেই বৈষম্য দূষিত নয় এবং তার ফলে প্রকৃত সমতায় কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

একটি বিপদগ্রস্ত দেশ এবং আর একটি হলো সমৃদ্ধ দেশ। এই দুটি দেশের মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবেই। বিপদগ্রস্ত দেশকে সেবা করা প্রয়োজন, সমৃদ্ধ দেশকে সেই প্রয়োজন নেই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের এই বৈষম্যের প্রয়োজনকে কে দূষিত বলতে পারে? তবে, ঐ বিপদগ্রস্ত দেশে যদি মমতা ও স্বার্থের মানসিকতায় দুঃখী লোকেদের সেবায় তারতম্য করা হয় তবে সেই বৈষম্য অবশ্যই দূষণীয়। মনে করুন, কোনো এক জায়গায় বন্যা হলো, মানুষ ডুবে যাচ্ছে। সেখানে যদি এই রকম মানসিকতা হয় যে অমুক লোকটি ইউরোপীয়, অমুক লোকটি ভারতীয়, আমরা ভারতীয় তাই ভারতীয়দেরই বাঁচাব, ইউরোপীয়দের বাঁচাব না অথবা ওরা মুসলমান, আমরা হিন্দু, তাই আমরা আমাদের জাতিদের লোকেদেরই বাঁচাব, বিজাতীয়দের বাঁচাব না—তবে এই প্রকারের দেশ ও জাতি সম্পর্কে আন্তরিক ভেদবুদ্ধিজনিত যে বৈষম্য তা অবশ্যই দূষিত। বিপদের সময়ে দেশ, কাল, জাতি এবং আত্মীয়তার অহঙ্কার ত্যাগ করে সকলের সমভাবে সেবা করা উচিত। মমতা, স্বার্থ এবং আসক্তি বশে যে দেশ, কাল, বস্তু, জাতি প্রভৃতি নিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় বাস্তবে সেইটিই হলো অসাম্য। মহাপুরুষদের মধ্যে এই রকম অসাম্য থাকে না।

এই ভাবে কাল-ভেদের কারণেও আচরণে বৈষম্য হয়। আমরা রাত্রে ঘুমাই, দিনের বেলায় কাজকর্ম করি। সকাল সন্ধ্যা সন্ধ্যা-বন্দনাদির দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করি। এই বৈষম্যের প্রয়োজন আছে। আবার দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন দান করতে হয়। গরমকালে জল দেওয়ার যত প্রয়োজন শীতকালে তত নয়। বস্ত্রদানের প্রয়োজন শীতকালে যত বেশি গ্রীষ্মকালে তত নয়, শীতের সময় আগুন জ্বেলে শরীরকে গরম করা হয়, গ্রীষ্মকালে তার প্রয়োজন হয় না। ছাতা খোলা হয় বর্ষাকালে, শীতের সময় নয়। কিন্তু এই যে ব্যবহারে অসাম্য তা কেবল যুক্তিযুক্ত নয়, তাকে প্রয়োজন বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে।

গরু, কুকুর, হাতি, চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া এবং ব্যবহারে অসাম্য সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত। ঘাস-পাতা হলো গরু এবং হাতির খাদ্য। মানুষের নয়। কুকুর মাংসও খায় কিন্তু গরু এবং হাতির পক্ষে তা উপযোগী নয়। আর মানুষের কাছে তা একেবারেই অনুপযোগী। এদের সকলের এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া কখনই সম্ভব নয়। কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এই পাঁচ ধরনের প্রাণীর সঙ্গে আচরণে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। মানুষ এবং

পশুর কথা তো আলাদা, ঐ তিন ধরনের পশুদের সঙ্গে আচরণও ভিন্ন প্রকৃতির। হাতির বদলে কুকুরের পিঠে কেউ সওয়ার হতে পারে না। গরুর বদলে কুকুরের দুধ কেউ খেতে পারে না। যারা সমদর্শনকে সমবর্তীতে পরিণত করে ব্যবহারে অভেদ আনতে চায় তারা প্রকৃতপক্ষে এর মর্ম বোঝে না। এদের মধ্যে যে বিভেদ তা প্রকৃতিগত, একে কোনোভাবে দূর করা সম্ভব নয়। তবে একথা ঠিক যে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হাতি, গরু, কুকুর প্রভৃতি সকল প্রাণী দুঃখে পতিত হলে তাদের দুঃখ দূর করে সুখ প্রদানের জন্য সেই রকম ব্যবহারই করা উচিত যা আমরা আমাদের হাত, পা, মাথা প্রভৃতি অঙ্গের দুঃখ নিবারণ করে সুখ প্রদানের জন্য করে থাকি। আমাদের নিজেদের দেহের প্রতি আমাদের যে 'আত্মত্ব' ভাব সকলের প্রতি ঠিক তেমনই হওয়া উচিত। এই সাম্যের নামই হলো সমতা।

অনুরূপভাবে মাটির ঢেলা, পাথর এবং সোনার মধ্যে ব্যবহারিক ভেদ প্রয়োজন। মাটির ঢেলাকে সামলে রাখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সোনাকে সুরক্ষিত রাখতে হয়। সোনার বদলে মাটি বা পাথরের আদান-প্রদান হতে পারে না। এগুলির সংগ্রহ-গ্রহণ, আদান-প্রদান, ব্যবহার, মূল্য প্রভৃতিতে বৈষম্য থাকেই। তবে আন্তরিকভাবে এগুলির মধ্যে বিভেদ মান্য করা উচিত নয়। নিজেদের সঙ্কট মোচনের জন্য যেমন অর্থকে জলের মতো খরচ করা হয়, তেমনই অন্য প্রাণীদের মঙ্গলের জন্যও অর্থকে ধূলার মতন খরচ করা উচিত। লোভের বশবর্তী হয়ে অর্থ সংগ্রহ করা এবং ন্যায্য ও প্রয়োজনের সময় খরচ না করাই হলো বৈষম্য। যেখানে এই বৈষম্য থাকবে সেখানে ন্যায়-অন্যায়ের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যয় করতে দ্বিধা হবে। অতএব অন্যায়ভাবে উপার্জন করবার সময় এবং ন্যায্য খরচ করবার সময় অর্থকে ধূলার মতো মনে করে ঐভাবে উপার্জন করা থেকে এবং ব্যয় করার সঙ্কোচ থেকে বিরত থাকতে হবে, এই হলো '**সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ**'। একজনের কাছে টাকাকড়ি নেই আর অন্য জন অর্থ ও ভোগ সামগ্রী সংগ্রহ করে। কিন্তু সে যদি নিজের এবং আত্মীয়দের জন্য অথবা ভোগসুখের জন্য তা না করে সকল প্রাণীদের মঙ্গলের জন্য করে, তবে এই সংগ্রহে বৈষম্য থাকলেও তা দূষিত নয়, বরং তা প্রয়োজনীয়।

বস্তুসমূহের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করুন। আগুন এবং জলের মধ্যে বৈষম্য আছে, বিষ এবং অমৃতের মধ্যে বিষমতা আছে, মিষ্টি এবং তিক্তের মধ্যেও

আছে বৈষম্য। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য আছে, বৈষম্য আছে পুরুষদের পরস্পরের সঙ্গে, পিতা-পুত্রের ভেদ আবশ্যক। স্ত্রীলোকদের মধ্যে মা এবং স্ত্রীর মধ্যে ভেদ থাকা ধর্ম। নিজেদের শরীরেও ডান হাত এবং বাম হাতের মধ্যে ব্যবহারগত ভেদ যুক্তিযুক্ত। সংসারে যেখানে বিশেষ সমতার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে সেখানে বলা হয় যে 'এই দুটি আমার ডান ও বাম হাতের মতো'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ডান ও বাম হাতের ব্যবহারে খুবই ভিন্নতা রয়েছে। খাওয়া, পান করা, দান, সম্মান প্রভৃতি ভাল ও প্রধান প্রধান ক্রিয়াগুলির অধিকাংশই ডান হাত দিয়ে করা হয় আর শৌচাদি অপবিত্র কাজগুলি করা হয় বাম হাতে। এই রকম ব্যবহারিক ভেদ নিজেদের অঙ্গতেও আছে। হাত, পা, মাথা সবই একটি শরীরের অঙ্গ। কিন্তু পায়ের ব্যবহার হয় শূদ্রের, হাতের ব্যবহার হয় ক্ষত্রিয়ের এবং মাথার ব্যবহার হয় ব্রাহ্মণের মতো। কারো সৎকার করবার সময় মাথা নোয়াতে হয়। পা-কে সামনে ছড়ান হয় না। মাথায় লাঠির আঘাত এলে হাত দিয়ে আটকান হয়, পা দিয়ে আড়াল করা হয় না। পায়ের উপর লাঠির বাড়ির সম্ভাবনা থাকলে পাকে গুটিয়ে বসা হয় এবং পা-কে বাঁচিয়ে হাত ও পিঠের উপর আঘাত সহ্য করা হয়। কারও গায়ে পা ঠেকলে মাথা নিচু করে এবং হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। শরীরে সব অঙ্গই আমাদের। তাহলে গায়ে পা লাগুক বা হাত লাগুক তাকে কী যায় আসে? কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ কথা মানা হয় না। মাথায় হাত স্পর্শ করলে হাতকে অপবিত্র মনে করা হয় না। কিন্তু লিঙ্গ এবং গুহ্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে হাত লাগলে হাত ধুতে হয়। যখন নিজেদের শরীরের ব্যবহারেই এতটা বিভেদকে প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়েছে তখন দেশ, কাল, জাতি এবং বস্তু-সমূহের মধ্যে যে অনিবার্য ভিন্নতা, তাকে দূষিত মনে করা তো সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং নীতিবিরুদ্ধ। এত ভিন্নতা থাকলেও আন্তর্দৃষ্টিতে কোনো ভেদ নেই। কোনো অঙ্গে আঘাত লাগলে তাকে ভাল করবার জন্য সমান চেষ্টা করা হয় আর দুঃখ-যন্ত্রণাও সমান হয়ে থাকে। প্রসূতি ও রজস্বলা অবস্থাতে আমরা আমাদের পূজনীয়া মায়ের সঙ্গেও অস্পৃশ্যের মতো ব্যবহার করি। কিন্তু মা যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে আমরা সেই অবস্থাতেও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করি। তারপর স্নান করে পবিত্র হয়ে যাই। এইভাবে পশু, পাখি, এবং মানুষদের মধ্যে যাদের অস্পৃশ্য মনে করা হয় তাদের সঙ্গে অন্য সময়ে ব্যবহারে বিভেদ করা হলেও তাদের দুঃখের সময় তাদের প্রেমপূর্বক সেবা করা উচিত। সেবা

করার পর স্নান করে নিলে মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। এই প্রকারে শাস্ত্রানুমোদিত আচরণের বৈষম্য প্রয়োজন আছে এবং তা যথার্থ। একে অনুচিত মনে করাই অনুচিত। অবশ্য এর দ্বারা আত্মায় কোনো ভেদাভেদ হয় না এবং বিভেদ মানাও উচিত নয়। ভগবান গীতায় বলেছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।

(৬/২৯)

'হে অর্জুন! সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনায় একীভাবের দ্বারা স্থিতিরূপ যোগে যুক্ত হয়ে আত্মস্থ এবং সমদর্শী যোগী আত্মাকে সর্বভূতে বরফে জলের মতো ব্যাপক দেখেন এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে থাকেন। স্বপ্ন থেকে উত্থিত মানুষ যেমন স্বপ্নের সংসারকে নিজের ভিতরের স্বপ্নের আধারে দেখে, তেমনই সেই মানুষ সকল ভূতকে নিজের সর্বব্যাপী অনন্ত চেতন আত্মার অন্তর্গত সঙ্কল্পের আধারে দেখে।'

শ্রুতি বলে—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।

(ঈশোপনিষদ্ ৬-৭)

'যে বিদ্বান সকল ভূতকে আত্মস্থ দেখে এবং আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে দেখে সে কখনও কোনো প্রাণীকে ঘৃণা করতে পারে না। তত্ত্ববেত্তা পুরুষের কাছে যে সময়ে সকল ভূতপ্রাণী আত্মা হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি সকলকে আত্মাই বলে মনে করেন তখন সেই একত্বদর্শীর কাছে শোক এবং মোহ কিছুই থাকে না।'

এই প্রকার আচরণে শাস্ত্রের সীমার মধ্যে ভগবানের প্রীতি কামনায় অথবা লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মমতা এবং স্বার্থশূন্য হয়ে, ন্যায্য বৈষম্য অনুসরণ করতে থাকলেও সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ব্রহ্মকে সমভাবে দেখা এবং রাগ-দ্বেষ প্রতি বিকার থেকে রহিত থেকে মান-অপমান, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, শত্রু-মিত্র, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ, শৈত্য-উষ্ণতা প্রভৃতি দ্বন্দ্বতে সর্বদা সমতাযুক্ত থাকাই হলো যথার্থ সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদ থেকে পরম কল্যাণের প্রাপ্তি হতে পারে।

বর্তমানের সাম্যবাদ ঈশ্বর বিরোধী এবং এই গীতোক্ত সাম্যবাদ সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করে। ওটি হলো ধর্মনাশক এবং এটি প্রতি পদে ধর্মকে পুষ্ট করে। ওটি হিংসায় পরিপূর্ণ এটি অহিংসার প্রতিপাদক। ওটি স্বার্থমূলক এটি স্বার্থকে কখনই কাছে আসতে দেয় না। ওটি খাওয়া-পানকরা-স্পর্শ করার মধ্যে একতা বজায় রেখে আন্তরিক ভেদভাবকে পোষণ করে, এটি ঐগুলিতে শাস্ত্রের সীমানানুসারে যথাযোগ্য ভেদ বজায় রেখেও আন্তরিক ভেদকে অনুসরণ করে না এবং সকলের মধ্যে আত্মাকে অভিন্ন দেখার শিক্ষা দেয়। ওর লক্ষ্য কেবল ধনের উপাসনা আর এর লক্ষ্য ঈশ্বরকে লাভ করা। ওতে নিজের গোষ্ঠীর জন্য অহঙ্কার এবং অন্যের প্রতি অনাদর ; এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অভিমান-শূন্যতা এবং সমগ্র জগতের মধ্যে পরমেশ্বরকে দর্শন করে সকলকে সম্মান করা, কাউকে পর মনে না করা। ওতে বাহ্যিক আচরণের প্রাধান্য এর মধ্যে অন্তঃকরণের ভাবের প্রাধান্য। ওতে ঐহিক সুখই প্রধান এতে আধ্যাত্মিক সুখ প্রধান। ওতে পরধন ও পরমতে অসহিষ্ণুতা, এতে সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। ওতে আছে রাগ-দ্বেষ যুক্ত আচরণ, এতে রাগ-দ্বেষ মুক্ত আচরণ।

অতএব এইসব বিষয়গুলি চিন্তা করে বুদ্ধিমান মানুষদের গীতোক্ত সাম্যবাদকেই সম্মান করা উচিত।

(১১) গীতার রহস্য

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতাঃ।।

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩/১)

'গীতা সুগীতা করার যোগ্য, অর্থাৎ গীতাকে ভালভাবে অধ্যয়ন করে তাকে অর্থ এবং ভাবসহ হৃদয়ে ধারণ করে নেওয়া এক মুখ্য কর্তব্য। কেননা এটি স্বয়ং পদ্মনাভ (বিষ্ণু) ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তাহলে আর অন্য শাস্ত্রগুলির ব্যাপকতার কী প্রয়োজন?'

এই কথা বলে ব্যাসদেব অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করেননি। এর তাৎপর্য হলো গীতায় প্রশংসা। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বিচার করতে হবে। এই শ্লোকে 'পদ্মনাভ' এবং 'মুখপদ্ম' শব্দ দুটির প্রয়োগ কেন করা হয়েছে? 'পদ্মনাভ' তো ভগবান বিষ্ণুর নাম এবং গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমল থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তাহলে তাঁকে 'পদ্মনাভ' কেন বলা হলো? এর তাৎপর্য হলো এই যে ভগবান গীতার ৪/৬-তে এটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি অজাত এবং ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও সংসারের উদ্ধারের জন্য প্রকট হন। ভগবান বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। অতএব ভগবান বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

এই গীতা সেই ভগবানের মুখ-কমল থেকে নিঃসৃত হয়েছে যাঁর নাভি থেকে কমল নির্গত হয়েছিল। সেই কমল থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা চারটি বেদ রচিত হয়েছে এবং ঋষিরা সেগুলিকে অবলম্বন করেই শাস্ত্রগুলি রচনা করেছেন। অতএব গীতাকে তার ভাবসহ ভাল করে বুঝে নিয়ে ধারণ করলে অন্য কোনো শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না। কেননা ভগবানের নাভি থেকেই তো সকল শাস্ত্রের বিস্তার হয়েছে, আর গীতা ভগবানের মুখ-কমল নিঃসৃত। এইটুকুই নয়, গীতা হলো সকল উপনিষদের সার।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।

'উপনিষদগুলি হলো গাভী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন তার দোহক।' তাৎপর্য হলো—সকল উপনিষদের সার নির্গত করে গীতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।। (গীতা ১৩/৪)

'ঋষিরা এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নানাভাবে বলেছেন এবং বিবিধ বেদমন্ত্রের দ্বারাও তা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কথিত হয়েছে। তাছাড়া ব্রহ্মসূত্র পদসমূহেও যুক্তিযুক্ত বিচারসহ নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে।' (আমার কাছ থেকে তুমি সেটি শোন।)

এখন চিন্তা করতে হবে যে গীতার সারভূত শ্লোক কোন্‌টি? চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ১৮তম অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকই তার সার বলে মনে হয়। সেটি এই প্রকার—

সর্বাধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

'সকল ধর্মকে অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে ত্যাগ করে তুমি কেবল সর্বশক্তিমান সর্বাধার পরমেশ্বর আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুমি শোক কর না।' এই শ্লোকেই গীতায় উপসংহার হয়েছে আর এইটিই নিয়ম যে কোনো গ্রন্থের উপক্রমণিকায় এবং উপসংহারে যে কথা থাকে সেটিই তার মুখ্য তাৎপর্য। অতএব ঐটি গীতার উপসংহার হওয়ায় ঐটিই গীতার মূল সার হওয়া উচিত।

এখন দেখতে হবে যে এই শ্লোক কোন্ উপক্রমণিকার উপসংহার। গীতার উপক্রমণিকা নিম্নরূপ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। (২/১১)

'হে অর্জুন! যাদের জন্য শোক করবার কোনো কারণ নেই তুমি তাদের জন্য শোক করছ আবার কথাও বলছ পণ্ডিতদের মতো। কিন্তু পণ্ডিতেরা যাদের প্রাণ চলে গিয়েছে তাদের জন্য এবং যারা এখনও জীবিত তাদের জন্যও শোক করেন না।' এই শ্লোকের প্রথম পদটি হলো **'অশোচ্যান্'** উপসংহারেও অন্তিম পদ হলো **'মা শুচঃ'**। এতে প্রমাণিত হয় যে গীতার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শোকনিবৃত্তি।

যুদ্ধের প্রারম্ভে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান দেখে অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তার মোহনিবৃত্তির জন্য গীতায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেই উপদেশের উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান চারটি কথা বলেছিলেন—

১। তুমি সকল ধর্ম ত্যাগ কর।

২। তুমি কেবল আমারই শরণ নাও।

৩। আমি তোমাকে পাপ থেকে মুক্ত করব।

৪। তুমি শোক কোর না।

এখানকার **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** কথাটির অর্থ কোনো কোনো মহানুভব ব্যক্তি সকল কর্মফল ত্যাগ বলেছেন। কিন্তু যে শব্দ রয়েছে তাতে এমন ভাব ব্যক্ত হয় না। অন্যেরা বলেছেন যে, এই কথা বলে ভগবান স্বরূপত সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করার কথা বলেছেন। কিন্তু এমন অর্থও যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা ভগবানের আদেশে অর্জুন তো যুদ্ধই করেছিল—একান্ত বাস তো করেনি। তৃতীয় পক্ষ বলেছেন যে ভগবানের অভিপ্রায় হলো কর্তব্য কর্মে রত থেকে কর্তৃভাব পোষণ করা, এটিও ঠিক নয়। কেননা জ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি সম্ভব হলেও এখানে কথাগুলি ভক্তিযোগের প্রকরণে বলা হয়েছে।

এখন এর অর্থ কী হতে পারে তা আমাদের দেখতে হবে। সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে যে 'শরণ' শব্দটির অভিপ্রায় কী? ভগবান গীতায় যে অর্থ গ্রহণ করেছেন আমাদেরও সেইটিই গ্রহণ করতে হবে। নবম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।

এর আগের বত্রিশতম এবং তেত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—'হে অর্জুন! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনি চণ্ডাল প্রভৃতি যেই হোক, সে আমার শরণ নিয়ে পরম গতিই লাভ করে। সুতরাং এতে বলার কী আছে যে পুণ্যবান ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ভক্তও পরম গতি লাভ করবেন! এজন্য তুমি সুখরহিত এবং ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য শরীর লাভ করে আমারই ভজনা কর।' এই ভাবে ভগবানের আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে উপরোক্ত শ্লোকে ভগবান

শরণ নেওয়ার স্বরূপের কথা জানিয়েছেন। এখানে ভগবান বলেছেন 'আমাতে' তদ্‌গত হও, আমার ভক্ত হও। আমার পূজক* হও। আমাকে প্রণাম কর। এইভাবে আত্মাকে আমার প্রতি নিযুক্ত করে এবং আমার প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তুমি আমাকে লাভ করবে। অতএব ভগবৎ স্মরণ এবং ভগবৎ সেবা, পূজা, নমস্কার প্রভৃতিতে তৎপর হয়ে ভগবানের আদেশানুসারে কর্ম করাই হলো গীতোক্ত 'শরণাগতি'। যেখানে ঈশ্বরের আদেশ এবং ধর্মপালনে আপাত বিরোধ দেখা যায় সেখানে ভগবানের শরণাপন্ন ভক্তের ভগবানের আদেশ পালন করাই প্রধান কর্তব্য। এই বিষয়ে মহাভারতের কর্ণবধ প্রসঙ্গের উপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

বীর কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল। সে সেটিকে বার করতে ব্যস্ত ছিল।

সেই সময় তার উপর বাণ নিক্ষেপ করতে দেখে কর্ণ অর্জুনকে বলেছিল 'হে মহাধনুকধারী অর্জুন! তুমি জগৎ প্রসিদ্ধ মহাবীর এবং মহাত্মা। তুমি সহস্রার্জুনের মতন যোদ্ধা, শস্ত্র এবং শাস্ত্রের জ্ঞাতা। অতএব তুমি একটু অপেক্ষা কর। যতক্ষণ না আমি চাকা বার করছি ততক্ষণ তুমি বাণ নিক্ষেপ কর না। কেননা তা ধর্ম নয়।' (মহাভারত, কর্ণপর্ব ৯০/১০৮-১১৬)

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বলেছিলেন 'হে রাধা পুত্র। তুমি এখন ভাগ্যবশত ধর্মকে স্মরণ করেছ। কিন্তু তোমরা নিজেদের কাজের দিকে খেয়াল রাখ না। হে কর্ণ! তোমরা ভীমকে বিষ খাইয়েছ। পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়েছ, দ্রৌপদীকে সভায় ডেকে এনে নানা রকম খারাপ কথা বলেছ এবং তাকে অপমানিত করেছ। সেই সময় তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল?'

বনবাসে ব্যতীতে চ বর্ষে কর্ণ ত্রয়োদশে।
ন প্রয়চ্ছসি যদ্রাজ্যং ক্ব তে ধর্মস্তদা গতঃ।।

(মহা. কর্ণপর্ব ৯১/৪)

'হে কর্ণ। যখন ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে থেকে পাণ্ডবরা ফিরে এসেছিল তখনও তোমরা তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দাওনি। সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?'

---

* গীতার ১৮/৪৬ এবং ৯/২৬-২৭-৩ অনুসারে এখানে পূজা বুঝতে হবে।

যদাভিমন্যুং বহবো যুদ্ধে জঘ্নুর্মহারথাঃ।
পরিবার্য রণে বালং ক্ব তে ধর্মস্তদা গতঃ।।

(মহা. কর্ণপর্ব ৯১/১১)

'যখন তোমরা অনেক মহারথী মিলে বালক অভিমন্যুকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলে হত্যা করেছিলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?'

'ঐসব অবস্থায় কি ধর্মের প্রয়োজন ছিল না? এখন তোমার ধর্মের কথা মনে পড়ছে! বেশি কথা বলে কোনো লাভ নেই। এখন তুমি বেঁচে থাকবে না।'

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় মাথা নত করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি কর্ণকে দিব্য বাণ দিয়ে মারো। যদিও সেই সময় অস্ত্রশূন্য হয়ে মাটিতে কর্ণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অর্জুন ধর্মযুক্ত কথা শুনে বাণ নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করেছিল তবু ভগবানের কথা শুনে তার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে গিয়েছিল এবং সে নিঃসঙ্কোচে কর্ণের উপর শর নিক্ষেপ করেছিল।* এইভাবে ভগবৎ আদেশ পালন করা প্রত্যেক ভক্তের কর্তব্য। এর নাম ভগবৎ শরণাগতি। ভগবৎ আদেশের সম্মুখে অন্য কোনো ধর্ম না মানা হলো 'সর্বধর্ম পরিত্যাগ'। ঈশ্বরের আদেশ এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ বলে মনে হলে ভগবৎ আদেশই মাননীয়। কেননা ধর্মের তত্ত্ব রহস্যময়, সাধারণ মানুষ তা স্থির করতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্লোকার্ধে বলেছেন—

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

এখানে 'মা শুচঃ' এই পদটি উপক্রমণিকার উপসংহার করবার জন্য বলা হয়েছে। অর্জুনের মোহবশে সম্ভাবিত যুদ্ধে স্বজনবধের জন্য শোক ছিল। অতএব ভগবান তার শোক নিবৃত্তির জন্য গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন যে আত্মা তো অশোচ্য, কিন্তু যদি তুমি শরীরের দিক থেকেও বিচার কর তাহলেও দেখবে যে শরীরও অশোচনীয়। কেননা—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।। (গীতা ২/২৮)

---

*বাস্তবে কর্ণের প্রতি শর নিক্ষেপ অর্জুনের কাছে অধর্ম ছিল না। কেননা আততায়ীকে যে কোনোভাবে আঘাত করাকে ধর্মানুমোদিত বলা হয়েছে। আর কর্ণ ছিল আততায়ী। ভগবানের কথায় এটি প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

'হে অর্জুন! সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল আবার মৃত্যুর পরেও তারা অপ্রকট হয়ে যাবে। কেবল মধ্যকালে তারা প্রকট থাকে। সুতরাং এই রকম অবস্থায় শোক কিসের জন্য?'

অতএব স্বভাবত বিনাশশীল হওয়ায় শরীরের জন্য শোক করা ব্যর্থ। আত্মার দৃষ্টিতে যদি চিন্তা করা হয় তাহলেও শোক করবার প্রয়োজন নেই। কেননা ভগবান বলেছেন—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।।

(গীতা ২/২৪-২৫)

'এই আত্মা অচ্ছেদ্য, এই আত্মা অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং নিঃসন্দেহে অশোচ্য। এবং এই আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপক, অচল, স্থির এবং সনাতন। এই আত্মা অব্যক্ত, এটি অচিন্ত্য এবং এই আত্মাকে বিকারমুক্ত বলা হয়েছে। অতএব হে অর্জুন! এই আত্মাকে উপরোক্ত প্রকারে জেনে নেওয়ায় তুমি শোক করতে পার না। অর্থাৎ তোমার শোক করা উচিত নয়।'

অতএব আত্মাকে নিয়ে চিন্তা করা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। এইরূপ উপদেশই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তারাকে দিয়েছিলেন—

ছিতি জল পাবক গগন সমীরা।
পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা।।
প্রগট সো তনু তব আগেঁ সোবা।
জীব নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোবা।।
উপজা জ্যান চরন তব লাগী।
লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাঁগী।।

(রামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড)

এ থেকে এইটি প্রমাণিত হয় যে শরীর অথবা আত্মা কারও জন্যই শোক করবার প্রয়োজন নেই। শ্রীভগবান বলেছেন—হে অর্জুন! যদি তুমি বল যে, শরীর থেকে আত্মা বিযুক্ত হওয়ায় আমি চিন্তিত, তাহলে তাও ঠিক নয়। কেননা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। (গীতা ২/২২)

'মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্রকে ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই রকম জীবাত্মা পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়।'

এই শ্লোকে শ্রীভগবান পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর প্রাপ্তিকে বস্ত্র পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করে অর্জুনকে আত্মার নিত্যতা জানিয়েছেন। বস্ত্রের উদাহরণের বিষয়ে কয়েক রকমের শঙ্কা করা হয়। তাই এখানে তার সমাধান করা হচ্ছে।

শঙ্কা—পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করলে মানুষের সুখানুভব হয়। কিন্তু পুরাতন শরীরকে ত্যাগ এবং নতুন শরীর ধারণে তো ক্লেশ হয়। সুতরাং এই উদাহরণটি যথার্থ নয়।

সমাধান—পুরাতন শরীর ত্যাগ এবং নতুন শরীর ধারণে অর্থাৎ মৃত্যু এবং জন্মতে অজ্ঞানীরই দুঃখ হয়। আর অজ্ঞানী তো বালকের মতো। ধীর, বিবেকবান এবং ভক্তের শরীর পরিত্যাগে দুঃখ হয় না। ভগবান বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।। (গীতা ২/১৩)

জীবাত্মার যেমন এই দেহে বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থা হয় তেমনই এর অন্য শরীর প্রাপ্তিও হয়ে থাকে ; ঐ বিষয়ে স্থিতধি পুরুষ মোহিত হন না। রামায়ণেও বলা হয়েছে—শ্রীরামচন্দ্রের চরণে পরম প্রীতি রেখে বালি সেইভাবে দেহ ত্যাগ করেছিল যেমন করে হাতি তার গলা থেকে মালা ফেলে দেয়। অর্থাৎ মৃত্যুর দুঃখ সে বুঝতেই পারেনি—

রাম চরন দৃঢ় প্রীতি করি বালি কীন্হ তনু ত্যাগ।
সুমন মাল জিমি কণ্ঠ তে গিরত ন জানই নাগ।।
(রামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড)

নতুন এবং পুরাতন বস্ত্রের পার্থক্য যে জানে তার তো পুরাতন বস্ত্র ফেলে দিতে এবং নতুন বস্ত্র পরিধান করতে আনন্দ-ই হয়। ছয় মাসের অথবা এক বছরের

শিশুর মা যখন তার পুরাতন নোংরা জামা খুলে ফেলেন তখন শিশুটি কাঁদে। আবার যখন নতুন পরিষ্কার জামা পরান তখনও সে কাঁদে। কিন্তু মা তার কান্নার পরোয়া না করে তার ভালর জন্যই জামা বদলে দেন। সেই রকম মাতা-রূপ ভগবানও তাঁর প্রিয় শিশুরূপ জীবের ভালর জন্য তার কান্নার কোনো রকম পরোয়া না করে তার দেহকে পালটে দেন। এই দৃষ্টান্ত খুবই যুক্তিপূর্ণ।

শঙ্কা—ভগবান এখানে শরীরের সঙ্গে **'জীর্ণানি'** পদটি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এমনতো কোনো নিয়ম নেই যে মানুষ বৃদ্ধ হলেই বা তার শরীর পুরাতন হলেই তার মৃত্যু হবে। আমরা তো যুবকের এবং শিশুরও মৃত্যু হতে দেখি। সুতরাং ঐ উদাহরণ যথার্থ নয়।

সমাধান—এখানে **'জীর্ণানি'** পদটির দ্বারা আশি বা একশ বছরের আয়ু বোঝান হয়নি। ভাগ্যবশত যুবা বা শিশু যে কোনো অবস্থাতেই প্রাণীর মৃত্যু হয়। তখন সেইটিকেই তার আয়ু মনে করে নিতে হবে। আর আয়ুর সমাপ্তি কালই হলো জীর্ণাবস্থা। বস্ত্রের দৃষ্টান্ত থেকে এটি ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। কোনো বস্ত্র নতুন না পুরাতন তা আমরা দূর থেকে দেখে বুঝতে পারি না। ধোবার বাড়ি থেকে কেচে আসা কাপড়ও দেখতে নতুন মনে হয়। কিন্তু তা বেশি দিন টেঁকে না। এইভাবে যে মানুষটির আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে তার শরীরকে দেখতে শিশু বা যুবক মনে হলেও বাস্তবে তা জীর্ণ। কেননা তাকে দেখতে নবীন মনে হলেও আয়ুর দৃষ্টিতে সে বেশি দিন টিকবে না। রণাঙ্গণে উপস্থিত প্রায় সকল যোদ্ধার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভগবান বলেছেন—

'ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে।

(গীতা ১১/৩২)

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।

(গীতা ১১/৩৩)

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ।

(গীতা ১১/৩৪)

তারা তো মারা যেতই, তাই যুবকও জীর্ণ। এই কথাটি ভগবান জানতেন, আর কেউ জানত না। অতএব এই উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত।

শঙ্কা—এখানে **'বাসাংসি'** এবং **'শরীরাণি'** দুটি শব্দই বহুবচনান্ত। বস্ত্র পরিবর্তনকারী তো এক সঙ্গে তিন-চারটি পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র

ধারণ করতে পারেন। কিন্তু দেহধারী অর্থাৎ জীবাত্মা তো একটি মাত্র পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করে নতুন আর একটি শরীরই ধারণ করতে পারে। এক সঙ্গে অনেকগুলি শরীর ত্যাগ অথবা গ্রহণ যুক্তি সিদ্ধ নয়। অতএব এখানে শরীরের জন্য বহু বচন প্রয়োগ অনুচিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সমাধান—(ক) এখানে ভগবানের কথার তাৎপর্য হলো এই যে মানুষ যেমন তার জীবনে অনেক বার অনেক পুরাতন কাপড় ছেড়ে নতুন নতুন কাপড় পরে এসেছে তেমনই জীবাত্মাও এখন পর্যন্ত না জানি কতবার শরীর ত্যাগ করেছে এবং নতুন শরীর ধারণ করেছে। আর ভবিষ্যতেও যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে ততক্ষণ অসংখ্য বার পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে থাকবে। এইজন্যই বহু বচনের প্রয়োগ করা হয়েছে।

(খ) স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণভেদে শরীর হলে তিনটি। যখন জীবাত্মা এই শরীরকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় শরীরে যায় তখন এই তিন শরীরই বদলে যায়। মানুষ যেমন কর্ম করে সেই অনুসারেই তার স্বভাব (প্রকৃতি) তৈরি হয়। কারণ-শরীরে স্বভাবই মুখ্য। প্রায়ই স্বভাব অনুসারেই অন্তিম সময়ে তার প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ সঙ্কল্প সৃষ্টি হয় এবং সঙ্কল্প অনুসারে তার ১৭টি তত্ত্ববিশিষ্ট* সূক্ষ্ম-শরীর সৃষ্টি হয়ে যায়। কারণ-শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের সহযোগেই এই জীবাত্মা এই শরীর থেকে বহির্গত হয়ে অন্তিম সময়ে সঙ্কল্প অনুসারেই স্থূল শরীর প্রাপ্ত করে।

কর্মানুসারে কারণ-শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর তো আগেই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আর স্থূল শরীরও যথাযোগ্য জাতি, দেশ, কালে পরিণত হবে। এইজন্য স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ভেদে তিন শরীরেই পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় ভগবান বহুবচনের প্রয়োগ করেছেন।

শঙ্কা—আত্মা তো অচল, তার যাতায়াত হয় না। তাহলে দেহধারীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা ওঠে কি করে?

সমাধান—বাস্তবে আত্মা অচল এবং অক্রিয় হওয়ার কারণে তার কোনো অবস্থাতেই গমনাগমন হয় না। কিন্তু একটি ঘটকে একটি বাড়ি থেকে অন্য

---

*মন, বুদ্ধি, দশটি ইন্দ্রিয় (শ্রোত্র, চক্ষু, জিহ্বা, চর্ম, নাসিকা, বাক, হস্ত, পদ, লিঙ্গ এবং গুহ্য) তথা পঞ্চ তন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ) এই হলো সতেরটি তত্ত্ব। অহঙ্কার বুদ্ধির অন্তর্গত এবং প্রকৃতি সর্বত্র ব্যাপক। পঞ্চ প্রাণ সূক্ষ্ম বায়ুর অন্তর্গত হওয়ায় সেগুলিকে তন্মাত্রার অন্তর্গতই বুঝতে হবে। কেউ কেউ এই পঞ্চ তন্মাত্রাগুলিকে না নিয়ে তার বদলে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান—এই পাঁচটি প্রাণকে নিয়ে থাকেন।

বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় যেমন তার ভিতরের আকাশ অর্থাৎ ঘটাকাশও ঘটের সঙ্গে যাতায়াত করছে বলে মনে হয়, তেমনই সূক্ষ্ম-শরীরের গমনাগমন হলে তার সঙ্গে আত্মারও গমনাগমন হচ্ছে বলে মনে হয়। অতএব লোকেদের বোঝাবার জন্য আত্মার গমনাগমনের ব্যবহারিক কল্পনা করা যায়। এখানে 'শরীরধারী' শব্দটি দেহভিমানী চেতনার বাচক। অতএব দেহের সম্বন্ধে তার গমনাগমন হচ্ছে বলে মনে হয়। এজন্য শরীরীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। শরীরী অর্থাৎ দেহাভিমানী যেমন জীবিতকালে স্থূল শরীরের গমনাগমনকে 'আমি যাই', 'আমি আসি' এইভাবে নিজের কথা বলে মনে করে সেই রকম স্থূল-শরীরের বিচ্ছেদের সময় এবং দেহান্তর প্রাপ্তির সময়, প্রথম এই দেহকে ত্যাগ করে অন্য স্থূল দেহের সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের যাওয়া-আসাকে শরীরধারী অর্থাৎ জীবাত্মা অজ্ঞতাবশত নিজের গমনাগমন বলে অনুভব করে। এইজন্য বোঝাবার উদ্দেশ্যে শরীরধারীর এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়া-আসার কথা বলা হয়েছে।

শঙ্কা—এতে ক্রিয়ার প্রয়োগও ঠিক হয়নি। বস্ত্রের জন্য **'গৃণ্হাতি'** এবং শরীরের জন্য **'সংযাতি'** বলেছেন। একটি ক্রিয়াতেই কাজ হয়ে যেত, কেননা দুটিই সমঅর্থবাচক। আর এমন করলে ছন্দোভঙ্গেরও কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাহলে দু রকমের প্রয়োগ কেন করা হলো?

সমাধান—যদিও দুটি ক্রিয়ার ফলে কোনো প্রভেদ নেই তবু 'গৃণ্হাতি' ক্রিয়ার প্রধান অর্থ হলো গ্রহণ করা আর 'গৃণ্হাতি'-র প্রধান অর্থ হলো গমন করা। বস্ত্র গ্রহণ করা হয়, তাই এখানে **'গৃণ্হাতি'** ক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। আর একটি শরীরকে ত্যাগ করে অন্যটিতে যাওয়া প্রতীত হয়, তাই নতুন শরীরে যাওয়াকে **'সংযাতি'** ক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অতএব ক্রিয়াপদে পার্থক্য হলেও ফলে অভেদ থাকায় এমন করা সম্পূর্ণরূপ যুক্তিসঙ্গত।

প্রঃ — **'নরঃ'** এবং **'দেহী'** এই দুটি শব্দ প্রয়োগ করা হলো কেন, একটির প্রয়োগই যথেষ্ট ছিল।

উঃ — **'নরঃ'** এবং **'দেহী'** দুটিই সার্থক। কেননা বস্ত্র গ্রহণ এবং বর্জন 'নর'-ই করে থাকে, অন্য জীব করে না। কিন্তু একটি শরীর থেকে অন্য শরীরে গমনাগমন সকল জীবেরই হয়ে থাকে। তাই বস্ত্রের সঙ্গে **'নরঃ'**-এর এবং শরীরের সঙ্গে **'দেহী'** শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

এইভাবে চিন্তা করে দেখলে এই কথাই বলতে হবে যে পৃথিবীতে গীতার মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই। গীতাতে প্রত্যেকটি বস্তুর ভাব এবং ক্রিয়ার তিনটি করে বিভাগ দেখান হয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। যে বস্তু, ভাব এবং ক্রিয়ার প্রকৃত জ্ঞানে নিষ্কাম ভাব থাকে এবং যা পরিণামে হিতকারী হয় তাকে সাত্ত্বিক মনে করতে হবে। যে বস্তুর, ভাবের এবং ক্রিয়ার শুরুতে সুখ বলে মনে হয়, যাতে সকাম ভাব থাকে এবং যা পরিণামে দুঃখদায়ী হয় তাকে রাজসিক মনে করতে হবে। যে বস্তু, ভাব এবং ক্রিয়াতে হিংসা, অজ্ঞানতা, শাস্ত্রবিরুদ্ধতা থাকে এবং যা দুঃখ ও মোহ সৃষ্টিকারী তাকে তামসিক মনে করা উচিত। এইভাবে তত্ত্ব বুঝে নিলে গীতার অনেক মুখ্য বিষয় জানা যায়।

গীতায় যত সদ্ভাব অর্থাৎ উত্তম গুণ জানান হয়েছে সেগুলির মধ্যে এমন একটি গুণ আছে যা থেকেই মহাপুরুষদের চেনা যায়। সেই গুণটির নাম 'সমতা'।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।

(গীতা ১৪/২৪-২৫)

'যে সদাসর্বদা আত্মভাবে স্থিত, দুঃখসুখকে সমান জ্ঞান করে, মাটি, পাথর এবং সোনার প্রতি সমমনোভাবাপন্ন, জ্ঞানী, প্রিয় তথা অপ্রিয়কে একই বলে মনে করে এবং নিজের নিন্দা-স্তুতিতে একই ভাব রক্ষা করে আর যে মান-অপমানে অচঞ্চল থাকে, শত্রু-মিত্রে সমান থাকে, সকল কাজে কর্তৃত্বাভিমান থেকে মুক্ত—সেই মানুষকেই গুণাতীত বলা হয়।'

এখানে সুখ-দুঃখের সমতা হলো ভাববিষয়ক সমতা, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমানের সমতা হলো অপরের ক্রিয়াসম্বন্ধিয় ক্রিয়াবিষয়ক সমতা এবং প্রিয়-অপ্রিয় ও সোনা-মাটি প্রভৃতিতে সমান দৃষ্টি রাখা হলো পদার্থ বিষয়ক সমতা। সমতাই হলো জ্ঞানীর প্রধান গুণ।* গীতাতে যেখানেই যোগস্থ পুরুষ, ভক্ত

*কেননা সমতা হলো সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ। এজন্য যার স্থিতি সমতায় তার ব্রহ্মেতেই স্থিতি বলা হয়েছে। (গীতা ৫/১৯)।

এবং জ্ঞানীর লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে কোথাও না কোথাও সমতার উল্লেখ অবশ্যই করা হয়েছে। এজন্য সমতাই হলো মহাত্মাদের সর্বোত্তম গুণ।

পৃথিবীতে গীতার মতন কোনো গ্রন্থ নেই। সমস্ত মত এর উৎকর্ষতা স্বীকার করে। অতএব গীতার অনুশীলন আমাদের এমনভাবে করতে হবে যাতে আমাদের আত্মা গীতাময় হয়ে যায়। গীতাকে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করা উচিত। গীতা গঙ্গার চেয়েও বড়। কেননা গঙ্গা ভগবানের চরণ থেকে নির্গত হয়েছে। আর গীতা ভগবানের মুখকমল নিঃসৃত। গঙ্গা তো তাতে অবগাহন করলেই পবিত্র করে কিন্তু গীতা ধারণ করলেই গৃহাভ্যন্তরের মানুষকেও পবিত্র করে দেয়। গঙ্গায় যে স্নান করে সে স্বয়ং মুক্ত হয়ে যেতে পারে; কিন্তু গীতায় যে অবগাহন করে সে অপরকেও মুক্ত করে দিতে পারে।

অতএব এটি প্রমাণিত হলো যে গীতা গঙ্গার চেয়েও বড়। গীতাকে যে কেবল পাঠ করে তার চেয়ে বড় হলো যে গীতার অর্থ এবং ভাবকে বোঝে। আর যে গীতানুসারে আচরণ করে সে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

এই জন্য সকলের উচিত অর্থ এবং ভাব সহ গীতাকে অনুধাবন করে তার শিক্ষানুসারে নিজেদের জীবন তৈরী করা।

(১২) গীতার সর্বজনপ্রিয়তা

কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি গীতার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। তাঁদের যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা সকলের উপযোগী হবে বলে এখানে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন—গীতার উপর অনেক আচার্যের অনেক টীকা আছে। সেগুলির মধ্যে আপনি কোন্‌টিকে উত্তম এবং যথার্থ বলে মনে করেন?

উত্তর—যাঁরা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ সেইসব আচার্যের টীকাগুলিকে আমি উত্তম এবং যথার্থ মনে করি।

প্রশ্ন—আচার্য তো অনেক হয়েছেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনকি তাঁদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করেছেন। রামানুচার্য করেছেন বিশিষ্টাদ্বৈত। তেমনই অন্যান্য আচার্যরাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রতিপাদন করে টীকা লিখেছেন। তাহলে সব টীকাই কি করে যথার্থ হতে পারে? সত্য তো একটিই হয়।

উত্তর—তর্কের দৃষ্টিতে আপনি যা বলছেন তা ঠিক। ধরে নেওয়া গেল যে গীতার একশ টীকা আছে এবং সেগুলির প্রত্যেকটি পরস্পরের ভিন্ন। তাহলে প্রত্যেকটি টীকাই বাকি ৯৯টি টীকার বিরোধী। এই দৃষ্টিতে তো একটি টীকাও সঠিক নয়। কিন্তু যে কোনো আচার্যের টীকা অনুসারে যদি ভালভাবে অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে তার দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে। এই যুক্তিতে সব টীকাই ঠিক।

প্রশ্ন—আপনি কোন্ টীকাকে সকলের উপরে মনে করেন এবং আপনি কোন্‌টির অনুগামী?

উত্তর—আমি তো সব কটিকেই উত্তম মনে করি এবং আমি কোনো একটির অনুগামী নই, আমি সবগুলিরই অনুগামী। কেননা আমি প্রায় সবগুলিরই ভাল কথা গ্রহণ করেছি এবং আমি অনেকগুলি টীকা থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং নিচ্ছি। সকলেই আমার পূজনীয়। তাই আমি সকলকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি এবং যে কোনো আচার্যের কৃত টীকা অনুসরণ করলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় বলে মনে করি। তবে আমি টীকাগুলি অপেক্ষা মূলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ

মনে করি। কেননা কোনো আচার্যই মূলের বিরোধিতা করেননি। বরং ভগবৎ বাক্য হওয়ায় সকলেই মূলকে সম্মান করেন এবং তার প্রশংসা করেন। তাঁরা মূলকে আশ্রয় মেনে নিয়েই কাজ করেন এবং তাকে আশ্রয় করেই সকলকে চালিত করতে চান। এইজন্য আচার্যদের টীকাগুলি অপেক্ষা মূলই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন—শঙ্করাচার্য গীতার অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন এবং ভক্তিমার্গের লোকেরা দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন আর কর্মমার্গের লোকেরা কর্মযোগবাদী অথবা কর্মযোগের ব্যাখ্যা করেন। তাহলে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্‌টি— জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, না কর্মযোগ? এবং তাঁরা কি তাঁদের কথা টেনেটুনে প্রতিপাদন করেন। নাকি তাঁরা এমনটিই বিশ্বাস করেন।

উত্তর—তাঁদের টানাটানির কথা বলা তো তাঁদের মানসিকতাকে দোষ দেওয়া। তাই এসব কথা বলা উচিত নয়। গীতার যেমন অর্থ তাঁদের কাছে প্রতীত হয়েছে তাঁরা সেই রকমই লিখেছেন। গীতার পক্ষে এটি এক গৌরব। কেননা সকল মতের লোকেরাই গীতাকে আত্মস্থ করেন। গীতা এই রকমই এক রহস্যময় গ্রন্থ যাতে সকলেই তাঁদের মত ওতোপ্রোত সন্নিবিষ্ট রয়েছে দেখতে পান। কেননা বাস্তবে গীতাতে জ্ঞানযোগ (অদ্বৈতবাদ), ভক্তিযোগ (দ্বৈতবাদ) এবং কর্মযোগ (নিষ্কাম কর্ম)—সবকিছুই যথাযথভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্ত মানুষদের প্রাপ্তব্য বস্তু তো এক। গীতা গ্রন্থটি এবং গীতার বক্তাও এক। তবুও গীতার অর্থ আচার্যদের কাছে বিভিন্ন হয় কেন?

উত্তর—সকলের প্রাপ্য বস্তু এক হলেও সকলের পূর্ব সংস্কার, সঙ্গ, সাধন, স্বভাব এবং বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাঁদের কথা বলার, বোঝাবার শৈলী এবং পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া ভগবানের যে সময় যে মানুষের দ্বারা যে ভাব প্রচার করাতে হয় সেই ভাবই সেই আচার্যের কাছে সেই সময় প্রকট হয়ে যায় আর গীতার অর্থ এবং ভাব তখন সেই রকমই প্রতীত হতে থাকে।

প্রশ্ন—যখন সকলের কথা ভিন্ন ভিন্ন হয় তখন সকলের কথাই যথার্থ কি করে হতে পারে?

উত্তর—এক দৃষ্টিতে সকলের কথাই যথার্থ আবার অন্য দৃষ্টিতে কারও কথাই যথার্থ নয়। ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরিণাম সকলের এক হলেও সকলের কথাও আলাদা আলাদা হতে পারে। যেমন, দ্বিতীয়ার চাঁদকে দেখাবার জন্য কেউ বলতে পারে যে চাঁদ হলো ঐ গাছটার চূড়া থেকে এক বিঘত ওপরে।

আর একজন বলতে পারে যে চাঁদ অমুক বাড়িটার কোণ ঘেঁষে রয়েছে। আর তৃতীয় লোকটি মাটিতে খড়ি দিয়ে এঁকে বলতে পারে চাঁদের আকৃতি এই রকম এবং ঐ উড়ন্ত পাখির দুটি ডানার মাঝখানে তাকে দেখা যাচ্ছে। আবার চতুর্থ লোকটি নলখাগড়ার আকারের কথা জানিয়ে ইঙ্গিত করতে পারে যে চাঁদ আমার ঠিক আঙ্গুলের সামনে দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত লোকের যেমন লক্ষ্য হলো চাঁদকে দেখান এবং তারা শুভ উদ্দেশ্যেই নিজেদের প্রক্রিয়া জানান এবং তাদের কথায় পরস্পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে তেমনই সব আচার্যেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই সাধকদের ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় প্রচুর ভিন্নতা থাকে। অন্তিম পরিণাম এক হওয়ায় সকলের কথাই ঠিক। অর্থাৎ যে কোনো আচার্যের কথানুসারে চললে প্রকৃত ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যায়। এই যুক্তিতে সকলের কথাই যথার্থ। কিন্তু যদি শব্দার্থ নিয়ে তর্ক করেন তাহলে কারও কথাই ঠিক মনে হয় না। কারণ বাস্তবে চাঁদ গাছের এক বিঘত উপরে নেই, বাড়ির কোণ ঘেঁষা নয়, পাখির ডানার মাঝখানে নেই এবং আঙ্গুলের ঠিক সামনেই তার অবস্থান নয়। আর চাঁদের আকৃতিও তাদের কথার মতো নয়। শব্দ নিয়ে তর্ক করলে কোনো কথাই খাটে না।

প্রশ্ন—ভগবৎ বাক্যস্বরূপ গীতার মূল কথায় শ্রদ্ধাবান মানুষেরা গীতার যথার্থ অর্থ জানতে চায়। কিন্তু গীতার অনেক টীকা পড়ে তারা সংশয় ভ্রমে পড়ে যায়। সুতরাং তারা যাতে গীতার যথার্থ জ্ঞান লাভ করে তার জন্য তাদের কী করা উচিত?

উত্তর—যাঁরা ভগবৎ বাক্যকে অমোঘ মনে করে সেই অনুসারে নিজেদের জীবন যাপন করার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করেন এবং নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে বিশুদ্ধ মনোভাব নিয়ে মূল শব্দগুলির অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে নিমগ্ন হন ও তার স্বাধ্যায় ও অনুশীলন করতে থাকেন তাঁদের ভগবৎ কৃপায় সংশয় ভ্রম সবই দুর হয়ে যায়। গীতার অমোঘ এবং যথার্থ জ্ঞান তাঁদের তখন স্বতঃই হয়ে যায়।

প্রশ্ন—যাঁরা ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয় এমন অনেক মানুষও গীতার নানা রকম টীকা করেন। সেইসব টীকা অনুশীলন করেও কি ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে?

উত্তর—যারা গীতাকে ইষ্ট মনে করে ভগবৎ বাক্যকে যথার্থ বলে জানে এবং নিজেদের জীবনকে গীতাময় করবার জন্য গীতার উপর নির্ভরশীল হয়ে

শ্রদ্ধা ও ভালবাসাসহ মূল গীতাকে অথবা কেবল টীকাগুলিকেই অনুশীলন করতে থাকে তাদের গীতা স্বয়ং টীকার ফলে উৎপন্ন ভুল ধারণাকে দূর করে তাদের মধ্যে যথার্থ বোধ সঞ্চার করে দেয়।

প্রশ্ন—কোনো টীকা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কৃত, নাকি কোনো সাধারণ মানুষের রচনা তা কি করে নির্ণয় করা যাবে?

উত্তর—যে টীকা অধ্যয়ন করলে পরমাত্মার স্মৃতি উদিত হয়, হৃদয়ে পরমাত্মার এবং গীতার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রেম বর্ধিত হয়, সৎগুণ ও সৎভাবনা জাগ্রত হয় এবং সেই টীকার প্রতি আকর্ষণ হয় সেই টীকাকেই ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কৃত টীকা বলে মনে করা উচিত।

প্রশ্ন—সকল মতাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের লোকেরা গীতাকে আত্মস্থ করে এবং তাতে নিজেদেরই ভাবনার প্রতিফলন দেখে। তাহলে ভগবান কি ভবিষ্যতে যেসব ভাবনা উত্থিত হতে পারে তার কথা মনে রেখেই গীতার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন?

উত্তর—ভগবান তো ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল বিষয়ের সমস্ত ভাবনাই জানেন। ভগবান গীতায় বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।। (৭/২৬)

'হে অর্জুন! অতীতে বিগত এবং বর্তমানে স্থিত তথা পরবর্তীকালে আগত সর্বভূতকে আমি জানি। কিন্তু আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি রহিত কোনো মানুষ জানে না।'

এজন্য ভগবান ঐ সব ভাবকে মনে রেখেই যদি গীতার কথা বলে থাকেন তবে তা অসম্ভব কিছু নয়। আর গীতার সিদ্ধান্তই এমন অলৌকিক ও যথার্থ যে সৎ মনোভাব নিয়ে ত্যাগপূর্বক যেসব আচার্য তার প্রচার করেন তাঁদের হৃদয়ে গীতার যথার্থ ভাব স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এজন্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে দেখলে তাঁরা গীতার মধ্যে নিজেদের ভাবসমূহকেই দেখতে পান।

প্রশ্ন—গীতার মধ্যে এমন কি বিশিষ্টতা আছে, যেজন্য সনাতন ধর্ম ছাড়া যাঁরা অন্য মত মানেন তাঁরাও গীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান?

উত্তর—গীতায় কোনো ব্যক্তির বা কোনো মতের নিন্দা করা হয়নি। যে কথা বলা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত। ভাব এবং আচরণের নিরিখেই

ভাল-মন্দ মানুষের নির্ণয় করা হয়েছে, কোনো জাতি বা বাহ্যিক বিশেষ চিহ্নের দ্বারা তা করা হয়নি। সকল মানুষের আত্ম-কল্যাণের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সর্বপ্রিয় সমতাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হয়েছে এবং সমতাকেই সাধক ও সিদ্ধির কষ্টিপাথর বলে গণ্য করা হয়েছে। গীতাকে কেবল শুনলে ও বুঝলেই শান্তি লাভ হতে পারে, তাহলে সেই অনুসারে যারা চলবে তাদের সম্পর্কে আর কী বলার আছে! গীতার ভাষা, ভাব, অর্থ, জ্ঞান, তার পদ্য রচনা এবং তার গীত খুবই সুমধুর, সুন্দর, সুগম এবং রুচিকর। এজন্য সকল শ্রেণীর লোক তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান।

প্রশ্ন—গীতা পাঠ করা, অথবা তাকে গাওয়া বা তার অর্থ বোঝা, নাকি তার ভাব অনুধাবন করা কোন্‌টি উত্তম?

উত্তর—পাঠ করা অপেক্ষা প্রেমপূর্বক মধুর স্বরে গান করা উত্তম। গান করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আরও উত্তম। গীতার ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করা তার চেয়েও বেশি উত্তম আর সেই ভাব অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন করা সর্বোত্তম।

প্রশ্ন—গীতাতে প্রথমে কর্ম, পরে উপাসনা এবং তদনন্তর জ্ঞানের সাধনায় মুক্তি—এই রকম সাধন-প্রণালী আছে অথবা কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ—এই তিনটি স্বতন্ত্ররূপে মুক্তিদায়ক?

উত্তর—প্রথমে কর্ম, পরে উপাসনা এবং তারপরে জ্ঞানের সাধনায় মুক্তি হয়—এই পর্যায়ের কথাও আছে আবার এগুলির অতিরিক্ত পরস্পর স্বতন্ত্র কেবল কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের দ্বারাও মুক্তি হয় এমন কথাও আছে। যেমন—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।

(গীতা ১৩/২৪)

'কত মানুষই তো সেই পরমাত্মাকে পরিশুদ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা ধ্যান করতঃ হৃদয়ে দেখতে পান। অন্য অনেকে জ্ঞানযোগের দ্বারা আবার কেউ কেউ কর্মযোগের দ্বারা তাঁকে দেখেন অর্থাৎ তাঁকে লাভ করেন।'

যদি বলেন যে জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না—(**ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ**) তো ঠিক আছে, কিন্তু নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে সাধকের নিজে থেকেই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।
(গীতা ৪/৩৮)

'এই জগতে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। কিছু কাল ধরে কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণ লব্ধ মানুষ সেই জ্ঞানকে নিজেদের আত্মায় পেয়ে যান।'

এইভাবে ভেদের উপাসনার ফলেও ভগবৎ কৃপার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।
(গীতা ১০/৯-১১)

'যাঁরা নিরন্তর আমাতে মন নিমগ্ন করেছেন এবং আমাতেই প্রাণকে অর্পণ করেছেন সেই ভক্তেরা পরস্পরের সঙ্গে আমার প্রতি ভক্তিকে আলোচনা করে গুণ ও প্রভাবসহ আমার চর্চা করে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করেন। যাঁরা সতত আমাতে চিত্তার্পণ করে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি। তার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করে থাকেন। তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করবার জন্য আমি তাঁদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হয়ে স্বয়ং উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে দিই।"

এই রকম জ্ঞানযোগের সাধনার দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়। এবং জ্ঞান হয়ে গেলে মুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

প্রশ্ন—কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের সঙ্গে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এক সঙ্গে থাকতে পারে, না পারে না?

উত্তর—কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগ এবং পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান থাকতে পারে। কিন্তু অভেদোপাসনারূপ জ্ঞানযোগ তার সঙ্গে একই কালে

থাকতে পারে না। কেননা কর্মযোগে ভেদবুদ্ধি ও সংসারের সত্তা থাকে আর জ্ঞানযোগে-এর বিপরীত অভেদবুদ্ধি এবং সংসারের অনস্তিত্ব থাকে। এজন্য কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ পরস্পর বিরোধী ভাবনার সাধনা হওয়ায় তারা একই কালে এক সঙ্গে থাকতে পারে না।

ভক্তিযোগের (ভেদোপাসনা) সঙ্গে কর্মযোগ এবং পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান থাকতে পারে; কিন্তু অভেদোপাসনারূপ জ্ঞানযোগ থাকতে পারে না। কেননা একই পুরুষের দ্বারা একই কালে পরস্পর বিরোধী ভাব হওয়ায় ভেদোপাসনা ও অভেদোপাসনা এক সঙ্গে থাকতে পারে না।

জ্ঞানযোগের সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত কর্ম থাকতে পারে; কিন্তু কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ থাকতে পারে না। কেননা জ্ঞানযোগে অদ্বৈতবাদ আর কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগে দ্বৈতভাব থাকে। অতএব একই পুরুষে একই কালে দু রকমের ভাবের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ একই সঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ দুটিতেই দ্বৈতভাব এবং সংসারের সত্তা সমান থাকার কারণে ঐ দুটি একসঙ্গে থাকতে পারে।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যদের মধ্যে কোন্ কোন্ আচার্যের সিদ্ধান্ত নির্দোষ?

উত্তর—ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যেরা যা মান্য করে থাকেন তাকেই তাঁদের মতানুসারীগণ সিদ্ধান্ত বলেন। কিন্তু যা অন্তিমে প্রাপ্ত বস্তু বাস্তবে সেইটিই হলো সিদ্ধান্ত। সকলের ক্ষেত্রে সেটি এক। তাঁদের মতকে যে সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হয় তার কারণ হলো এই যে তাকে সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিলে সাধনায় তৎপরতা আসে। এইজন্য তাঁদের মতকে সিদ্ধান্তের রূপ দেওয়া উচিতই হয়েছে। আর ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যদের প্রদর্শিত পথ শ্রদ্ধাবানদের কাছে মুক্তিদায়ক হওয়ায় তা নির্দোষ। কিন্তু তর্কের দৃষ্টিতে বিচার করলে কোনো কিছুই নির্দোষ বলে প্রমাণিত হতে পারে না।

প্রশ্ন—আপনি দ্বৈত (ভেদোপাসনা) এবং অদ্বৈত (অভোদোপাসনা)—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টিকে উত্তম মনে করেন এবং সাধকদের জন্য কোন্‌টিকে শ্রেষ্ঠ বলেন?

উত্তর—দুটিকেই উত্তম মনে করি এবং যিনি যেটির অধিকারী তাঁর কাছে সেটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকি।

প্রশ্ন—কে কোন্‌টির অধিকারী এটি আপনি কি করে ঠিক করেন?

উত্তর—ভেদোপাসনাতে যাঁর শ্রদ্ধা এবং রুচি তিনি ভেদোপাসনার এবং অভেদোপাসনাতে যাঁর শ্রদ্ধা ও রুচি তিনি অভেদোপাসনার অধিকারী। কিন্তু যতক্ষণ না শ্রদ্ধা ও রুচিকে নির্ণয় করা যাচ্ছে ততক্ষণ পরমাত্মার নামজপ, তাঁর স্বরূপের ধ্যান, সৎপুরুষদের সঙ্গ, সৎ শাস্ত্রের অধ্যয়ন—এইগুলিকে আমি সাধকদের জন্য উত্তম বলে মনে করি।

প্রশ্ন—আপনি সাধকদের কোন্ নাম জপ এবং কোন্ স্বরূপ ধ্যান করতে বলেন?

উত্তর—সাধকেরা এযাবৎ ওঁ, শিব, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, হরি প্রভৃতির মধ্যে যে নামটি জপ করে এসেছেন এবং যে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ রূপের ধ্যান করে এসেছেন অথবা যে নাম ও যে রূপের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-রুচি আছে সেইটিকেই করবার কথা বলা হয়ে থাকে। কিংবা প্রশ্ন করবার সময় তাঁর ভাবানুসারে আমার হৃদয়ে যেরকম ভাব উৎপন্ন হয় সেই অনুসারে বলা হয়ে থাকে।

(১৩) সন্ত-মহিমা

ভগবৎ কৃপাতেই সন্ত-ভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে

পৃথিবীতে সাধু-সন্তদের স্থান সকলের উপরে। দেবতা এবং মানুষ, রাজা এবং প্রজা সকলেই প্রকৃত সন্তদের নিজেদের থেকে বড় বলে মানেন। সাধুদের জীবনই সার্থক জীবন। অতএব সন্ত-ভাব প্রাপ্তির জন্য সমস্ত লোকের ভগবানের শরণ নেওয়া উচিত। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়—'সন্ত-ভাব কি চেষ্টা করলে পাওয়া যায়, নাকি ভগবৎ কৃপায় পাওয়া যায়, কিংবা তার জন্য দুটিই প্রয়োজন?' যদি বলা হয় যে, কেবল চেষ্টার দ্বারা তা পাওয়া সম্ভব তাহলে সকলে চেষ্টা করে কেন সাধু হয়ে যান না? যদি বলেন যে ভগবৎ কৃপায় তা হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় যে ভগবৎ কৃপা তো সর্বদা সকলের উপরে সমানভাবে বর্ষিত হয় তাহলে সকলেরই সন্তভাবের প্রাপ্তি ঘটে না কেন? যদি বলা হয় যে দুটি হলে পাওয়া যায় তাহলে আর ভগবৎ কৃপার কি গুরুত্ব থাকল, কেননা কেবল ভগবৎ কৃপায় তা না হয়ে তার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছে। এর উত্তর হলো এই যে, ভগবৎপ্রাপ্তি অর্থাৎ সন্তভাবের প্রাপ্তি কেবল ভগবৎ কৃপাতেই হয়ে থাকে। বস্তুত ভগবৎপ্রাপ্ত মানুষকেই সন্ত বলা হয়। সৎ বস্তু কেবল পরমাত্মাই আর পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব যাঁরা জানেন এবং তাঁকে উপলব্ধ করেছেন তাঁরাই হলেন সন্ত। হ্যাঁ, যাঁরা ভগবৎপ্রাপ্তির পাত্র তাঁদেরও গৌণভাবে সন্ত বলা যায়। কেননা তাঁরা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁদের শীঘ্রই ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

এখানে সংশয় জাগে যে যখন পরমাত্মার কৃপা সকলের উপরেই রয়েছে তখন তো সকলেরই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেন তা হয় না? তার উত্তর হলো এই যে পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য যদি তীব্র কামনা হয় এবং ভগবৎ কৃপার প্রতি বিশ্বাস থাকে তাহলে তা সকলেই পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরমাত্মাকে কতজন লোক চায়? আর পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাসই বা কজনের আছে? যারা চায় এবং যাদের বিশ্বাস আছে তারাই তা প্রাপ্ত করে। যদি বলা হয় যে সকলেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চায় তাহলে তা ঠিক বলা হয় না।

এই রকম বাসনা প্রকৃত বাসনাই নয়। আমরা দেখি যে যাদের অর্থ লাভের বাসনা থাকে তারা অর্থের জন্য সব কিছু করতে এবং ছোট-বড় সব কিছু ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য এই রকম বাসনা কতজনের আছে? ধনসম্পদের কামনা থাকলেও ভাগ্যে থাকলে তবেই তা পাওয়া যায়। ভাগ্যে না থাকলে তা পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানকে তো চাইলে পাওয়া যায়, কেননা ভগবান তো ধনসম্পদের মতো জড় নন। জড় ধন সম্পদ আমাদের বাসনার মতো বাসনা করতে পারে না। কিন্তু ভগবানকে যে চায় তিনিও তাকে চান। এবং এটি নিশ্চিত যে ভগবানের বাসনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এ অমোঘ। অতএব ভগবান চাইলে বিনা প্রযত্নে ভক্তের বাসনা নিজে থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে যে ভক্ত চাইলে তবেই ভগবান তাকে চেয়ে থাকেন। যদি বলেন যে ভক্ত না চাইলে ভগবান কেন তাকে চাইবে না? তাহলে তার উত্তর হলো এই যে ভগবানের মধ্যে বাস্তবে কোনো 'বাসনা'-ই নেই। ভক্তের বাসনা থাকলে তবেই তাঁর মধ্যে বাসনার উদ্রেক হয়। একথায় এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভক্তের বাসনা থেকে যখন ভগবানের বাসনা জাগ্রত হয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় তখন ভগবৎ কৃপার প্রাধান্য কোথায় রইল? ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাও তো একপ্রকারের প্রযত্ন। এর উত্তর হলো ভগবৎ লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কেবল ইচ্ছাকেই প্রযত্ন বলা যেতে পারে না। আর একে যদি প্রযত্ন বলে মানা হয় তাহলে এইটুকু তো করতেই হবে। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে যে একমাত্র ভগবানকেই ইচ্ছার দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়। পৃথিবীতে মানুষ নানা রকম জিনিসের জন্য ইচ্ছা করে থাকে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই সেগুলিকে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা থাকবে, ভাগ্যে থাকবে এবং প্রযত্ন করা হবে তবেই ভৌতিক বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে কেবল ইচ্ছা করলেই কাজ হাসিল হয়ে যায়। ইচ্ছা জাগলে যে প্রযত্ন হয় সেই প্রযত্ন তো ভগবান স্বয়ং করিয়ে নেন। সাধক তো কেবল নিমিত্ত মাত্রই হয়ে থাকেন। অর্জুনকে ভগবান বলেছিলেন "এরা সকলে আমার দ্বারা নিহত হয়ে আছে, তুমি কেবল নিমিত্ত হয়ে যাও।" (গীতা ১১/৩৩)। এইভাবে নিজের প্রাপ্তিরূপ কার্যের সিদ্ধিতেও ভগবান সব কিছু নিজে করে নেন। কামনাকারী ভক্তকে কেবল নিমিত্ত হয়ে যেতে হবে। যেসব লোক মনে করে যে কেবল নিজেদের পুরুষার্থের ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে থাকে তাদের

ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দেন না। হ্যাঁ, খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁরা জ্ঞান লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাতেও গুরুর শরণ তো নিতেই হয়। ভগবান নিজেই বলেছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

(গীতা ৪/৩৪)

"সেই জ্ঞানকে তুমি বোঝ, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যের কাছে গিয়ে ভালভাবে দণ্ডবৎ প্রমাণ করে, তাঁর সেবা করে এবং কপটতা ত্যাগ করে সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে, পরমাত্মতত্ত্বকে ভালভাবে জানেন যে জ্ঞানী মহাত্মা; তিনি তোমাকে সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।"

শ্রুতি বলে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি।।

(কঠ. ১/৩/১৪)

'ওঠো, জাগো এবং মহান পুরুষদের সমীপবর্তী হয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত কর। ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ্ণ ও দুস্তর হয় তত্ত্বজ্ঞানীরা সেই পথকে তেমনই দুর্গম বলে থাকেন।'

ঈশ্বরলাভ করাকে কেবল নিজের পুরুষার্থ মনে করার কারণ হলো নিজের অহঙ্কার। ভক্তের এই অহঙ্কার দোষকে দূর করবার জন্য ভগবান তাকে ভীষণ সঙ্কটে ফেলে এইটিই প্রত্যক্ষ করান যে কার্যসিদ্ধিতে নিজের সামর্থ্যকে বড় করে দেখা মানুষের একটি বড় ভুল। তাই এইভাবে বিপদের মধ্যে ফেলাও ভগবানের বিশেষ কৃপা। কেনোপনিষদে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে— ইন্দ্র, অগ্নি, পবন এবং দেবতারা বিজয় লাভের জন্য নিজেদের পুরুষার্থকে কারণ বলে মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের গর্ব হয়েছিল। তখন ভগবান তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে যক্ষ রূপে নিজের পরিচয় দেন এবং তাঁদের গর্ব নাশ করেন। যখন অগ্নি, পবন দেবতা পরাস্ত হন এবং বুঝতে পারেন যে তাঁদের মধ্যে কোনো সামর্থ্য নেই তখন ভগবান বিশেষ দয়া করে উমাকে দিয়ে ইন্দ্রের কাছে নিজের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করান। সাফল্য লাভ হলে মানুষ নিজের পুরুষার্থকে কারণ মনে করে গর্ব করে। কিন্তু অনিবার্য বিপদে যখন তারা

নিজেদের পুরুষার্থের প্রতি নিরাশ হয়ে যায় তখন নিরুপায় হয়ে ভগবানের শরণ নেয় এবং আর্তস্বরে চিৎকার করে — "হে প্রভু! এই ঘোর সঙ্কট থেকে আমাকে বাঁচান। আমি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। আমি যে নিজের শক্তিতে নিজের উদ্ধারের কথা মানতাম তা আমার প্রচণ্ড ভুল। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুগুলির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এখন আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারছি যে আপনার কৃপা ছাড়া এইগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, তা অসম্ভব।" যখন অহঙ্কারকে ত্যাগ করে এই রকম ভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষ ভগবানের শরণ নেয় তখন ভগবান তাকে গ্রহণ করেন এবং আশ্বাস দেন। কেননা ভগবানের ঘোষণা হলো—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ।।

(বাল্মীকি রামায়ণ ৬/১৮/ ৩৩)

'যে একবারও আমার শরণাগত হয়ে বলে যে 'আমি তোমার' (তুমি আমাকে আপন করে নাও) আমি তাকে সকল ভূত থেকে ভয়হীন করে দিই। এটি আমার ব্রত।' এরপরেও মানুষ তাঁর শরণাগত হয়ে নিজের কল্যাণ সাধন করে না, এটি খুবই আশ্চর্যের কথা!

দয়ার সাগর ভগবানের জীবসমূহের প্রতি এমন অপার দয়া আছে যে তার কোনো সীমা পাওয়া যায় না। বস্তুত তাঁকে দয়ার সাগর বলাও তাঁকে স্তুতির ছলে নিন্দা করা। কেননা সাগরের তো সীমা থাকে, কিন্তু ভগবানের দয়ার তো কোনো সীমা নেই। বড় বড় মানুষেরাও ভগবানের দয়ার যে কল্পনা করেছেন বাস্তবে তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি। তার কোনো কল্পনাই করা যায় না। এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যার দ্বারা ভগবানের দয়ার স্বরূপ বোঝান যেতে পারে। মায়ের উদাহরণ দিলেও তা যথেষ্ট নয়। কেননা, পৃথিবীতে অসংখ্য জীব আছে এবং তাদের সকলের উৎপত্তিই মা থেকে। সেই সব মায়েদের হৃদয়ে আপন সন্তানদের প্রতি যে দয়া বা স্নেহ থাকে সেই সবগুলি মিলিত হলেও দয়ার সাগরের দয়ার একটি বিন্দুরও সমান হয় না। এই রকম অবস্থায় আর কার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে? তবু যে মায়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তা এই জন্য যে পৃথিবীতে যত দৃষ্টান্ত আছে সেই সবের মধ্যে এইটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মা তাঁর সন্তানের জন্য যা কিছুই করেন তাঁর প্রত্যেক ক্রিয়ায় দয়া

পরিপূর্ণ থাকে। শিশুরাও এটি কিছুটা অনুভব করতে পারে। শিশু যখন দুষ্টুমী করে তখন তার দোষ শোধরাবার জন্য মা তাকে বকেন মারেন এবং তাকে একলা রেখে কিছুটা দূরে সরে যান। এমন অবস্থাতেও শিশু মায়ের কাছেই যেতে চায়। অন্যেরা তাকে জিজ্ঞাসা করে—'তোমাকে কে মেরেছে?' সে কাঁদতে কাঁদতে বলে 'মা'। তখন লোকেরা বলে 'তাহলে এখন তুমি মায়ের কাছে যেও না'। কিন্তু শিশু তাদের কথা শোনে না, কাঁদতে থাকে এবং মায়ের কাছেই যেতে চায়। তাকে ভয় দেখান হয় যে 'মা আবার মারবেন।' কিন্তু তার উপর এই কথার কোনো প্রভাব পড়ে না, সে কোনো কথা গ্রাহ্য করে না এবং সরল মনে মায়ের কাছেই যেতে চায়। কাঁদে, কিন্তু চায় মাকেই। মা যখন তাকে বুকে নিয়ে তার চোখের জল পুঁছিয়ে দেন, তাকে আশ্বস্ত করেন, তখনই সে শান্ত হয়। এই ভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল শিশুর মতো যারা ভগবানের দয়া-তত্ত্বকে জেনে নেয় এবং ভগবানের আঘাত সত্ত্বেও তাঁকেই ডাকে, তাদের ভগবান নিজের বুকে টেনে নেন। তাহলে ভগবানের কৃপাকে যারা বিশেষরূপে জেনে নেয় তাদের তো কথাই নেই।

ছেলে যখন নিচের তলা থেকে উপরের তলায় উঠতে চায় তখন মা তাকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে উপরে উঠতে উৎসাহিত করেন। বলেন, 'বাবা! ওঠো, পড়ে যাবে না, আমি পাশে আছি।' এই ভাবে সাহস এবং ভরসা দিয়ে তাকে একটা একটা করে সিঁড়িতে ওঠান এবং খেয়াল রাখেন যাতে সে পড়ে না যায়। একটু হেলে পড়লেই তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দেন এবং চড়িয়ে দেন। শিশু যখন চড়তে অসুবিধা বোধ করে তখন মায়ের দিকে তাকিয়ে যেন ইশারায় মায়ের সাহায্য চায়। মা তখনই তাকে সাহায্য করে তাকে চড়িয়ে দেন এবং আবার উৎসাহ দেন। শিশু যদি পিছলে যায় তাহলে মা তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেন, তাকে পড়ে যেতে দেন না। এইভাবে যে মানুষ শিশুর মতো ভগবানের উপর ভরসা (নির্ভর) করে ভগবান তার উন্নতি এবং রক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং করে দেন। তাকে কেবল নিমিত্ত করেন।

সংসারের মা কখনও অসাবধানতাবশত এবং সামর্থ্যের অভাবে কিংবা ভুল করে পতনোন্মুখ শিশুকে বাঁচাতে নাও পারেন, কিন্তু সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ প্রভু তো তাঁর আশ্রিতকে কখনই পড়ে যেতে দেন না। বরং উত্তরোত্তর তাকে সহায়তা প্রদান করেন, এক একটি সিঁড়ি ভেঙ্গে সব চেয়ে উঁচু তলায়, যেখানে পৌছান জীবের অন্তিম লক্ষ্য , সেইখানে পৌঁছিয়ে দেন।

এতে এইটিই প্রমাণিত হয় যে প্রযত্ন ভগবানই করেন। ভক্তকে কেবল ইচ্ছা করতে হয় আর তাতেই ভগবান তাকে নিমিত্ত করে দেন। শিশু যদি কখনও অহঙ্কার করে মনে করে যে সে তার পুরুষার্থের বলেই উপরে উঠছে, তখন মা কিছুটা দূরে সরে গিয়ে বলেন 'বেশ ওঠো।' কিন্তু সাহায্য না পাওয়ায় সে উঠতে পারে না। পড়ে যায় আর কাঁদতে থাকে। তখন মা দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। এই রকম যারা নিজেদের প্রযত্নের অহঙ্কার করে তারাও পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এইটি মনে রাখতে হবে যে ভগবানের দয়ার তাৎপর্য একেবারেই এই নয় যে মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকবে, কিছুই করবে না। এ রকম মনে করা হলো প্রভুর দয়ার অপব্যবহার করা। মা যখন শিশুকে উপরে ওঠান তখন সব কাজ মা-ই করেন। কিন্তু শিশুকে তো মায়ের আদেশনুসারে চেষ্টা করতেই হয়। শিশু যদি মায়ের ইচ্ছানুসারে চেষ্টা না করে অথবা তার উল্টো করে তাহলে মা তার ভালর জন্য ভয় দেখান, বকেন, কখন কখন মারেনও।

এই মারার মধ্যেও মায়ের হৃদয়ের ভালবাসা ভরা থাকে। এটিও তাঁর দয়া। তেমনই ভগবানও দয়া করে কখনও কখনও আমাদের সাবধান করে দেন। তাৎপর্য হলো শিশু যেমন নিজেকে এবং নিজের সমস্ত কর্মকে মায়ের কাছে সঁপে দিয়ে মাতৃপরায়ণ হয়ে যায়, তেমনই আমাদেরও নিজেদের এবং আমাদের সমস্ত কাজকর্মকে পরমাত্মার কাছে উৎসর্গ করে তাঁর চরণে পড়তে হবে। এইভাবে যে মানুষ শিশুর মতো পরম শ্রদ্ধায় এবং বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে পরমাত্মার কোলে সঁপে দেয় তাকেই পরমাত্মার কৃপার ইচ্ছুক এবং পাত্র বলে মনে করা হয়। আর তার ফলে সে পরমাত্মার দয়ায় পরমাত্মাকে লাভ করে। সার কথা হলো এই যে পরমাত্মার দয়াতেই পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। দয়াই একমাত্র কারণ। কিন্তু এই দয়া মানুষকে অকর্মণ্য করে দেয় না। পরমাত্মার দয়াতেই এই রকম পরমপুরুষার্থ সৃষ্টি হয়। জীবের নিজস্ব কোনো পুরুষার্থ নেই, সে তো কেবল নিমিত্ত মাত্র।

সন্তের বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত দয়ার সাগর ভগবানের দয়ার তত্ত্ব এবং রহস্যকে যথার্থভাবে যিনি জানেন তিনি দয়ার সমুদ্র এবং সকল ভূতের সুহৃদ হয়ে যান। ভগবান বলেছেন—'**সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।**' (গীতা ৫/২৯)। এই

কথার রহস্য হলো এই যে, যে মানুষ দয়াময় ভগবানকে সকল ভূতের সুহৃদ বলে জানেন তিনি ঐ দয়ার সাগরের শরণাগত হয়ে নির্ভীক হয়ে যান এবং পরম শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করে স্বয়ং দয়াময় হয়ে যান। এই জন্য ভগবান ঠিকই বলেন যে তাঁকে যিনি সুহৃদ বলে জানেন তিনি শান্তি লাভ করেন। এই রকম সন্তদের তো কেউ কেউ মজা করে ভগবানের চেয়েও বড় বলে থাকেন। তুলসীদাস বলেছেন—

মোরে মন প্রভু অস বিশ্বাসা।
রাম কে অধিক রাম কর দাসা।।
রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা।
চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা।।

'ভগবান সমুদ্র হলে সন্ত হলেন মেঘ। ভগবান যদি চন্দনবৃক্ষ হন তো সন্ত হলেন সমীর (পবন)। এই কারণে আমার মনে এই রকম বিশ্বাস জাগে যে রামের দাস রামের চেয়ে বড়।' দুটি দৃষ্টান্তের দিকে মন দিন। সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই জল কোনো কাজে আসে না। সেই জল কেউ পান করে না। সেই জলে কৃষিকাজও হয় না। কিন্তু মেঘ যখন সেই সমুদ্র থেকে জল তুলে যথাযথভাবে বর্ষণ করে তখন কেবল ময়ূর, চাতক এবং কৃষকেরাই নয় উপরন্তু সমগ্র জগতে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এইভাবে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু যতক্ষণ না পরমাত্মার তত্ত্বকে জ্ঞাত ভক্তেরা তাঁদের প্রভাবকে সর্বত্র বিস্তৃত করছেন ততক্ষণ পৃথিবীর লোকেরা পরমাত্মাকে জানতে পারে না। যখন মহাত্মা সন্ত পুরুষেরা সকল সর্বসদ্‌গুণসাগর পরমাত্মার কাছ থেকে সমতা, শান্তি, প্রেম, জ্ঞান এবং আনন্দাদি গুণ আত্মস্থ করে মেঘের মতো পৃথিবীতে সেগুলিকে বর্ষণ করেন তখন জিজ্ঞাসু সাধকরূপ ময়ূর, চাতক এবং কৃষকই নয়, উপরন্তু পৃথিবীর সমস্ত লোক তা থেকে লাভবান হয়। তাৎপর্য হলো এই যে, ভক্ত না থাকলে ভগবানের গুণ মহিমা এবং মহত্ত্বকে পৃথিবীতে কে ছড়িয়ে দিত? এই জন্য ভক্ত ভগবানের চেয়ে উপরে। দ্বিতীয় কথা হলো, চন্দনে সুগন্ধ আছে, কিন্তু যদি বায়ু সেই সুগন্ধকে বহন করে অন্য গাছের কাছে নিয়ে না যেত তাহলে চন্দনের গন্ধ চন্দনেই থেকে যেত। নিম প্রভৃতি গাছগুলি চন্দন হয়ে যেত না। এইভাবে ভক্তগণ যদি ভগবানের মহিমা বিস্তার না করতেন তাহলে অশিষ্ট, দুরাচারী মানুষেরা ভগবানের গুণ এবং প্রেম

লাভ করে শিষ্ট এবং সদাচারী হতে পারত না। এই কারণেও সন্তরা ভগবানের থেকে বড়। এই সব সন্ত পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে সমতা, শান্তি, প্রেম, জ্ঞান এবং আনন্দকে বিস্তৃত করে সকলকে ভগবানের তুল্য করে দিতে চান।

সন্তদের দয়া

সেই মহাত্মাদের মধ্যে কঠোরতা, শত্রুতা এবং বিদ্বেষ বিন্দুমাত্র থাকে না। তাঁরা এতই দয়ালু যে অন্যের দুঃখ দেখলে তাঁদের হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁরা অন্যের কল্যাণকে নিজেদের কল্যাণ বলেই মনে করেন। সেই মানুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ দয়া থাকে। যে দয়া ভীরুতা, মমতা, লজ্জা, স্বার্থ এবং ভয় প্রভৃতির কারণে করা হয়ে থাকে—তা শুদ্ধ নয়। সকল জীবের প্রতি ভগবানের যেমন অকারণ দয়া থাকে মহাপুরুষদেরও তেমনই সকলের প্রতি অকারণ দয়া থাকে। তাঁদের উপর যতই অন্যায় কেউ করুক না কেন, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তাঁদের মনে কখনই উদিত হয় না। কোথাও যদি দেখা যায় যে বদলা নেওয়ার জন্য কিছু করা হয়েছে তবে তা তার অবগুণগুলিকে দূর করে তাকে শুদ্ধ করবার জন্যই করা হয়ে থাকে। এই কাজের মধ্যেও তাঁর দয়া লুকিয়ে থাকে। যেমন, মা-বাবা এবং গুরুজনেরা শিশুর সংশোধনের জন্য স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তাকে দণ্ড দিয়ে থাকেন, সন্তদের মধ্যেও তেমনই কখনও কখনও এই রকম ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে পরম কল্যাণ ভরা থাকে। সেই সন্তেরা করুণার ভাণ্ডার। যারাই তাঁদের সমীপবর্তী হয় তাদেরই মনে হয় যে তারা যেন দয়ার সাগরে ডুব দিয়েছে। সেই মানুষদের দর্শন, ভাষণ, স্পর্শ এবং চিন্তনের মধ্যেও লোকেরা তাঁদের দয়াভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁরা যে পথ ধরেই যান সেখানেই মেঘের মতো দয়া বর্ষণ করতে করতে যান। মেঘ থেকে সব জায়গায় এবং সব সময় বৃষ্টি হয় না। কিন্তু সন্তেরা সর্বদা এবং সর্বত্র বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের দর্শনে, ভাষণে, চিন্তনে এবং স্পর্শে সকল জীব পবিত্র হয়ে যায়। তাদের চরণ যেখানে পড়ে সেই মাটি ধন্য হয়ে যায়। তাঁদের চরণ স্পর্শে ধূলি নিজে পবিত্র হয়ে অন্যদের কাছেও পবিত্র হয়ে ওঠে। তাঁরা যা দেখেন, যা চিন্তা করেন, যা স্পর্শ করেন সব কিছুই পবিত্র হয়ে যায়। তাছাড়া তাঁদের বংশ, বিশেষ করে তাঁদের জনক-জননী তো পবিত্র হয়ে যান—এতে বলার কী আছে! এই রকম মহাপুরুষ যে দেশে জন্মান এবং দেহত্যাগ করেন

সেই দেশ তীর্থ হয়ে যায়। অদ্যাবধি যত তীর্থ হয়েছে সেই সবই পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের ভক্তদের জন্যই হয়েছে। শুধু তাই নয়, সর্ব লোকে পবিত্রকারী তীর্থও তাঁদের চরণ স্পর্শে পবিত্র হয়ে যায়।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা বিদুরকে বলেছেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।।

(শ্রীমদ্ভা. ১/১৩/১০)

'হে স্বামিন্! আপনার মতো ভগবৎ ভক্তেরা স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। (পাপীদের দ্বারা কলুষিত) তীর্থগুলিকে আপনারা আপনাদের হৃদয়ে স্থিত ভগবান গদাধরের প্রভাবের দ্বারা আবার তীর্থত্ব প্রদান করে দেন।'

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিং-
ল্লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।।

(স্কন্দ.মাহেশ্বর.কৌমার. ৫৫/১৪০)

'যাঁর চিত্ত সংবিৎসুখসাগর পরমব্রহ্মে লীন, তাঁর জন্মের ফলে তাঁর বংশ পবিত্র হয়ে যায়। তাঁর জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হয়ে যায়।'

এইসব কিছুই তাঁর কারণে স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে, তাঁকে কিছু করতে হয় না। ভগবান তো তাকেই ভজনা করেন যে তাঁকে ভজনা করে। কিন্তু এই দয়ালু সন্তেরা কেবল ভজনাকারীকে নয়, এমন কি যারা গালিগালাজ করে এবং ক্ষতি করে তাদেরও কল্যাণ করতে প্রস্তুত থাকেন। কুড়ুল চন্দন গাছকে কাটে, কিন্তু চন্দন তাকে স্বাভাবিকভাবেই নিজের গন্ধ দেয়।

কাটই পরসু মলয় সুনু ভাঈ।
নিজ গুন দেই সুগন্ধ বসাঈ।।

প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রভৃতির ইতিহাস এর প্রমাণ। সেজন্য মজা করে ভক্তকে ভগবানের চেয়েও বড় বলা অযৌক্তিক নয়। সন্তেরা গঙ্গা নদী এবং কল্পবৃক্ষের চেয়েও বেশি উপকারী। গঙ্গা এবং কল্পবৃক্ষ তাদের শরণাগত হলে তবেই ক্রমশ পবিত্র করে এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। কিন্তু সন্তেরা তো যারা চায় এবং যারা চায় না তাদের সকলের ঘরে গিয়ে ইহকাল ও পরকাল দুটির কল্যাণের

জন্য চেষ্টা করেন। এই কথায় যদি বলা হয় যে সন্তেরা যখন সকলের কল্যাণ চান তখন সকলের কল্যাণ হয় না কেন? এর উত্তর হলো এই যে সাধারণভাবে তো সন্তেরা যাদের সঙ্গে মিলিত হন তাদের সকলের কল্যাণ চান। কিন্তু বিশেষ লাভ তো শ্রদ্ধা আর প্রেম থাকলে তবেই হয়। যদি একথা বলা হয় যে সন্তেরা জোর করে সকলের কল্যাণ কেন করেন না তো তার উত্তর হলো এই যে জোর করে কেউ কারও কল্যাণ করতে পারে না। পতঙ্গ প্রদীপের আগুনে পুড়ে মরে। দয়ালু মানুষ তাদের উপর দয়া করে তাদের বাঁচাবার জন্য সেই প্রদীপ বা লণ্ঠনকে নিভিয়ে তাদের পরম কল্যাণ করতে চায়। কিন্তু সেই পতঙ্গেরা অন্যত্র যেখানে প্রদীপ জ্বলে সেখানে গিয়ে পুড়ে মরে। এই রকমই যাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য বাসনা হয় না তাদের কল্যাণ করা খুবই কঠিন।

যদি একথা বলা হয় যে যাদের শ্রদ্ধা-প্রেম আছে তাদের প্রতি বিশেষ কল্যাণ করা হয় আর অন্যদের করা হয় সাধারণভাবে, তবে তাতে বৈষম্যের দোষ আসে। এর উত্তর হলো, ব্যাপারটি তা নয়। শ্রদ্ধা ও প্রেমের ন্যূনতার জন্য যদি লোকেরা সন্তদের সর্বব্যাপী অপরিমিত দয়া থেকে লাভ নিতে না পারে তবে তাতে সন্তদের কোনো দোষ নেই। সূর্য পক্ষপাতশূন্য হয়ে অথবা নিসঙ্কোচে সকলকে সমানভাবে কিরণ দিয়ে থাকে। কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে আর সূর্যকান্ত কাঁচ সূর্যের কিরণ পেয়ে অন্য জিনিসকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। এতে সূর্যের কোনো দোষ বা পক্ষপাতিত্ব নেই। তেমনই যার মনে শ্রদ্ধা প্রীতি নেই সে কাঠের মতো কম লাভ পেয়ে থাকে। আর যার শ্রদ্ধা-প্রীতি আছে সে সূর্যকান্ত কাঁচের মতো বেশি লাভ নিয়ে থাকে। সূর্য সকলকে সাধারণভাবে কিরণ দেয়। কিন্তু পেঁচার কাছে তা অন্ধকারের মতো হয়ে থাকে। চাঁদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্না চোরের কাছে খারাপ লাগে। তাতে জ্যোৎস্নার কোনো দোষ নেই। সে তো সকলেরই উপকার করে। তেমনই মহাপুরুষেরা তো সকলেরই উপকার করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুষ্ট ও নীচ প্রকৃতির মানুষ পেঁচার মতো নিজের বুদ্ধিহীনতার দরুণ তাঁকে হিংসা করে এবং চোরের মতো তাঁকে নিন্দা করে। তাতে সন্তদের দোষ কোথায়?

যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই রকম সন্ত পুরুষদের কাছ থেকে যখন সকলেরই প্রত্যক্ষ লাভ হয় তখন সকলে তাঁদের সঙ্গ নিয়ে এবং সেবা করে লাভবান হন

না কেন? এর উত্তর হলো, ঐ লোকেরা সন্তদের গুণ, প্রভাব এবং তত্ত্বকে জানেন না। তত্ত্ব না জানলে কেউ বিশেষ লাভ নিতে পারে না। একটি কুকুর ছিল। সে গুড়ের হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়েছিল। ইতিমধ্যে দরজা নাড়ার শব্দ হলো। কুকুরটা পালাতে চাইল। তাড়াহুড়োতে হাঁড়িটা গেল ভেঙ্গে। হাঁড়ির গলাটা কুকুরের গলায় আটকে রইল। কুকুরের কষ্ট দেখে একজন দয়ালু মানুষ হাতে লাঠি নিয়ে কুকুরটার পিছনে ছুটল। তার উদ্দেশ্য লাঠি দিয়ে হাঁড়ির গলাটা ভেঙ্গে দেওয়া। তাহলে কুকুরটা কষ্ট থেকে বাঁচবে। কুকুরটা লাঠি হাতে লোকটিকে তার পিছনে আসতে দেখে লোকটির আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ভাবল ও বোধহয় তাকে মারতে আসছে। সে আরও জোরে দৌড়াল এবং তার কষ্ট দূর হলো না। এই রকমই মহাপুরুষদের তত্ত্বকে বুঝতে না পেরে তাঁদের কাজের বিপরীত চিন্তা করে লোকেরা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

সন্তদের মধ্যে সম-ভাব

এই রকম মহাপুরুষদের কেবল দয়া নয়, তাঁদের সম-ভাবও অদ্ভুত। তাঁদের যদি সমত্বের প্রতিমূর্তি বলা হয় তাহলে তা অযুক্তি হবে না। ভগবান হলেন সম আর ঐ সন্তদের স্থিতি ভগবানে। এই জন্য সম-ভাব তাঁরা স্বাভাবিকভাবে পেয়ে থাকেন। সুখ-দুঃখ প্রদত্ত হলে অজ্ঞানী পুরুষের, যেমন দেহের সর্বাঙ্গের প্রতি সমভাব থাকে তেমনই সাধু-সন্তদেরও বিশ্ব চরাচরের সকল জীবের প্রতি সমভাব থাকে।

প্রশ্ন — দেহের প্রতি অজ্ঞানীদের যে ভালবাসা সন্তদের কি জগতের প্রতি সেই রকমই ভালবাসা থাকে? নাকি, দেহের প্রতি সন্তদের যেমন ভালবাসা থাকে না তেমনই জগতের সমস্ত ঐহিক বস্তু থেকেও কি তাঁদের ভালবাসা দূরে চলে যায়? তাঁদের সমত্বের স্বরূপ কী?

উত্তর — তাদের সমত্ব বোধ এমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে উদাহরণ দিয়ে তা বোঝান যায় না। কেননা দেহের প্রতি অজ্ঞানীদের যে রকম অহঙ্কার থাকে সন্তদের জগৎ সংসারের প্রতি সে রকম অহঙ্কার থাকে না। এইজন্য একথা বলা যথার্থ নয় যে জগৎ সংসারের প্রতি সন্তদের ভালবাসা অজ্ঞানীদের তাদের দেহের প্রতি ভালবাসার সমতুল। আবার সকলের প্রতি তাঁদের ভালবাসার অভাব একথাও এইজন্য বলা যায় না। কেননা, নিজেদের দেহের স্বার্থে

অজ্ঞানীরা যেখানে অন্যের অহিত করে থাকেন সেখানে সন্তেরা অন্যের কল্যাণের জন্য হাসতে হাসতে নিজেদের শরীরকে উৎসর্গ করে দেন। অধিকন্তু তাঁদের সমত্ব বোধ এমনই অদ্ভুত যে অপরের কল্যাণে নিজেদের শরীর উৎসর্গ করলেও তাতে কোনো বৈষম্য ঘটতে পারে না। তাই কোনো উদাহরণ দিয়ে এই ত্রুটির স্বরূপ বোঝান খুব কঠিন। তবু বোঝাবার জন্য ত্রিভুবনে এবং বেদে এমনভাবে বলা হয়েছে যে সুখ-দুঃখ প্রাপ্তিতে অজ্ঞানীদের শরীরে যেসব অভিন্নতা থাকে তেমনই সকল জীবের সুখ-দুঃখ প্রাপ্তিতে সন্তদের মধ্যে সমত্বের-ভাব এবং অহঙ্কার না থাকলেও সম-ভাব থাকে। অর্থাৎ নিজেদের সুখে-দুঃখে অজ্ঞানী মানুষেরা যেমন সুখী-দুঃখী হয়, সন্তজনেরা মমতা এবং অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়েও এবং নিজেদের সুখে-দুঃখে সুখী-দুঃখী প্রতীত না হলেও অন্য সমস্ত জীবের সুখে-দুঃখে সুখী এবং দুঃখী প্রতীত হন। এমন স্থিতি মানুষ প্রতিপক্ষ ভাবনা থেকে প্রাপ্ত হয়।

অজ্ঞানী মানুষ নিজের দেহের প্রতি অহং ভাবনা এবং অন্যের দেহের প্রতি পরভাবনা বজায় রাখে। এর বিপরীত অপরের প্রতি আত্মভাবনা এবং নিজের শরীরের প্রতি পরের মতো ভাবার নাম প্রতিপক্ষ (বিপরীত) ভাবনা।

অনেকেই সন্তদের সমদৃষ্টির রহস্যকে না জেনে সমদৃষ্টি সম্পর্কীত শাস্ত্রবাক্যের অপপ্রয়োগ করে। গীতায় ভগবান বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।

(৫/১৮)

"জ্ঞানীজনেরা বিদ্যা এবং বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে এবং গাভী, হাতি, কুকুর এবং চণ্ডালের প্রতি সমদর্শীই হয়ে থাকেন।"

এর উল্টো মানে করে লোকেরা বলে থাকে যে 'খাওয়া দাওয়া প্রভৃতিতে বাছবিচার না করাই হলো সমদর্শন।' কিন্তু এই রকম সমব্যবহার না সম্ভব, না প্রয়োজন এবং ভগবানের কথার উদ্দেশ্যও এমন নয়। কেননা হাতির পিঠে লোক চড়তে পারে, কুকুরের পিঠে পারে না। গরুর দুধ খাওয়ার যোগ্য, কুকুরীর বা হস্তিনীর দুধ খাওয়ার যোগ্য নয়। এইগুলির খাদ্য, আচরণ, স্বরূপ, আকৃতি, জাতি এবং গুণ প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য এদের সকলের সঙ্গে একই রকম আচরণ হতে পারে না, করা উচিত নয় এবং সেরকম

করতে কেউ বলতেও পারে না। যেমন নিজের জন্য সুখ ও সুখ লাভের সাধন প্রাপ্তির জন্য এবং দুঃখের সাধনগুলিকে নিবৃত্ত করবার জন্য প্রযত্ন করা হয়, তেমনই সকলের মধ্যে একই আত্মা সমরূপে বিরাজমান এই কথাটি উপলব্ধি করে সকলের কল্যাণ কি করে হবে তারই জন্য যথাযোগ্য আচরণ হলো প্রকৃত অর্থে সমতা।

নিজেদের দেহের ক্ষেত্রে আমরা হাত দিয়ে গ্রহণ করি, চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি। এইভাবে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকি, কিন্তু আত্মীয়তার দৃষ্টিতে সবগুলির মধ্যে সাম্য থাকে। তেমনই সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য আচরণ করে আত্মীয়তার দৃষ্টিতে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখা উচিত। শাস্ত্রীয় বৈষম্য আচরণে দূষিত নয়, বরং তা পরমার্থের সহায়ক। যে বৈষম্যের ফলে কারও অকল্যাণ হলে প্রকৃতপক্ষে তাই বৈষম্য। সকল নারীর শরীর একই রকম হলেও মা, বোন এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে যথাযোগ্য আলাদা আলাদা আচরণ করা হয়। এই বৈষম্য শাস্ত্রীয় এবং ন্যায়সঙ্গত হওয়ায় তা গ্রাহ্য। শুধু তাই নয়, পরম পূজনীয়া মায়ের মধ্যে পূজ্যভাব থাকলেও রজঃস্বলা অথবা প্রসবকালীন অবস্থায় আমরা তাঁকে স্পর্শ করি না। তা করলে স্নান করতে হয়। এই যে বৈষম্য তা প্রকৃত নয়। এটি মানলে লাভ আর না মানলে ক্ষতি হয়। বাড়িতে কুকুরকে রুটি, গরুকে ঘাস, রোগীকে ওষুধ দেওয়া হয়। কিন্তু সকলকে ঘাস, ওষুধ বা রুটি সমান দেওয়া হয় না। এই বৈষম্যও প্রকৃত নয়। যেমন কেউ জেনে শুনে নিজের অকল্যাণ করে না, নিজেকে দুঃখ দেয় না এবং নিজের কল্যাণই চায় আর সুখ ও কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে তেমনই কাউকে দুঃখ না দিয়ে, অহিত না চেয়ে সকলের কল্যাণ চাওয়া এবং সকলকে সুখ প্রদানের চেষ্টা করাই হলো সমতা। এইভাবে আচরণে যত বৈষম্যই থাকুক তা প্রকৃত নয়।

মনে করুন, আমার সঙ্গে কারও বন্ধুত্ব আছে এবং অন্য কারও সঙ্গে আছে শত্রুতা। এই দুজনের সম্পর্কে যদি বিচারের ভার আমার উপর পড়ে তো আমাকে পক্ষপাতশূন্য হয়ে বিচার করতে হবে। আর আমার বন্ধুকে বুঝিয়ে এবং তার সম্মতি নিয়ে যদি যে শত্রুভাবাপন্ন তার অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব করি তবে তাকেও সমতা বলা হবে।

প্রার্থিত কল্যাণকারী সামগ্রী পাওয়া গেলে সেগুলিকে সকলের জন্য সমভাবে বিতরণ করা উচিত। তবে অন্যকে যদি ভাল জিনিসগুলি এবং অধিক

পরিমাণে দিই এবং নিজে নিকৃষ্ট জিনিস নিই অথবা একেবারেই না নিই তাহলে সেই বৈষম্যও প্রকৃত বৈষম্য নয়। তার কারণ এর দ্বারা কারও অকল্যাণ করা হয় না, বরং নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা হয়। এইভাবে বিপদ এবং দুঃখের বিষয়গুলি সকলকে ন্যায্যত সমবিভাজন করার সময় যদি অন্যকে রক্ষা করে নিজের অংশে বিপদ বা দুঃখকে বেশি করে নিয়ে নেওয়া হয় তবে সেই বৈষম্যও বৈষম্য নয়। বরং এতে স্বার্থ ত্যাগ করার কারণে গৌরব আছে। প্রভুর মধ্যে স্থিত হওয়ার জন্য সন্তদের মধ্যে প্রভুর সমতার সমাবেশ ঘটে। অতএব এই অনুপম সমতার সম্পূর্ণ রহস্য মানুষ প্রভুকে প্রাপ্ত করলেই বুঝতে পারে।

মান-অপমান এবং নিন্দা-স্তুতির মধ্যেও সন্তদের সমতা থাকে। কিন্তু আচরণে সর্বত্র তার প্রকাশ ঘটবে এমন কোনো কথা নেই। মান-অপমানের ফলে হৃদয়ে আনন্দ-দুঃখ প্রভৃতি কোনো বিকার উপস্থিত হয় না।

প্র. — নিন্দা এবং অপমানে সাধারণ মানুষদের যেমন দুঃখ হয়, স্তুতি অথবা সম্মানে কি সন্তদেরও তেমন হয়? কিংবা, স্তুতি বা সম্মানে লোকেদের যেমন আনন্দ হয়, সন্তদের কি নিন্দা বা অপমানে তেমনই আনন্দ হয়? এই দুটির মধ্যে সন্তদের সমত্ববোধে আন্তরিকভাবে কী ভাব হয়ে থাকে?

উ. — উভয়ের থেকেই অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে অর্থাৎ মান-অপমান এবং নিন্দা-স্তুতিতে যথোপযুক্ত ন্যায্য আচরণ-ভেদ থাকলেও তাঁদের আনন্দ বা দুঃখ হয় না।

প্র. — সন্তেরা কি অপমান ও নিন্দার প্রতিকার করেন?

উ. — যদি অপমানকারীর বা নিন্দুকের কিংবা অন্য কারও কল্যাণ হয় তাহলে প্রতিকারও করতে পারেন।

প্র. — তাঁরা কি মান-সম্মান প্রতিষ্ঠার প্রাপ্তিকে আচরণে স্বীকার করে নেন, নাকি তার বিরোধিতা করেন?

উ. — দেশ, কাল এবং পরিস্থিতি দেখে শাস্ত্রানুসারে তাঁরা দুটি কাজই করতে পারেন। বিরোধ করলে যদি কারও উপকার হয় তবে তাই করেন। আর স্বীকার করে নিলে যদি কারও উপকার হয় তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তাঁরা সেগুলিকে স্বীকারও করে নেন।

প্র. — তাহলে আচরণ দেখে মহাপুরুষদের কি করে চেনা যাবে?

উ. — ব্যবহারের ক্রিয়া দেখে মহাপুরুষদের চেনা খুবই কঠিন। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে তাঁরা ভাল মানুষ। তা তাঁরা সিদ্ধ পুরুষই হোন বা

সাধকই হোন। সাধকও তো সিদ্ধ সন্ত হয়ে উঠবেন। বস্তুত যাঁর আচরণ সৎ তিনিই সন্ত।

লাভ-ক্ষতিতে এবং জয়-পরাজয়ে সন্তের সম্পূর্ণ সমতা থাকে।

প্র. — সাধারণ মানুষদের যেমন লাভ এবং জয়ে প্রীতি-প্রসন্নতা হয়, সন্তদের কি তার বিপরীত ক্ষতি ও পরাজয়ে প্রসন্নতা হয়ে থাকে? অথবা সাধারণ মানুষদের যেমন ক্ষতি-বৃদ্ধিতে দ্বেষ, ঘৃণা, ভয়, শোক প্রভৃতি হয়ে থাকে, সন্তদেরও কি লাভ এবং জয়ে দ্বেষ, ঘৃণা, ভয়, শোক প্রভৃতি হয়?

উ. — না, তাঁদের সমত্ববোধ এইসব কিছু হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেননা হর্ষ-শোক, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত বিকার থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত।

প্র. — এই রকম অবস্থায় সন্তদের আচরণে সাধারণ মানুষদের মতো কি জয়-পরাজয়ে ঈর্ষা এবং ভয় প্রকটিত হতে পারে?

উ. — যদি সংসারের কল্যাণ হয় অথবা তার দ্বারা ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হয় তাহলে তা হতেও পারে। কিন্তু তাঁদের মনে কোনো রকমের বিকার হয় না।

প্র. — বাইরের যা কিছু ক্রিয়া তা প্রথমে মনে হয়ে থাকে। মনে উত্থিত না হলে বাইরে ক্রিয়া কি করে সম্ভব?

উ. — নাটকের পাত্রদের সবকিছুই যেমন বাহ্যিক আচরণ, তাদের মনে অভিনয় বুদ্ধির অতিরিক্ত কোনো বাস্তবিকতা যেমন থাকে না তেমনই সন্তদের দ্বারা বাহ্যিক আচরণ হতে থাকলেও তাঁদের মনে কোনো রকম বৈকল্য থাকে না।

এই রকম শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রিয়-অপ্রিয় সকল পদার্থের সম্পর্কে তাঁদের সমভাব থাকে। সব কিছুতেই এক অখণ্ড, নিত্য ভগবৎস্বরূপ সমতা সদা-সর্বদা সর্বত্র বজায় থাকে।

সন্তদের মধ্যে বিশুদ্ধ বিশ্বপ্রেম

সন্তদের মধ্যে কেবল সমতাই নয়, সমগ্র বিশ্বে তাঁদের অকারণ ও নিরহঙ্কার অলৌকিক বিশুদ্ধ প্রেমও থাকে। ভগবান বাসুদেবের যেমন সকলের প্রতি অকারণ ভালবাসা থাকে তেমনই ভগবান বাসুদেবকে লাভ করবার পর সন্তদেরও সমগ্র জগৎ সংসারের প্রতি অকারণ প্রেম থাকে। তার কারণ সাধনাবস্থায় তাঁরা সকলকে বাসুদেবের স্বরূপ মনে করেই সাধনা করেন। সুতরাং সিদ্ধ অবস্থায় তো তাঁদের কাছে এটি স্বভাবসিদ্ধই হয়ে যাবে।

প্র. — এই রকম অকারণ প্রেম ভক্তির সাধনা থেকে হয়, নাকি জ্ঞানের সাধনা থেকে হয়?

উ. — দুটির যে কোনো একটির সাধনা থেকেই হতে পারে। যিনি ভক্তির সাধনা করেন তিনি সকল পদার্থকে ঈশ্বর মনে করে নিজের দেহ এবং প্রাণের চেয়ে বেশি করে তাদের ভালবাসেন। আর যিনি জ্ঞানের সাধনা করেন তিনি সকল পদার্থকে নিজের আত্মা মনে করে তাদের নিজের দেহ, প্রাণ এবং আত্মার মতোই ভালবাসেন।

প্র. — একজন সাধারণ মানুষের তার নিজের শরীর, বাড়িঘর, স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদের প্রতি যে রকম ভালবাসা, সন্ত পুরুষদের কি সমগ্র বিশ্বের প্রতি সেইরকম ভালবাসাই থাকে?

উ. — না, তা থেকে অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অজ্ঞানীরা তো শরীর, ঘর-বাড়ি, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির জন্য নীতি, ধর্ম, ন্যায়, ঈশ্বর এবং পরোপকার বৃত্তিকেও ত্যাগ করে এবং নিজের দেহ ও প্রাণকে রক্ষার জন্য স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পদও ত্যাগ করে। কিন্তু যাঁরা সন্ত তাঁরা তো নীতি, ধর্ম, ন্যায়, ঈশ্বর এবং বিশ্বের জন্য কেবল স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদই নয় উপরন্তু নিজের শরীরও ত্যাগ করেন। তাঁরা বিশ্বকে রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীকে, পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য দ্বীপকে, দ্বীপের জন্য গ্রামকে, গ্রামের জন্য আত্মীয়-স্বজনকে, আত্মীয়-স্বজন এবং উপরোক্ত সকলের কল্যাণের জন্য নিজের প্রাণকে আনন্দের সঙ্গে ত্যাগ করে দেন। তাহলে ধর্ম, ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ত্যাগ করা তো তাঁদের কাছে কোনো বড়ো ব্যাপারই নয়। অজ্ঞানী পুরুষ যেমন নিজের আত্মার জন্য সব কিছু ত্যাগ করে তেমনই সন্ত পুরুষেরা ধর্ম, ঈশ্বর এবং বিশ্বের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে দেয়। কেননা ধর্ম, ঈশ্বর এবং বিশ্বই তাঁদের আত্মা; কিন্তু অজ্ঞানীর যেমন দেহের জন্য অহঙ্কার এবং স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনদের জন্য মমতা থাকে সন্তদের সেইরকম অহঙ্কার এবং মমতা থাকে না। তাঁদের সকলের প্রতি অকারণ বিশুদ্ধ এবং অত্যন্ত অলৌকিক অপরিমিত ভালবাসা থাকে।

প্র. — ভক্তিমার্গের পথিক ভক্তদের সমগ্র জগৎ সংসারের প্রতি প্রাণের চেয়েও বড় অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকারের ভালবাসা কেন এবং কি করে হয়?

উ. — তা এইজন্যই হয় যে তাঁরা সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ স্বরূপ মনে করেন।

সো অনন্য জাকেঁ অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।
মৈ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত।।

সেই ভক্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য নিজের তনু, মন, ধন বিসর্জন দিয়ে থাকেন। প্রভুর কাজে নিজের জিনিসগুলিকে কাজে আসতে দেখে তিনি এই কথা ভেবে খুবই আনন্দিত হন যে প্রভু দয়া করে তাঁর জিনিসগুলিকে গ্রহণ করেছেন। ভক্তের ধারণায় এইটিই থাকে যে তাঁর সবকিছুই ভগবানের। তাই ভগবানের কাজেই সেগুলি লাগা উচিত। কিন্তু যতক্ষণ ভগবান সেগুলিকে গ্রহণ না করছেন, ততক্ষণ গৃহীত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। কিন্তু যখন সেই বস্তুগুলি প্রসন্ন চিত্তে বিশ্বরূপ ভগবানের কাজে লাগে তখন তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে মনে করে খুবই প্রসন্ন হন। বিশ্বরূপ ভগবানের প্রসন্নতাতেই তিনি প্রসন্ন। এজন্য তিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। যদি একথা বলা হয় যে তিনি যখন ভগবানকে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন করবার জন্য ভালবাসেন তখন তাঁর ভালবাসাকে অকারণ এবং বিশুদ্ধ কেমন করে বলা যেতে পারে? তার উত্তর হলো এই কারণ প্রকৃত কারণ নয়। এটি হলো পবিত্র ভাব। মানুষের পরম লক্ষ্য এইটিই হওয়া উচিত।

যে ভালবাসা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করা হয় তা কলঙ্কিত, দূষিত। কিন্তু যখন অপরের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সাধিত ভালবাসাকে পবিত্র মনে করা হয় তখন অন্য সকলকে ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ মনে করে তাঁদের যে ভালবাসা তা অবশ্যই পরম পবিত্র।

প্র. — জ্ঞান মার্গে বিচরণকারীর দেহ, প্রাণ এবং আত্মার প্রতি সমান প্রেম কেন এবং কি করে হয়?

উ. — জ্ঞান মার্গে বিচরণকারী মানুষ সকলের আত্মাকে নিজ আত্মাই মনে করে।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।

(গীতা ৬/২৯)

'এইরূপ যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শী হয়ে আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে থাকেন।'

যখন তিনি সকলকে আত্মা মনে করেন তখন সমগ্র বিশ্বের প্রতি তাঁর আত্মার মতো ভালবাসা থাকা যুক্তিযুক্ত। তাই দেহকে আত্মা মনে করে যেমন

অজ্ঞানী নিজের কল্যাণেই নিরত থাকে তেমনই সেই সন্ত পুরুষ সকল ভূতের হিতে রত থাকেন। আর এই রকম সর্বভূতের হিতে রত জ্ঞানমার্গী সাধকই নির্গুণ পরমাত্মাকে লাভ করেন। ভগবান বলেছেন—

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।

(গীতা ১২/৩-৪)

'যাঁরা সর্বত্র সমত্ববুদ্ধিযুক্ত এবং সর্ব প্রাণীর হিতপরায়ণ হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত করে মন-বুদ্ধির পর, সর্বব্যাপী, অকথনীয় স্বরূপ, সদা একরস, নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের নিরন্তর একীভাবে ধ্যানে রত থেকে উপাসনা করেন তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন।'

কিন্তু অজ্ঞানী মানুষের যেমন দেহের প্রতি অহঙ্কার, অভিমান, মমতা এবং আসক্তি থাকে, তেমনই সন্তদের বিশ্বের প্রতি অহঙ্কার, অভিমান, মমতা এবং আসক্তি থাকে না। তাঁদের বিশ্বপ্রেম বিশুদ্ধ জ্ঞানপূর্ণ হয়। অহঙ্কার, অভিমান, মমতা, আসক্তি প্রভৃতি দোষগুলিকে নিয়ে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থবশে যে ভালবাসা তাকে দূষিত মনে করা হয়। ক্ষণভঙ্গুর, নশ্বর দৃশ্য পদার্থগুলিকে সত্য মনে করে সেগুলির সংসর্গ-জনিত মিথ্যা সুখকে ভালবাসা হলো অজ্ঞানপূর্ণ ভালবাসা। সন্তদের মধ্যে এই দুটি জিনিস থাকে না। তাই জ্ঞানী সন্তদের ভালবাসা হলো বিশুদ্ধ এবং জ্ঞানপূর্ণ।

প্র. — ভক্ত যেমন সমগ্র বিশ্বকে নিজের সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা মনে করে প্রয়োজনে বিশ্ব-কল্যাণের জন্য প্রসন্ন চিত্তে নিজের ঐশ্বর্যমণ্ডিত সবকিছুকে এবং নিজকেও বিসর্জন দিয়ে দেয় জ্ঞান মার্গের পথিকও কি তেমনই প্রয়োজনের সময় তা করতে পারেন?

উ. — হ্যাঁ, তা পারেন। কেননা প্রথমত তাঁর দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য ও দেহের কোনো মূল্য নেই। আর দ্বিতীয়ত, অজ্ঞানী মানুষ ঐশ্বর্য এবং দেহকে আনন্দদায়ক মনে করে সেগুলি মূল্যবান মনে করেন। সেজন্য তাঁর দৃষ্টিতে তাঁদের সুখ লাভের জন্য জ্ঞানী পুরুষ ঐশ্বর্য এবং দেহ ত্যাগ করতে পারেন। এতে আশ্চর্য এবং সংশয়ের কী আছে?

জ্ঞান মার্গের পথিক সমগ্র বিশ্বচরাচরকে নিজের চিন্ময় আত্মস্বরূপেই অনুভব করেন। সেজন্য সকলের সঙ্গে তিনি আত্মবৎ আচরণ করেন। যেমন, কখনও দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ফেললে কেউ দাঁতকে উৎপাটন করতে চায় না, কেননা সে জানে যে দাঁত এবং জিভ দুটোই তার। জিভে তো কষ্ট হয়েছেই দাঁতকে আবার কষ্ট দেওয়া কেন? তেমনই জ্ঞানমার্গী সন্ত সকলকে নিজের আত্মা মনে করায় কেউ অনিষ্ট করলেও তিনি তাকে দণ্ড দেওয়ার কথা ভাবেন না। কখনও কখনও যদি এই রকম কিছু দেখা যায়ও তাহলেও বুঝে নিতে হবে যে আত্মোপম প্রেমই তার কারণ। যেমন মানুষ তার দেহের ভাল অঙ্গগুলিকে বাঁচাবার জন্য জেনে-বুঝে গলিত অঙ্গকে ছেদ করার মধ্যে নিজের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করে তেমনই পৃথিবীর কল্যাণের জন্য সন্তেরাও কখনও কখনও স্বাভাবিকভাবে এই রকম কাজ করে থাকেন।

সন্তদের এই রকম বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব এবং রহস্য খুবই বিচিত্র। বস্তুত যাঁরা সন্ত কেবল তাঁরাই এটি জানেন। এই রকম সন্তদের গুণ, আচরণ, প্রভাব এবং তত্ত্বের অনুভূতি তাঁদের সঙ্গ ও সেবা করলেই হতে পারে।

সন্তদের আচরণ ও উপদেশ

প্র. — এই রকম সন্ত মহাত্মাদের আচরণ, না উপদেশ কোন্‌টি অনুকরণীয়?

উ. — আচরণ এবং উপদেশ দুটিই অনুকরণীয়। কেবল আচরণ এবং উপদেশই কেন, তাঁদের প্রত্যেকটি গুণকে নিজেদের হৃদয়ে ভালভাবে গ্রহণ করা উচিত। তবে যদি আচরণ ও উপদেশের মধ্যে পার্থক্য প্রতীত হয় তাহলে উপদেশকে প্রধান মনে করা হয়। যদিও মহাপুরুষদের আচরণ শাস্ত্রের অনুকূলই হয়ে থাকে এবং তাঁরা শাস্ত্রানুসারেই উপদেশ-আদেশ দিয়ে থাকেন তবু সেই পুরুষদের তত্ত্ব ও রহস্যকে না জানার ফলে যে আচরণগুলিকে শাস্ত্রের অনুকূল বলে মনে না হয় সেগুলির অনুকরণ না করাই উচিত।

যদিও ঐ মহাপুরুষদের কাছে কর্তব্য বলে কোনো কিছু নেই তবু তাঁরা স্বভাবতই লোকেদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে লোকহিতার্থে শাস্ত্রানুকুল আচরণ করে থাকেন। তাঁদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ করার কোনো কারণই নেই। তবে শাস্ত্রের অনুকূলে যত কর্ম হওয়া উচিত সেগুলি যদি স্বভাবের নিবৃত্তির জন্যই হোক অথবা শারীরিক বাহ্যজ্ঞান না থাকার কারণে কিংবা কোন কারণে তাঁদের

মধ্যে কোনও শূন্যতা দেখা দেয় তাহলে তার জন্য তাঁদের কেউ বাধ্য করতে পারে না। কেননা তাঁরা বিধি-নিষেধ রূপ শাস্ত্রকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। 'এটি গ্রহণ করো' এবং 'এটি ত্যাগ করো'—এরকম শাসন কেউ তাঁদের করতে পারে না। তাঁদের গুণ এবং আচরণই হলো সদাচার। তাঁদের বাণী উপদেশ-আদেশই হলো বেদবাক্য। তাহলে তাঁদের জন্য বিধান কে দেবে? সুতরাং তাঁদের সকল আচরণই সর্বতোভাবে অনুকরণীয়। তবু যে আচরণ সম্পর্কে সন্দেহ হয়, যাকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলে মনে হয় সেই সন্দেহগুলির নিরসন সেই পুরুষদের জিজ্ঞাসা করে করতে হয়, আর নয়তো সেগুলিকে বাদ দিয়ে যেগুলিকে শাস্ত্রানুকূল মনে হয় সেইগুলিকেই অনুসরণ করা উচিত।

প্র. — যখন এই রকম মহাপুরুষদের কাছে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কোনো শাসন নেই তাহলে তাঁরা কর্মের আচরণ কেন করেন?

উ. — লোকেদের প্রতি দয়া করে লোকহিতের জন্য। স্বয়ং ভগবান বাসুদেবও অবতার গ্রহণ করে লোকহিতার্থে কর্মাচরণ করে থাকেন। সন্তদের তা করবার কথাও বলেছেন—

যদ্‌যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।

(গীতা ৩/২১-২২)

'শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যেসব আচরণ করে থাকেন অন্য লোকেরাও সেই রকম আচরণই করেন। তাঁরা যা কিছু প্রমাণ করে দেন, সমস্ত মানুষ সেগুলিকে অনুসরণ করতে থাকে। হে অর্জুন! আমার ত্রিলোকে তো কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্তি যোগ্য কোনো বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নয় তবু আমি কর্মে নিযুক্ত আছি।'

ভগবানের এই আদর্শ অনুসারে যদি সন্ত পুরুষেরা আচরণ করেন তাহলে তাতে তাঁদের গৌরব এবং লোকেদের পরম কল্যাণ। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই সন্তদের দ্বারা লোকহিতকর কর্মই হয়ে থাকে। এই রকম সন্তদের জীবন লোকেদের উপকারের নিমিত্তেই হয়ে থাকে। সুতরাং লোকেদের উচিত এই রকম সন্তে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রতি পদে ভগবানের দয়া দেখতে দেখতে সকল সময়ে প্রসন্ন চিত্তে

থাকা। ভগবানকে যন্ত্রী মনে করে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে তাঁরই হাতে যন্ত্র হয়ে যেতে হবে এবং তাঁর আজ্ঞানুসারে চলতে হবে। আর এটিও মনে রাখতে হবে, যে এইভাবে নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করে দেয় তার সমস্ত আচরণ ভগবৎ কৃপায় ভগবানের অনুকূল হয়। শরণাগতের এইটি পরীক্ষা। এই শরণাগতিতে ভগবানের অনন্ত দয়ার দর্শন হয় আর ভগবানের দয়াতেই দেবতাদের দ্বারাও পূজনীয় পরম দুর্লভ সন্ত-ভাব লাভ হয়।

(১৪) ভগবৎ-ভক্তদের মহিমা

ভগবানের যাঁরা ভক্ত তাদের মহিমা অনন্ত এবং অপার। স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতে বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের গুণ কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু কেউই তাঁদের পার খুঁজে পায়নি। বাস্তবে ভক্তদের এবং তাঁদের গুণ, প্রভাব এবং সংসর্গের মহিমা কেউ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। শাস্ত্রগুলিতে যা কিছু বলা হয়েছে অথবা ভাষায় যা কিছু ব্যক্ত হয়েছে সেই সবগুলি অপেক্ষা তাঁদের মহিমা অনেক বেশি। রামচরিতমানসে স্বয়ং ভগবান ভাই ভরতের কাছে সাধুদের লক্ষণের প্রসঙ্গে এই রকম মহিমার কথা বলেছিলেন—

বিষয় অলম্পট সীল গুনাকর।
পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর।।
সম অভূতরিপু বিমদ বিরাগী।
লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী।।
কোমলচিত দীনন্হ পর দায়া।
মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া।।
সবহি মানপ্রদ আপু অমানী।
ভরত প্রান সম মম তে প্রানী।।
বিগত নাম মম নাম পরায়ন।
সান্তি বিরতি বিনতী মুদিতায়ন।।
সীতলতা সরলতা ময়ত্রী।
দ্বিজ পদ প্রীতি ধর্ম জনয়ত্রী।।
সম দম নিয়ম নীতি নহিঁ ডোলহিঁ।
পরুষ বচন কবহূঁ নহিঁ বোলহিঁ।।
নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদ কঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুন মন্দির সুখ পুঞ্জ।।

ভগবানের ভক্তেরা ক্ষমা, শান্তি, সারল্য, সমতা, সন্তোষ, পবিত্রতা, চাতুর্য, নির্ভয়তা, শম, দম, তিতিক্ষা, ধৃতি, ত্যাগ, তেজ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম এবং দয়া প্রভৃতি গুণের সমুদ্র।

ভগবানের ভক্তদের হৃদয় ভগবানেরই মতো বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমের চেয়েও বেশি কোমল। তাঁদের উপর কোনো বিপদ এলে তাঁরা আনন্দের সঙ্গে সেই প্রচণ্ডতর বিপদকেও সহ্য করে নেন। ভক্ত প্রহ্লাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি এবং প্রসন্ন চিত্তে সব সহ্য করেছিলেন। এই রকম অবস্থায় ভক্তদের হৃদয় বজ্রের চেয়েও কঠোর হয়ে যায়। কিন্তু অন্যের দুঃখ তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। সেই সময় তাঁদের হৃদয় কুসুমের চেয়েও কোমল হয়ে যায়। সর্বত্র ভগবৎ নিশ্চয় থাকায় কারও সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা বা বিদ্বেষ থাকতে পারে না, কারও প্রতি তাঁদের ঘৃণাও হতে পারে না। সেই মহাপুরুষদের প্রতি যত ক্রূর ব্যবহারই কেউ করুক না কেন তাঁরা তার পরিবর্তে তার কল্যাণই করতে থাকেন। তাঁরা তো দয়ার সাগর হয়ে যান। অপরের কল্যাণের জন্য তাঁরা মহর্ষি দধীচি এবং রাজা শিবির মতো নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে পারেন। অপরে প্রসন্ন হলে তাঁরাও খুব প্রসন্ন হন, সকল জীবের পরম কল্যাণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা প্রীত হন। অপরের কল্যাণের কাছে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মুক্তিকেও বড় বলে মনে করেন না।

এর একটি দৃষ্টান্ত আছে—একজন ধনী দয়ালু দাতা প্রতিদিন হাজার হাজার অনাথ গরীব এবং ভিক্ষুকদের ভোজন করাত। একদিন তার এক কর্মী তার সেই মালিকের সঙ্গে লোকেদের খাদ্য পরিবেশন করছিল, লোকটি খুবই কোমল এবং দয়ালু স্বভাবের ছিল। অনেক দেরী হয়ে যাওয়ায় মালিক তার কর্মীকে বলল 'যাও, তুমিও খেয়ে নাও।' এই কথা শুনে লোকটি বলল, 'প্রভু, আমি এদের সকলকে খাইয়ে তারপরে খাব। আপনার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, এজন্য আপনি গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। এই দুঃখী অনাথদের খাওয়াতে আমার যত আনন্দ হয় নিজের খাওয়ায় তত হয় না।' কিন্তু মালিকও যেতে প্রস্তুত ছিল না। দুজনে মিলে দুঃখী অনাথদের খাওয়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সেই ধনী ব্যক্তিটি আবার তার কর্মচারীটিকে বলল,

'অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তোমাকেও তো খেতে হবে। যাও গিয়ে খেয়ে নাও।' এটি শুনে কর্মচারীটি বলল 'প্রভু! আমি খুবই অকর্মণ্য, স্বার্থপর। তাই আপনি আমাকে বার বার খেতে যাওয়ার কথা বলছেন। যদি আমি নিজের খাওয়া অপেক্ষা এদের খাওয়ানোকে বড় মনে করতুম তাহলে কি আপনি আমাকে খাওয়ার কথা বলতে পারতেন? তবে যিনি ভাল মালিক তিনি অকর্মণ্য কর্মচারীকে পালন করেন। আমি আপনার আদেশ অমান্য করছি। আপনি আমার এই ধৃষ্টতার কথা না ভেবে আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রভু! এই অনাথ ক্ষুধার্ত লোকগুলি থাকতে আমি কি করে খেতে পারি?' এই কথা শুনে মালিক খুব খুশী হয়েছিল এবং সকলকে খাওয়ানোর পর সেই কর্মচারীটিকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে কর্মচারীটিকে বলল, 'আমি তোমার প্রতি খুবই প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যা বলবে আমি তাই করতে প্রস্তুত। বলো, তুমি কী চাও? তুমি যা চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেব।' কর্মচারীটি বলল, 'প্রভু! দীন-দুঃখীদের ভোজন করাবার যে কাজ আপনি প্রতিদিন নিজে করেন সেই কাজকে আমার সবচেয়ে মহৎ কাজ বলে মনে হয়। অতএব সেই কাজটি আমাকে দিন। যদি চান তাহলে আপনার সঙ্গে নিয়ে করান, নয়তো আমাকে একলা করতে দিন।'

এটি এক দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তে ঈশ্বরকে স্বামী, ভক্তকে সেবক, জিজ্ঞাসুদের ক্ষুধার্ত অনাথ দুঃখী এবং তাদের সংসার থেকে মুক্ত করানই হলো ভোজন করান আর পরমধাম মনে করে ঘরে যাওয়াকে বুঝতে হবে।

ভগবানের যিনি প্রকৃত প্রেমী ভক্ত তিনি নিজের মুক্তির পরোয়া না করে সকলের কল্যাণের জন্য প্রসন্ন হৃদয়ে তৎপর থাকেন। আর ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করলে এইটিই চান 'যেন সকল জীবের কল্যাণ হয়।' এই রকম ভক্তদের জন্যই তুলসীদাস লিখেছেন—

মোরেঁ মন প্রভু অস বিশ্বাসা।
রাম তে অধিক রাম কর দাসা।।
রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা।
চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা।।

অর্থাৎ, হে স্বামী। আমার মনে তো এই বিশ্বাস আছে যে রামের দাস রামের চেয়েও বড়। রাম হলেন সমুদ্র এবং সাধুরা হলেন মেঘ। রাম চন্দন গাছ এবং সাধুরা বাতাস। মেঘ সমুদ্র থেকে জল নিয়ে সর্বত্র বর্ষণ করে এবং সমস্ত পৃথিবীকে তৃপ্ত করে। তেমনই সাধু-সন্তেরাও অক্ষয় সুখ এবং শান্তিপ্রদানকারী ভগবানের গুণ, প্রেম এবং প্রভাবের কথা জিজ্ঞাসুদের শুনিয়ে তাদের তৃপ্ত করেন। আর বাতাস যেমন চন্দনের গন্ধ নিয়ে নিম, শাল প্রভৃতি অন্য গাছেদেরও চন্দন করে দেয় তেমনই মহাত্মারা বিজ্ঞানানন্দঘন পরমেশ্বরের ভাবকে নিয়ে জিজ্ঞাসুদের বিজ্ঞানানন্দঘন করে দেয়।

ভগবান নিজেও ভক্তদের গুণগান করতে গিয়ে তাঁদের নিজের থেকে বড় বলেছেন। রাজা অম্বরীষ ভগবানের বড় প্রেমী ভক্ত ছিলেন। তিনি একাদশীর ব্রত করেছিলেন, একবার দ্বাদশীর দিন দুর্বাশা মুনি রাজা অম্বরীষের ঘরে এসেছিলেন এবং রাজার অনুরোধে সেখানে খেতে স্বীকৃত হয়ে স্নানাদি নিত্য কর্ম করবার জন্য যমুনা নদীর তীরে গিয়েছিলেন। তখন দ্বাদশীর কাল উত্তীর্ণ হতে মাত্র চব্বিশ মিনিট সময় বাকি ছিল। তারপরেই ত্রয়োদশী পড়বে। ব্রতের পারণ দ্বাদশীতেই করা অভীষ্ট। দুর্বাশা স্নান করে সময়মতো পৌঁছাননি। তখন রাজা ভেবেছিলেন পারণ না করলে তো ব্রত ভঙ্গ হবে। অন্য দিকে ব্রাহ্মণকে ভোজন না করিয়ে নিজে আগে খেয়ে নিলে পাপ হবে। সেজন্য তিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং তাঁদের আদেশে কেবল চরণামৃত খেয়ে পারণ সম্পন্ন করেন। সেই সময় দুর্বাশা স্নান সেরে ফিরে আসেন। এই কথায় তাঁর খুব রাগ হয়। রাজা অনেক করে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কিন্তু মুনি একটা কথাও কানে নেন না। ক্রোধ বশত রাজাকে মারবার জন্য তিনি তাঁর জটা থেকে একটি চুল উপড়িয়ে নিয়ে তা থেকে একটি কৃত্যা (নষ্ট নারী) তৈরি করেন। রাজা তখনও তাঁর কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃত্যাকে দেখে তিনি ভয়ভীত হননি এবং তাঁর থেকে বাঁচবার কোনো চেষ্টাও করেননি। কিন্তু ভগবানের সুদর্শন চক্র এটি সহ্য করতে পারল না। সেটি কৃত্যাকে মেরে ফেলে দুর্বাশার দিকে ধাবিত হয়। চক্রকে দেখেই মুনি ঘাবড়ে যান এবং তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতির শরণাগত হন। কিন্তু কেউই তাঁকে ভগবানের ভক্তের

কাছে অপরাধী মনে করে কোনো সাহায্য করেননি। শেষকালে তিনি ভগবান বিষ্ণুর শরণ নেন। তিনিও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। সেখানকার বর্ণনা শ্রীমৎভাগবতে এইভাবে করা হয়েছে। ভগবান বলেছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।
যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।।
ব্রহ্মংস্তদ্গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি।।

(৯/৪/৬৩, ৬৫, ৭১)

'হে ব্রাহ্মণ! আমি ভক্তজনের প্রিয় এবং তাদের অধীন। আমার সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয়ের উপর অধিকার লাভ করে, তাই আমি স্বাধীন নই। যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, বাড়ি, আত্মীয় এবং প্রচুর ধন তথা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে আমার শরণাগত হয়েছেন সেই প্রিয় ভক্তদের আমি কি করে ত্যাগ করতে পারি। এইজন্য হে দ্বিজ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি মহাভাগ রাজা অম্বরীষের কাছে গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো। তাতেই তুমি শান্তি পাবে। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

মুনি ফিরে গিয়ে অম্বরীষের শরণ নিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত রাজা না খেয়ে সেইভাবে দাঁড়িয়ে মুনির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করে মুনি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তখন রাজা ভীষণ সঙ্কুচিত হলেন। রাজা স্তুতি করে সুদর্শন চক্রকে শান্ত করলেন। মুনিকেও অনেক রকমে সান্ত্বনা দিয়ে ভাল করে খাওয়ালেন এবং তাঁর সেবা করলেন। তারপরে নিজে খেলেন। ধন্য তিনি। ভগবানের ভক্তকে এমনই হতে হবে।

ভগবানের ভক্তকে ভগবানের চেয়েও বড় বলায় ভগবানকে ছোট করা হয় না। ভক্তকে ভগবানের চেয়ে বড় বলায় ভগবানকেই বড় করা হয়। কেননা ভক্তের সম্মান ভগবান থেকেই প্রাপ্ত।

ভগবানের ভক্তির প্রচার অবশ্যম্ভাবী নয়। তা ভগবানের ভক্তদের প্রতি নির্ভরশীল। নিজের প্রতি ভক্তি এবং নিজের প্রচারে স্বাভাবিকভাবে সকলেরই

সঙ্কোচ হয়। এজন্য ভগবান তাঁর প্রতি ভক্তির কথা স্বয়ং বিস্তারপূর্বক প্রচার না করে নিজের ভক্তদের দ্বারা করান। সেজন্য তাঁর প্রতি ভক্তির এবং তাঁর মহিমার প্রচার বিশেষ করে ভগবানের ভক্তদের উপরেই নির্ভর করে। এইজন্য ভগবানের ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়।

সমগ্র সংসার ভগবানের এক অংশে স্থিত (গীতা ১০/৪২) এবং ভগবান ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত—এই যুক্তিতেও ভগবানের ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়।

পবিত্রতার দিক থেকে ভগবানের ভক্তদের স্থান তীর্থগুলি অপেক্ষা উঁচু। তার কারণ তীর্থগুলি মহিমা তাঁদেরই উপলক্ষ্যে অথবা তাঁদের প্রতাপে গড়ে উঠেছে। যদি বলেন যে অনেক তীর্থ গড়ে উঠেছে ভগবানের অবতার বা লীলার ফলে তবে তা ঠিক। কিন্তু ভগবানের অবতার তো প্রায়ই ভক্তদের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং তাতেও ভগবানের ভক্তেরাই হন নিমিত্ত। তীর্থ সমগ্র জগৎকে পবিত্র করে থাকে। কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা তো তীর্থগুলিকেও পবিত্র করে।

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি।

(নারদভক্তিসূত্র ৬৯)

'এই রকম ভক্তেরা তীর্থকে সুতীর্থ, কর্মকে সুকর্ম এবং শাস্ত্রগুলিকে সৎ শাস্ত্র করে দেন।'

মহারাজ ভগীরথের ঘোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবতী গঙ্গা বরদানের জন্য আবির্ভূত হয়ে ভগীরথকে বলেছিলেন—'ভগীরথ! আমি পৃথিবীতে যাব কি করে? সেখানকার সমস্ত পাপীরা তো আমার কাছে এসে তাদের পাপ ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু আমি সেই পাপীদের অঢেল পাপপঙ্ককে ধোয়ার জন্য কোথায় যাব, সেকথা কি আপনি কিছু ভেবেছেন?' এর উত্তরে ভগীরথ বলেছিলেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯/৯/৬)

'মা! সমগ্র বিশ্বকে যাঁরা পবিত্র করেন, বিষয়ত্যাগী, শান্তস্বরূপ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সেই সাধুসন্তেরা এসে তোমার জলে স্নান করবেন। তাঁদের অঙ্গের স্পর্শে

তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে। কেননা, তাঁদের হৃদয়ে সকল পাপহারী শ্রীহরি বাস করেন।'

গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি তীর্থ তো স্নান-পানের দ্বারা পবিত্র করে। কিন্তু ভগবানের ভক্তদের দর্শন ও স্মরণ মাত্রই মানুষ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। ভাষণ এবং স্পর্শে যে পবিত্র হবে তাতে আর বলার কী আছে! মানুষকে তো তীর্থে যেতে হয় এবং সেখানে গিয়ে স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হতে হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকলে মহৎজনেরা তো নিজেরাই বাড়িতে এসে পবিত্র করে দেন।

মহৎজনেদের পবিত্রতা সম্পর্কে যতই বলা হোক তা যথেষ্ট নয়। স্বয়ং ভগবান নিজমুখে এঁদের গুণকীর্তন করেছেন।

সশ্রদ্ধ চিত্তে মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ তো ভজন এবং ধ্যানের চেয়েও বড়। তাই সনকাদি মহর্ষিরা ধ্যান ছেড়ে দিয়ে ভগবানের গুণাবলী শোনেন। রাজা পরীক্ষিৎ তো কেবল ভগবানের গুণকীর্তন শুনেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবানের গুণ, প্রভাব এবং প্রেমের কথা শুনলেই ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রেম উৎপন্ন হয়।

বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গযেঁ বিনু রাম পদ হোহি ন দৃঢ় অনুরাগ।।

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা থাকলেই ভজন-ধ্যান হয়ে থাকে। শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সঙ্গে ভজন-ধ্যান করলে ভগবানকে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। সুতরাং ভগবানের প্রতি যাতে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার উদ্রেক হয় সেজন্য মহাপুরুষদের সঙ্গ করে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, তত্ত্ব এবং রহস্যের অমৃতময়ী কথা বোঝবার চেষ্টা করা উচিত।

মহাপুরুষদের সঙ্গ মুক্তির চেয়েও বড় বলা হয়েছে।

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ।
তূল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সৎসঙ্গ।।

শাস্ত্র বলে—মুক্তি তো মহাপুরুষদের চরণধূলিতে বিরাজ করে অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক মহাপুরুষদের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। ভাগবতে উদ্ধব বলেছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।

(১০/৪৭/৬১)

'আহা, কতই না ভাল হয় যদি আমি আগামী জন্মে এই বৃন্দাবনের লতা, ওষধি অথবা কোনো একটি কুঞ্জ হতে পারি যার উপর গোপীনীদের চরণধূলি পড়বে।'

ভাগবতে নিজের ভক্তদের মহিমার বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন —

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ।।

(১১/১৪/১৬)

'সকল রকমের প্রত্যাশা থেকে মুক্ত, মননশীল, যিনি কারও প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নন, সমদর্শী এবং শান্ত—সেই ভক্তের পিছনে পিছনে আমি সর্বদা এই উদ্দেশ্য নিয়েই ঘুরতে থাকি যাতে তার চরণ ধূলি পেয়ে আমি পবিত্র হয়ে যেতে পারি।'

যে সব মানুষ মহাপুরুষদের তত্ত্বকে বুঝতে পেরে তাঁদের সঙ্গ নেয় তারা নিজেরাও অপরের পবিত্রকারী হয়ে যায়। তারা না চাইলেও জবরদস্তী তারা মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তারা মুক্তিকে অনাদর করে ভগবানের গুণ ও প্রভাবের কথা শুনে শুনে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যায়। তারা প্রেমে বিহ্বল হয়ে ভগবানকে আহ্লাদিত করে। এইভাবে ভগবানকে আহ্লাদিত করাকে তারা মুক্তির চেয়েও বড় মনে করে।

বিশ্ব সংসারে তিন রকমের মানুষ হয়। তাদের মধ্যে এক ধরনের লোক হলো যারা ন্যায্য পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের ভরণ পোষণ করে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হলো যারা চেয়ে-চিন্তে অথবা সদাব্রতে গিয়ে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। আর তৃতীয় ধরনের মানুষ তাঁরা যারা প্রতিদিন সদাব্রতে যুক্ত থাকেন এবং সকলকে খাইয়ে তারপর খান। পেট তিন ধরনের লোকেদেরই ভরে। তুষ্টি, পুষ্টিও এদের সকলের সমানরূপে হয়। বর্ণানুসারে ন্যায্য জীবিকা অর্জন করায় এই সব লোকেরা শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ প্রশংসার পাত্র তারাই যারা প্রতিদিন সকলকে খাওয়ানর পর নিজেরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করে। মুক্তির সম্পর্কেও এই কথাই ভাবতে হবে।

যারা ভজন, ধ্যান প্রভৃতি সাধনার দ্বারা মুক্তি পায় তারা যারা পরিশ্রম করে পেট ভরায় তাদের সমতুল। যারা কাশী প্রভৃতি স্থানে গিয়ে এবং মহাপুরুষদের শরণ নিয়ে মুক্তিলাভ করে তারা সেই সব মানুষদের মতো যারা চেয়ে-চিন্তে পেট ভরায়। আর যারা ভগবান দিলেও মুক্তিকে গ্রহণ না করে সকলের কল্যাণের জন্য ভগবানের গুণ, প্রেম, তত্ত্ব, রহস্য এবং ভগবানের প্রভাবযুক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে সংসারে প্রচার করে তারা সেই মানুষদের মতো যারা সকলকে খাইয়ে নিজেরা ভোজন করে। যদিও সকলেরই কল্যাণ হয় এবং পরম শান্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিতে সকলেই সমান তবু এই তিন ধরনের মানুষদের মধ্যে যদি কাউকে উচ্চ শ্রেণীতে গণ্য করতে হয় তাহলে তা তাদেরই করতে হবে যারা মুক্তি না চেয়ে সকলের কল্যাণ করায় ব্রতী থাকে। ভগবানের কৃপাতেই এমন অধিকার পাওয়া যায়। অতএব এমন মানুষদের সঙ্গ মুক্তির চেয়েও বড়। এসব মানুষদের ভগবান স্বয়ং গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৬৮-৬৯ শ্লোকে প্রশংসা করেছেন—

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।

'যে মানুষ আমার প্রতি পরম প্রেমবশত এই পরম রহস্যপূর্ণ গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তদের কাছে বলবে সে আমাকেই লাভ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর চেয়ে বড় আমার কোনো প্রিয় কাজ করবার মানুষ কেউ নেই। ভবিষ্যতেও পৃথিবীতে তার চেয়েও আমার বেশি প্রিয় কোনো মানুষ জন্মাবে না।'

এই.রকম মানুষদের ভগবান যখন নিজে থেকেই মুক্তি দিতে চান তখন তাঁরা বলেন—'ভগবান! আমি শুধু চাই আপনার গুণ, প্রেম, তত্ত্ব, রহস্য এবং প্রভাবের কথার মধ্যে সমস্ত দিন-রাত কাটিয়ে দেব। এর চেয়ে বেশি আর কিছুই আমার ভাল লাগে না। আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে চান তাহলে আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে আপনি সকল জীবের কল্যাণ করে দিন।' কত বড় কথা! এই কামনা থাকলেও বস্তুত এটি হলো নিষ্কামভাব।

এই রকম মহাত্মাদের অনুপম সঙ্গ এবং মহান কৃপায় যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে তাঁর রহস্যসহ গুণ এবং প্রভাবকে তত্ত্বগতভাবে জানে সে স্বয়ং পরম পবিত্র হয়ে এই অপার সংসার সাগর পার করে অন্যদেরও পার করাতে সক্ষম হয়ে যায়। এইজন্য মহাপুরুষদের সঙ্গ অবশ্যই করতে হবে ; কেননা মহাপুরুষদের সঙ্গ খুবই রহস্য ও মহত্ত্বের বিষয়। শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে যাঁরা সৎসঙ্গ করেন তাঁরাই এর মহত্ত্ব কিছুটা জানেন। সম্পূর্ণ রহস্য তো একমাত্র ভগবানই জানেন। তিনি এরূপ মহাপুরুষদের ভালবাসার অধীন হয়ে তাদের অনুসরণ করেন।

(১৫) ভগবান কখন অবতার হন?

বর্তমান কালে যে ভীষণ অবস্থা তাতে নানা রকমের অত্যাচার দেখে ধার্মিকদের মনে বড়ই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এইরকমভাবে পাপের প্রসার দেখে সহৃদয় মানুষদের মনে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়।

প্রশ্ন—ভগবান কখন অবতার হন? বর্তমানে এত অত্যাচার হতে দেখেও ভগবান কেন প্রকট হচ্ছেন না? তাহলে কি গীতায় যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়?

উত্তর—গীতায় ভগবান যে কথা বলেছেন তা অবশ্যই ঠিক। এখন অবতার জন্মগ্রহণ করবার সময় হয়নি। তা না হলে ভগবান অবশ্যই অবতার হতেন। ভগবান নিজেই বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

(গীতা ৪/৭-৮)

'হে ভারত। যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখনই আমি রূপ পরিগ্রহ করি অর্থাৎ সাকাররূপে লোকেদের সামনে প্রকট হই। সাধু পুরুষদের উদ্ধার করবার জন্য, পাপাচারীদের বিনাশ করবার জন্য এবং ধর্মকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমি যুগে যুগে প্রকট হয়ে থাকি।'

আগে ভগবান যখনই অবতার হয়েছেন সেই সময়কার অবস্থা যদি আপনারা একটু চিন্তা করেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে সেই সময় কত পাপপূর্ণ এবং ভীষণ ছিল। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে এমন রাজাজ্ঞা ছিল যে, যে কেউ ধর্মাচরণ করবেন এবং হরিকে ভক্তি করবেন তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হবে। হরির নামও কেউ করতে পারবে না। এই রকম রাজাজ্ঞা রাজার নিজের ছেলে প্রহ্লাদ না মানায় তাকে ঘোরতর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এক দিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কী পড়েছ

আমাকে একটু শোনাও তো! প্রহ্লাদ বলেছিল—বাবা! আমি যা পড়েছি শুনুন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/২৩)

'ভগবান বিষ্ণুর নাম এবং গুণ শ্রবণ ও কীর্তন করা, ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলা এবং স্বরূপকে স্মরণ করা, ভগবানের চরণ সেবা করা, ভগবানের বিগ্রহকে পুজা করা এবং তাঁকে নমস্কার করা, দাস্যভাবে আদেশ পালন করা, সখ্যভাবে প্রেম করা, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করা।' এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু বিস্মিত হয়েছিল এবং প্রশ্ন করেছিল—একথা তোমাকে কে শিখিয়েছে? আমার রাজ্যে আমার পরম শত্রু বিষ্ণুকে ভক্তি করবার উপদেশ দিয়ে আমার হাতে কে মৃত্যু মুখে পতিত হতে চায়?' প্রহ্লাদ বলেছিল—

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে।।

(বিষ্ণুপুরাণ ১/১৭/২০)

'হে পিতা! হৃদয়াস্থিত ভগবান বিষ্ণুই তো সমগ্র জগতের উপদেশক। হে তাত! সেই পরমাত্মা ছাড়া আর কে কাকে কী শেখাতে পারে?

ন কেবলং মদ্‌ধৃদয়ং তয়ং স বিষ্ণু—
রাক্রম্য লোকানখিলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতস্মমস্তান্‌
সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্বগঃ।।

(বিষ্ণুপুরাণ ১/১৭/২৬)

'বাবা! বিষ্ণু ভগবান কেবল আমার হৃদয়েই নেই। তিনি আছেন সর্বলোকে। তিনি সর্বত্রগামী, তাই তিনি আমাকে, আপনাকে এবং সকল প্রাণীকে তাদের আপন আপন চেষ্টায় প্রবৃত্ত করেন।'

এই কথা শুনেই রাক্ষসরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং ভক্ত প্রহ্লাদকে নানারকমভাবে তীব্র কষ্ট দেওয়া হলো। হরির নাম করায় প্রহ্লাদকে বিষ খাওয়ানো হলো, পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হলো, সাপ দিয়ে কামড়ানো হলো, আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, ইত্যাদি নানা রকমে রাক্ষসেরা জোর

জবরদস্তি করেছিল। কিন্তু তার কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি—

জাকো রাখৈ সাইয়াঁ, মারি সকৈ নহিঁ কোয়।
বার ন বাঁকা করি সকৈ, জো জগ বৈরী হোয়।।
কহা করৈ বৈরী প্রবল, জো সহায় রঘুবীর।
দস হজার গজবল ঘট্যো, ঘট্যো ন দস গজ চীর।।

প্রবল শত্রু সামনে এসে গেলেও সংসার নিজ গতিতে চলে যায়, তার একটা চুলও কেউ ছিঁড়তে পারে না। ভক্তের উপর খুব অত্যাচার হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত থামের ভিতর থেকে প্রহ্লাদের পরম প্রিয় প্রভুকে প্রকট হতে হয়েছিল।

প্রেম বদৌ পহলাদহিকো জিন পাহনতেঁ পরমেসুর কাঢ়ো।

যদিও সেই সময় লোকেরা ধর্মের পালন করতে চাইত তবু ধর্মকার্যে অনেক রকমের জবরদস্তী বাধা দেওয়া হচ্ছিল। এখন লোকেরা নিজে থেকেই ধর্ম ত্যাগ করছে। কেউ যদি ধর্ম পালন করে তাকে জোর করে বাধা দেওয়া হয় না।

ত্রেতাতে দেখুন—সুবাহু এবং মারীচ যজ্ঞ ধ্বংস করে দিত। মুনিদের খেয়ে ফেলত। শুধু তাই নয়, অনেক রাক্ষস ঘোরতর অত্যাচারও করত। আজকাল তো যেখানে সেখানে পশুদের হাড়ের স্তূপ দেখা যায়। কিন্তু রামায়ণ পড়লে তো মনে হয় যে সেই সময় রাক্ষসেরা ফলমূল ভক্ষণকারী তপস্বী মুনি ঋষিদের হাড় মাংস খেয়ে তাঁদের হাড়ের স্তূপ করে দিয়েছিল।

অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া।
পূছী মুনিন্হ লাগি অতি দায়া।।
জানতহূঁ পূছিঅ কস স্বামী।
সবদরসী তুম্হ অন্তরজামী।।
নিসিচর নিকর সকল মুনি খায়ে।
মুনি রঘুরীর নয়ন জল ছায়ে।।
নিসিচর হীন করউঁ মহি ভুজ উঠাই পন কীন্হ।
সকল মুনিন্হ কে আশ্রমন্হি জাই জাই সুখ দীন্হ।।

(রামচরিতমানস অরণ্যকাণ্ড)

তখন সেই অবস্থায় রামচন্দ্র মানুষের রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এখন সেই মতো ঘোর অবস্থা নয়। যখনই ধর্মের গ্লানি এবং পাপের বৃদ্ধি হয় তখনই

ভগবান প্রকট হয়ে থাকেন। (সত্য, ন্যায় ইত্যাদি সব কিছু ধর্মেরই নাম) ধর্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ। ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।

(গীতা ১৪/২৭)

'হে অর্জুন! সেই অবিনাশী পরব্রহ্মের এবং অমৃতের তথা নিত্যধর্মের এবং অখণ্ড একরস আনন্দের আমিই আশ্রয় অর্থাৎ উপরিউক্ত ব্রহ্ম, অমৃত, অব্যয় এবং শাশ্বতধর্ম তথা ঐকান্তিক সুখ, এই সবই আমার নাম-রূপ। এজন্য আমি এগুলির পরম আশ্রয়।'

ধর্মের ভিত্তির উপরে লোকস্থিতি এই জগৎ-সংসার টিকে রয়েছে—

ধর্মেণ ধার্যতে পৃথ্বী ধর্মেণ তপতে রবিঃ।
ধর্মেণ বাতি বায়ুশ্চ সর্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিতম্।।

'ধর্মের ভিত্তিতেই পৃথিবী টিকে আছে। ধর্মের দ্বারাই সূর্য তাপ বিকিরণ করছে, ধর্মের দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত—সমগ্র বিশ্বসংসার ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সব কিছুর আধার হলো ধর্ম।'

বেদও অনাদী। এর অর্থ এই নয় যে বেদের পুস্তকগুলি অনাদি। তবে তার শিক্ষা অর্থাৎ উপদেশ অনাদি। যথা, '**সত্যং বদ**' '**ধর্মং চর**'—'সত্য কথা বল', 'ধর্মাচরণ কর' ইত্যাদি শিক্ষাগুলি অনাদি, সর্বব্যাপক এবং সর্বমান্য।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি প্রতিপাদিত বিধিবাক্যগুলি হলো ধর্ম। ধর্ম ত্যাগ করে যারা অনীতি করে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসই হয়ে যায়। কংস, রাবণেরা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল।

বর্তমান কালে অবতার হওয়ার উপযুক্ত কি না তা তো প্রভুই নির্ণয় করতে পারেন। এই বিষয়টি বুদ্ধির অতীত। তবু মানুষেরা নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে কিছু অনুমান করে নিতে পারে। তাই আমার সাধারণ বুদ্ধিতে তো এই কথাই মনে হয় যে বর্তমান কালে পাপের বৃদ্ধি এবং ধর্মের ক্ষয় স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও এমন ঘোর সময় এখনও আসেনি যার জন্য ভগবানকে অবতার হতে হবে। এখন কলিযুগের কারণে পাপাচার বাড়ছে। তাহলেও চেষ্টা করলে ভগবানের কৃপায় মানুষেরা তাঁকে পেতে পারে।

ভগবানের দুটি স্বরূপ—নির্গুণ এবং সগুণ। তাঁর নির্গুণ স্বরূপ বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত। সগুণ স্বরূপ বুদ্ধি এবং নেত্রের বিষয়। তাঁকে দেখতে পারি। সগুণেরও দুটি বিভেদ—সাকার এবং নিরাকার। যা সচ্চিদানন্দস্বরূপে সর্বত্র ব্যাপক তা সগুণ নিরাকার স্বরূপ। যেমন সর্বত্র বিস্তৃত বিদ্যুতের তারে বিদ্যুতের প্রবাহ সর্বদা সর্বব্যাপক থাকে তেমনই ভগবানকে দেখা না গেলেও তিনি সদা সর্বদা বিদ্যমান। সূক্ষ্মদর্শী পুরুষ তাঁকে তীক্ষ্ণ নির্মল বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করেন—

দৃশ্যতে ত্বগ্রযয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। (কঠোপনিষদ্ ১/৩/১২)

'এই আত্মা সূক্ষ্মদর্শী পুরুষেরা তাঁদের তীব্র এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা দেখতে পান।'

আর সাকারকে তো আমরা নিজেদের চোখের সামনে প্রকট রূপে দেখতে পারি।

নির্গুণের উপাসনার দ্বারা গুণাতীত ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। গুণাতীতের বর্ণনা তো নিত্য, জ্ঞান, অনন্ত প্রভৃতির শব্দের দ্বারা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর স্বরূপের বর্ণনা কথার দ্বারা করা যায় না। তিনি তো অচিন্ত্য এবং অনির্বচনীয়। শেষ পর্যন্ত বেদও 'নেতি-নেতি' বলে জানিয়েছে। প্রমাণের দ্বারাও সেই অনুমান করা যায় না। তিনি কেবল অনুভবনীয়। কেননা সমস্ত প্রমাণ সেই ব্রহ্মের সন্নিধানেই প্রমাণিত হয়ে থাকে।

শ্রুতি বলেছে—

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।

(কেনোপনিষদ্ ১/৪-৫)

'বাণী যাকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু যার সান্নিধ্যে বাণী প্রকাশিত হয়, তাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান। মন যাকে ধরতে পারে না, কিন্তু যাঁর দ্বারা মন চিন্তা করে থাকে, তাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান। এই নাম-রূপাত্মক দৃশ্য যাকে অবিবেকী লোকেরা উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।'

অতএব এই ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মই যখন শুদ্ধ সত্ত্ববিশিষ্ট হন তখনই তিনি বুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য হন আর সাকাররূপে প্রকট হওয়ার পর তিনি চক্ষু গোচর হয়ে যান। নিজের সাকাররূপে প্রকট হওয়ার বিষয়টি ভগবান এইভাবে জানিয়েছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। (গীতা ৪/৬)

'হে অর্জুন! আমার জন্ম প্রাকৃত মানুষদের মতো নয়। আমি অজাত এবং অবিনাশীরূপ হওয়া সত্ত্বেও এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে নিজের প্রকৃতিকে অধীন করে নিজের যোগমায়ার দ্বারা প্রকট হয়ে থাকি।'

এই রকম বলার পরেও যারা সগুণ ভগবানের তত্ত্বকে মানেন না অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে মানেন না তাদের জন্য ভগবান বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরম ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।। (গীতা ৯/১১)

'আমার পরম ভাবকে জানেন না যেসব মূঢ় লোক; তারা মানুষের শরীরধারী আমাকে—যে আমি সকল ভূতের মহান ঈশ্বর, তাকে তুচ্ছ মনে করে অর্থাৎ যে আমি নিজের যোগমায়ার দ্বারা সংসারের উদ্ধারের নিমিত্ত মনুষ্যরূপ ধারণ করে বিচরণ করি সেই আমিরূপ পরমেশ্বরকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে।'

এইজন্য ভগবানের সাকার তত্ত্বকেও জানা উচিত। যারা ভগবানের সাকার তত্ত্বকে জানে তাদের জন্য ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।। (গীতা ৪/৯)

'হে অর্জুন! আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য অর্থাৎ নির্মল এবং অলৌকিক—এইভাবে যে মানুষ তত্ত্বগতভাবে আমাকে জেনে নেয় সে শরীরকে ত্যাগ করে, আবার জন্মগ্রহণ করে না, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।'

প্রশ্ন—এখানে তত্ত্বগতভাবে জানাটা কী?

উত্তর—ভগবানের জন্ম অসাধারণ, স্বতন্ত্র, তিনি মায়ার স্বামী হয়ে আসেন।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। (গীতা ৪/৬)

'নিজের প্রকৃতিকে অধীন করে নিজে যোগমায়ার দ্বারা প্রকট হই।'

প্রভুর শরীর অনাময় অর্থাৎ তা সমস্ত রোগ এবং বিকার থেকে মুক্ত। আমাদের জন্ম হয় সুখ-দুঃখ ভোগ করবার জন্য। কিন্তু প্রভু প্রকট হন সাধুদের রক্ষা, দুষ্টের নাশ এবং ধর্ম স্থাপনা করবার জন্য।

তিনি তাঁর দিব্য বিভূতিগুলিকে নিয়ে যোগমায়ায় অবতীর্ণ হন। তাঁকে দেখা ও জানা যায় ভক্তির দ্বারা। এখনও ভক্তির দ্বারা ভগবান প্রকট হতে পারেন। ভগবান বলেছেনও—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবিষ্টুং চ পরন্তপ।। (গীতা ১১/৫৪)

'কিন্তু হে পরন্তপ অর্জুন! অনন্য ভক্তির দ্বারা ঈদৃশ চতুর্ভুজবিশিষ্ট আমাকে প্রত্যক্ষ করা, তত্ত্বগতভাবে আমাকে জানা এবং আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অর্থাৎ আমাকে আত্মীকরণ করাও যেতে পারে।'

ভক্তির দ্বারা সব কিছুই হতে পারে। সাকার ভগবানকে চোখের দ্বারা দেখা যায়। সগুণ নিরাকারকে বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এবং নির্গুণ নিরাকারকে অনুভূতির দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়। জ্ঞানরূপ নেত্রবিশিষ্ট জ্ঞানীজনেরাই ভগবানকে তত্ত্বগতভাবে জানতে পারেন। যখন তিনি কৃষ্ণ অবতার হয়েছিলেন তখন অনেকেই তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিল। কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁকে তত্ত্বগতভাবে জেনেছিল। ভগবান জন্মান এবং তাঁর মৃত্যু হয় বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হলো তাঁর অবতরণ ও তিরোভাব। জন্ম-মৃত্যু নয়। যেমন, আগুন সর্বত্র ব্যাপ্ত কিন্তু চেষ্টা করলে তাকে যেখানে খুশী প্রজ্জ্বলিত করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু দেখা না গেলেও এমন নয় যে সেখানে আগুন নেই। সেই রকম ভগবানও সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকলেও প্রকট এবং অন্তর্হিত হয়ে যান। ভগবানের শারীরিক ধাতু চিন্ময় এবং দিব্য, তা প্রাকৃতিক নয়। দেখতে মানুষের দেহবিশিষ্ট হয়ে নরলীলা করেন। সাধারণ প্রকৃতির মতোই তিনি দৃষ্ট হন।

সর্বশক্তিমান পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর বাস্তবে জন্ম এবং মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ অতীত। তাঁর জন্ম জীবেদের মতো নয়। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে নিজের দিব্য লীলার দ্বারা তাদের মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে দর্শন, স্পর্শ এবং ভাষণাদির দ্বারা তাদের সুখ প্রদানের জন্য ; জগতে নিজের দিব্য কীর্তি বিস্তার করে সেগুলির শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ দ্বারা লোকেদের

পাপ নাশ করবার জন্য এবং জগতে পাপাচারীদের বিনাশ করে ধর্ম স্থাপনার জন্য জন্মধারণের কেবল ক্রীড়া করে থাকেন। তাঁর সেই জন্ম নির্দোষ এবং অলৌকিক। জগতের কল্যাণ করবার জন্যই ভগবান এইভাবে মনুষ্যাদির রূপ পরিগ্রহ করে লোকেদের সামনে প্রকট হন। তাঁর এই বিগ্রহ ভৌতিক উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়—তা দিব্য চিন্ময়, প্রকাশমান, শুদ্ধ এবং অলৌকিক। ভগবানের জন্ম গুণ-কর্ম সংস্কার হেতু হয় না। তিনি মায়ার বশবর্তী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। তবে নিজের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হয়ে যোগমায়ার দ্বারা মনুষ্যাদির রূপে লোকেদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রকট হন। এই কথাটি ভালভাবে বুঝে নেওয়া অর্থাৎ এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অসাম্ভব্যতা এবং বিপরীত ভাবনা পোষণ না করে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা এবং সাকাররূপ প্রকটিত ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলে মনে না করে সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, সর্বান্তর্যামী, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা বুঝে ভগবানের জন্মকে তাত্ত্বিকভাবে দিব্য মনে করতে হবে। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এই কথাই বোঝান হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের ২৪-তম ও ২৫-তম শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের ১১শ ও ১২শ শ্লোকে এই তত্ত্বকে না বুঝে যারা ভগবানকে সাধারণ মানুষ মনে করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। আর দশম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে এই তত্ত্বকে যাঁরা উপলব্ধি করেন তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

ভগবানের জন্মানর এই দিব্যভাবকে যে মানুষ তত্ত্বগতভাবে বুঝে নেয় তার কাছে ভগবানের সঙ্গে মুহূর্ত কালের বিরহও অসহ্য মনে হয়। ভগবানের প্রতি পরম শ্রদ্ধা এবং অনন্য প্রেম থাকায় সে ভগবানের অনন্য চিন্তন করে থাকে।

প্রশ্ন—এতে কর্মের কী দিব্যতা আছে?

উত্তর—ভগবানের কর্ম অহঙ্কার এবং স্বার্থ রহিত হয়ে কেবল লোকহিতের জন্যই হয়ে থাকে। ভগবান নিজেই বলেছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মনি।।

(গীতা ৩/২২)

'হে অর্জুন! এই তিন লোকে আমার না আছে কোনো কর্তব্য, না আছে কোনো প্রাপ্য, বস্তুর অপ্রাপ্তি। তাহলেও আমি কর্মে নিরত থাকি।'

কিন্তু—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।

(গীতা ৪/১৪)

'কর্মের ফলে আমার স্পৃহা নেই, এজন্য কর্ম আমাকে লিপ্ত করে না—আমাকে এইভাবে তত্ত্বগতভাবে যে জেনে নেয় কর্ম তাকেও বাঁধতে পারে না।'

ভগবানের সকল কর্ম লীলাময়। তাঁর কর্মের দ্বারা লোকেরা নীতি, ধর্ম এবং প্রেমের উপদেশ পেয়ে থাকে। ভগবান সৃষ্টি রচনা এবং অবতার লীলাদি যা কিছু কর্মই করে থাকেন সেগুলির মধ্যে তাঁর কিছুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। কেবল লোকেদের অনুগ্রহ করবার জন্যই তিনি মনুষ্যাদির অবতার হয়ে নানা প্রকারের কর্ম করেন (৩/২২-২৩)। ভগবান নিজের প্রকৃতির দ্বারা সমস্ত কর্ম করতে থাকলেও সেইসব কাজে তাঁর কর্তৃত্ব থাকে না, সেজন্য বাস্তবে তিনি কোনো কর্ম করেন না এবং এর বন্ধনেও পড়েন না। সেই সব কর্মে ভগবানের বিন্দুমাত্র স্পৃহা থাকে না (৪/১৩-১৪)। ভগবানের যা কিছু প্রয়াস তা লোক হিতার্থে হয়ে থাকে (৪/৮)। তাঁর প্রত্যেক কাজে লোকহিত পরিপূর্ণ থাকে। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু হওয়া সত্ত্বেও সর্বসাধারণের সঙ্গে নিরহঙ্কার, দয়া এবং সপ্রেম সমতার আচরণ করে থাকেন (৯/২৯) ; মানুষ তাঁকে যেভাবে ভজনা করে তিনি তাকে স্বয়ং সেইভাবেই ভজনা করেন (৪/১১) ; নিজের অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম ভগবান নিজেই বহন করেন (৯/২২) ; তাদের দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন (১০/১০-১১) আর ভক্তিরূপী তরণীতে উপবিষ্ট ভক্তদের সংসার সমুদ্র তাড়াতাড়ি পার করবার জন্য নিজে তার কর্ণধার হয়ে যান (১২/৭)। এইভাবে ভগবানের সকল কর্ম আসক্তি, অহঙ্কার এবং কামনাদির দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং শুদ্ধ থাকে। তা কেবল লোক কল্যাণের জন্য এবং নীতি, ধর্ম, শুদ্ধ প্রেম এবং ন্যায় প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রচার করবার জন্যই হয়ে থাকে। এত সব কর্ম করতে থাকলেও ঐ সব কর্মের সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি ঐগুলির সম্পূর্ণরূপে অতীত এবং অ-কর্তা। এই কথাটি ভালভাবে বুঝে নেওয়া, এর বিন্দুমাত্র অসম্ভাব্যতা অথবা বিপরীত ভাবনা পোষণ না করে সম্পূর্ণরূপে একে বিশ্বাস করা হলো ভগবানের কর্মকে তত্ত্বগতভাবে দিব্য বলে উপলব্ধি করা। এই কথা জেনে নিলে সেই জ্ঞাতার কর্মও

শুদ্ধ এবং অলৌকিক হয়ে যায়। অর্থাৎ তিনিও সকলের সঙ্গে দয়া, মমতা, ধর্ম, নীতি, বিনয় এবং নিষ্কাম প্রেমের আচরণ করেন। ভগবানের প্রতি যাদের প্রেম ও শ্রদ্ধা থাকে তারা ভগবানের প্রত্যেক লীলাময় ক্রিয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে এবং প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁকে আদর্শ মেনে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে। এইভাবে ভগবানের লীলাময় কর্মে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যারা তাঁর অনুসরণ করে তারাও কর্মে লিপ্ত না হয়ে পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত করে। আর তাদের কর্মও দিব্য হয়ে যায়।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।। (গীতা ৪/১৯)

'যাঁর সকল শাস্ত্রসম্মত কর্ম ফলতৃষ্ণা এবং কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত এবং যাঁর সকল কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত—সেই রকম মহাপুরুষকে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও পণ্ডিত বলে থাকেন।'

ফলকামনা, আসক্তি এবং কর্তৃত্বাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে কেবল লোকহিতার্থে যে কাজ করা—বাস্তবে এইটিই হলো ভগবানের কর্মের দিব্যতাকে অনুধাবন করা। যার কর্ম এই রকম নয়, সে ভগবানকে অনুকরণ করে না, সে বাস্তবে ভগবানের কর্মের মনোহারিত্ব বুঝতে পারেনি। কেননা যে ভগবানের কর্মের মনোহারিত্ব বুঝে নেয় তার কর্মও দিব্য হয়ে যায়।

আগেও মুমুক্ষু সাধকেরা এইটি বুঝে কর্মের আচরণ করেছিলেন। ঐভাবে আসক্তি, ফলকামনা এবং কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কর্ম করবার জন্য ভগবান অর্জুনকে আদেশ দেওয়ার সময় কর্মের তত্ত্বকথা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।
(গীতা ৪/১৬-১৮)

'কর্ম কী? এবং অকর্ম কী?—এই বিষটি স্থির করতে বুদ্ধিমান মানুষেরাও বিভ্রান্ত হন। সেজন্য আমি তোমাকে এই কর্মতত্ত্ব ভাল করে বুঝিয়ে বলব। এটি

মেনে তুমি অশুভ থেকে অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কর্মের স্বরূপও জানা উচিত, অকর্মের স্বরূপও জানা উচিত আবার বিকর্মের স্বরূপও জানা চাই। কেননা কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। যে মানুষ কর্মে অকর্মকে দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং সেই যোগী সর্বকর্মকারী।'

প্রশ্ন—কর্মে অকর্ম দেখাটা কী? আর এই রকম যিনি দেখেন তিনি মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকর্মকারী, তা কেমন করে?

উত্তর—লোক প্রসিদ্ধিতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এবং শরীর দ্বারা সাধিত ক্রিয়াগুলির নামই হলো কর্ম। এইগুলির মধ্যে যেগুলি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম সেগুলিকেই কর্ম বলা হয়। আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্মগুলিকে বিকর্ম বলা হয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্মগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্যাজ্য। সেজন্য সেগুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়নি। অতএব এখানে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মে অকর্ম দেখা কী সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যজ্ঞ, দান, তপ তথা বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা অর্জন এবং শরীর যাপনের সম্পর্কিত যত শাস্ত্রবিহিত কর্ম আছে, সেইগুলি আসক্তি, ফলতৃষ্ণা, মমতা এবং অহঙ্কার ত্যাগ করে এই লোকে অথবা পরলোকে সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ তথা পুনর্জন্মের হেতু হয় না, বরং পূর্বকৃত সকল শুভাশুভ কর্মফলও বিনাশ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়—এই রহস্যকে বুঝে নেওয়াই হলো কর্মে অকর্ম দেখা। এইভাবে যাঁরা কর্মে অকর্ম দেখে তাঁরা আসক্তি, ফলতৃষ্ণা এবং মমতা ত্যাগ করেই কর্তব্যকর্মগুলির যথোচিত আচরণ করেন। অতএব তাঁরা কর্ম করতে থাকলেও তাতে লিপ্ত হন না। তাই তাঁরা মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান, তাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করেন। তাই তাঁরা যোগী এবং তাদের কোনো রকম কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। তাঁরা কৃতকৃত্য হয়ে যান। তাই তাঁরা সর্বকর্মকারী।

প্রশ্ন—অকর্মে কর্ম দেখা কী? আর এই রকম যাঁরা দেখেন তাঁরা মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকর্মকারী কেমন করে?

উত্তর—লোক প্রসিদ্ধিতে মন, বাণী এবং শরীর সম্বন্ধীয় ক্রিয়াগুলিকে ত্যাগ করার নামই হলো অকর্ম। কিন্তু এই ত্যাগরূপ অকর্ম যদি আসক্তি, ফলতৃষ্ণা, মমতা, কর্তৃত্বাভিমান পূর্বক করা হয় তাহলে তা পুনর্জন্মের হেতু হয়ে যায়। শুধু তাই নয়। কর্তব্য কর্মকে অবহেলা করলে অথবা দাম্ভিকভাবে

করলেও এটি বিকর্ম (পাপ)-এর রূপে পরিণত হয়—এই রহস্যকে বুঝে নেওয়াই হলো অকর্মতে কর্মকে দেখা। এই রহস্যকে যেসব মানুষ বোঝেন তাঁরা শারীরিক পরিশ্রমের ভয়ে বর্ণাশ্রম অনুমোদিত কর্ম ত্যাগ করেন না। কিংবা রাগ-দ্বেষ অথবা মোহবশে বা মান-সম্মান এবং অন্য কোনো ফলপ্রাপ্তির জন্যও কর্মের ত্যাগ করেন না। এইজন্য তাঁরা না কখনও কর্তব্যচ্যুত হন, না কখনও কোনো রকমের ত্যাগে মমতা, আসক্তি, ফলতৃষ্ণা অথবা কর্তৃত্বাভিমানের সম্বন্ধ যুক্ত করে পূনর্জন্মের অংশীদার হন। এই জন্য তাঁরা মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান। তাঁদের পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা হয়ে যায়। এই জন্য তাঁরা যোগী এবং তাঁদের কাজে কোনো কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। তাই তাঁরা সর্বকর্মকারী।

প্রশ্ন—কর্মের দ্বারা ক্রিয়মাণ, বিকর্মের দ্বারা বিবিধ প্রকারে সঞ্চিত কর্ম এবং অকর্মের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মগুলিসহ সকল কর্ম দেখার যদি এই অর্থ করা হয় যে ক্রিয়মান কর্ম করার সময় এই দেখতে হবে যে ভবিষ্যতে এই কর্মই প্রারব্ধ কর্ম (অকর্ম) হয়ে গিয়ে ফলভোগের রূপে উপস্থিত হবে এবং অকর্মে দেখার অর্থ যদি এই করা হয় যে ভাগ্যবশত ফলভোগের সময় ঐ সব দুঃখাদি ভোগ নিজের পূর্বকৃত ক্রিয়মাণ কর্মেরই ফল আর এটি বুঝে পাপকর্মগুলি ত্যাগ করতে হবে এবং শাস্ত্র বিহিত কর্ম করতে হবে ; তাহলে তাতে আপত্তি কেন? কেননা সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং ভাগ্যানুকূল কর্মের মধ্যে এই তিনটি বিভেদ প্রসিদ্ধ।

উত্তর—ঠিক আছে, এমন মনে করা খুবই লাভপ্রদ এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এরকম অর্থ মেনে নিলে **'কবয়োঽপত্র' মোহিতাঃ', 'গহনাকর্মণো গতিঃ', যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ', 'স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ' 'তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ', 'নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ'** প্রভৃতি বচনগুলির সঙ্গে সঙ্গতি পাওয়া যায় না। অতএব এইগুলি লাভপ্রদ হলেও প্রকরণ বিরুদ্ধ।

প্রশ্ন—কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম যে দেখবে সেই সাধকও কি মুক্ত হয়ে যাবে, নাকি এটি শুধুমাত্র সিদ্ধপুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

উত্তর—মুক্ত পুরুষদের কাছে যা স্বাভাবিক লক্ষণ সাধকদের কাছে সেইগুলিই হলো সাধ্য। অতএব মুক্ত পুরুষ তো এই তত্ত্বকে স্বাভাবিকভাবেই জানেন এবং সাধকেরা তাঁদের উপদেশ শুনে সাধনার দ্বারা মুক্ত হয়ে যান। এই

জন্যই ভগবান বলেছেন 'আমি তোমাকে কর্মতত্ত্ব, বলব। সেটি জেনে তুমি কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।'

উপরোক্তভাবে যিনি কর্মযোগের তত্ত্বকে জানেন তিনিই মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকর্মকারী। তাই এই কর্ম রহস্যকে জ্ঞাত হয়ে তিনি সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

এইভাবে কর্মের তত্ত্ব জেনে ফল, কামনা, আসক্তি এবং কর্তৃত্বা-ভিমানকে ত্যাগ করে সকল কর্ম করে যাওয়াই হলো ভগবানের কর্মসমূহের মনোহারিত্ব।

উপরে বর্ণিত ভগবানের জন্ম এবং কর্মের মনোহারিত্বের তত্ত্বকে যাঁরা মানেন তাঁরা সকল কর্ম এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন।

(১৬) শ্রীমৎ ভাগবতে বিশুদ্ধ ভক্তি

শ্রীমৎ ভাগবত একটি অলৌকিক গ্রন্থ। এতে বর্ণাশ্রমধর্ম, মানবধর্ম, কর্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ প্রভৃতি ভগবৎ প্রাপ্তির সকল সাধনার বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় যে এখানে ভগবানের প্রতি ভক্তির কথাই বিশেষরূপে নিরূপণ করা হয়েছে। ভক্তির বর্ণনা সাধন ও সাধ্য দুদিক থেকেই করা হয়েছে। গ্রন্থটির আদি, মধ্য এবং অন্ত ভক্তির দ্বারাই ওতপ্রোত হয়ে আছে। প্রথম স্কন্ধেই বলা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাঽঽত্মা সংপ্রসীদতি।।

(১/২/৬)

'মানুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—পরম ধর্ম সেইটিই যার দ্বারা হরির প্রতি নিষ্কাম এবং অচলা ভক্তি হয়। ভক্তির দ্বারা আনন্দস্বরূপ ভগবানকে লাভ করে হৃদয় প্রফুল্ল হয়।'

এই রকম ১২শ স্কন্ধের শেষে বলা হয়েছে—

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো।।
নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।।

(১৩/২২-২৩)

'হে দেবদেব! হে প্রভু! আপনিই আমার স্বামী। এমন কৃপা করুন যাতে আপনার চরণ কমলে আমার জন্মজন্মান্তরে ভক্তি থাকে। যাঁর নাম-সংকীর্তন সকল পাপ নাশ করে এবং যাঁর প্রতি প্রণাম সকল দুঃখের উপশম করে সেই পরমেশ্বর হরিকে আমি নমস্কার করি।'

ভক্তির মহিমা বলতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে একথাও বলেছেন—

না সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াহহত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।
ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি।।
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনাহহনন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাহহশয়ঃ।।
বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।।
যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্।।
(১১/১৪/২০-২৫)

'উদ্ধব! আমার প্রতি বর্ধমান ভক্তি যেভাবে আমাকে সহজ-প্রাপ্ত করে দেয় সেইভাবে যোগ, জ্ঞান, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং দানও করে দেয় না। আমি সন্তদের প্রিয় আত্মা। একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমাকে পাওয়া সহজ। অন্যদের কথা ছেড়ে দিলেও জাতিতে চণ্ডালেরাও আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। সত্য এবং দয়ায় পূর্ণ ধর্মই হোক অথবা তপস্যা-নিরত বিদ্যাই হোক আমার প্রতি ভক্তি না থাকলে সেই ধর্ম এবং বিদ্যা কারও অন্তঃকরণকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে পারে না। যতক্ষণ না আমার প্রেমে শরীর পুলকিত হয়ে যাচ্ছে, হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমার প্রতি এরূপ ভক্তি বিনা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হতে পারে না। ভক্তির আবেশে যার বাণী গদ্গদ হয়ে গিয়েছে, চিত্ত দ্রবিত হয়ে গিয়েছে, যে কখনও কাঁদে, কখনও হাসে,

কখনও সঙ্কোচ ত্যাগ করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গায় আবার কখনও নেচে ওঠে—আমার এই রকম ভক্ত স্বয়ং পবিত্র তো বটেই উপরন্তু তিনি সমস্ত লোককে পবিত্র করে দেন। যেভাবে আগুনে পোড়ালে সোনা ময়লা ত্যাগ করে এবং আবার পোড়ালে নিজের স্বচ্ছ স্বরূপ পেয়ে যায় তেমনই আত্মাও আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা কর্মবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আবার আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে পেয়ে যায়।

ভক্তির দ্বারা ভগবান বশীভূত হন। তিনি বলেছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।।
যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।।
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশীকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ো ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

(৯/৪/৬৩-৬৬, ৬৮)

'আমি সর্বতোভাবে ভক্তের অধীন এবং স্বাতন্ত্র্য হীনের মতো। সাধুহৃদয় ভক্তেরা আমাকে নিজেদের হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে। আমি সর্বদা সেই ভক্তদের প্রিয়। হে ব্রহ্মণ্। আমিই আমার ভক্তদের একমাত্র আশ্রয়। আর কারও আশ্রয় তাদের নেই। এজন্য আমার ঐ সাধুস্বভাব ভক্তদের ত্যাগ করে আমি না নিজেকে চাই, না চাই আমার অর্ধাঙ্গিনী অবিনাশী লক্ষ্মীকে। আমার যেসব ভক্ত স্ত্রী, পুত্র, ঘর সংসার, প্রাণ, ধন, ইহলোক এবং পরলোক—সবকিছু ত্যাগ করে কেবল আমার শরণ নেয় তাদের ত্যাগ করবার কথা কি আমি কখনও ভাবতে পারি। যেমনভাবে সতী স্ত্রী আপন পতিব্রতের দ্বারা সদাচারী পতিকে নিজের বশে করে নেয় তেমনই নিজেদের হৃদয়কে আমার প্রতি প্রেম-বন্ধনের দ্বারা বন্দী করে রাখা সমদর্শী সাধু পুরুষেরা ভক্তির দ্বারা

আমাকে তাদের বশীভূত করে নেয়। বেশি কী বলব—আমার প্রেমী ঐ সাধু পুরুষেরা হলো আমার হৃদয় আর আমিও ঐ প্রেমী সাধুদের হৃদয়। তারা আমাকে ছাড়া আর কিছু মানে না আর আমিও তাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।'

এক জায়গায় তো ভগবান একথাও বলেছেন—

অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ।।

(১১/১৪/১৬)

'আমি ঐ ভক্তদের সর্বদা এইজন্যই অনুগমন করতে থাকি, যাতে তাঁদের চরণধূলির দ্বারা আমি পবিত্র হয়ে যেতে পারি।'

ভক্তির সত্যই এমন মহিমা। ভক্তি এমনই অনুপম জিনিস যে যিনি এটি পান তিনি যা চান তাই পেয়ে যান।' ভগবান শ্রীমদ্‌ভগদ্‌গীতায় বলেছেন ঃ

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবিষ্টুং চ পরন্তপ।।

(১১/৫৪)

'কিন্তু হে পরন্তপ অর্জুন! অনন্য ভক্তির দ্বারা এই রকম চতুর্ভুজ রূপবিশিষ্ট আমাকে প্রত্যক্ষ করার, তত্ত্বগতভাবে আমাকে জানার, আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার অর্থাৎ আমাকে অনন্যভাবে প্রাপ্ত হওয়ার আমি যোগ্য।'

ভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণা ভক্তি এরূপই। শ্রীমৎ ভাগবতে এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি তথা এই ভক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সে বৈধীঃভক্তি—তারও ভারী সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

শ্রীমৎ ভাগবতের দশম স্কন্দ তো ভক্তিতে ভরপুর। ভগবানের বিবিধ লীলার অত্যন্ত সুমধুর বর্ণনা থাকায় এই অধ্যায়টি পড়লে এবং শুনলে খুবই রস পাওয়া যায়। এই দশম স্কন্দে ভগবানের এমন কয়েকটি লীলার বর্ণনা আছে যা পড়ে অজ্ঞ লোকেরা কলঙ্ক লেপন করতে বিরত হয় না। তারা বলে, ভগবানের সব কাজ তো আদর্শ স্বরূপ। তাহলে তাঁর সম্পর্কে চুরি, কপটতা, কাম, রমণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ কি করে আসতে পারে? বাস্তবে কথা তা নয়। মিথ্যা-কপটতা এবং চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি দোষ তো সেইসব মানুষদের মধ্যেও আসতে পারে না যারা অনন্য চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। তাহলে

যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর সম্পর্কে তো এমন দোষের কথা কল্পনাও করা যায় না। ভগবান তো অবতার হয়েছিলেন সাধুদের উদ্ধার, দুষ্টদের দণ্ড প্রদান এবং ধর্ম সংস্থাপনার উদ্দেশ্যে। তিনি এমন কাজ করতেই পারেন না যার দ্বারা সাধুদের বদলে দুষ্টের দুরাচার উৎসাহিত হয় এবং ধর্মের মূল শিথিল হয়ে যায়। ভগবান স্বয়ং তাঁর শ্রীমুখে ঘোষণা করেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষ লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।

(গীতা ৩/২১-২৫)

'শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যেসব আচরণ করেন অন্য পুরুষেরাও সেই রকম আচরণই করে থাকেন। তাঁরা যা কিছু প্রমাণ করে দেন, সমগ্র মানুষ সমাজ সেগুলিকেই অনুসরণ করতে থাকেন। হে অর্জুন! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্ত করার যোগ্য কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নেই। তাহলেও আমি কর্ম করে থাকি। কেননা, হে পার্থ। কখনও যদি আমি সাবধান হয়ে কর্মে নিযুক্ত না হই তাহলে খুবই ক্ষতি হবে। তার কারণ মানুষেরা সবদিক থেকে আমার মার্গই অনুসরণ করে থাকে। তাই আমি যদি কর্ম না করি তবে এই সব মানুষ নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর আমি সঙ্কারাদি সৃষ্টির এবং এইসব প্রজাদের নষ্ট করবার কারণ হয়ে যাব। হে ভারত! কর্মে আসক্ত হয়ে অজ্ঞানীরা যেভাবে কর্ম করে আসক্তি মুক্ত বিদ্বানেরাও লোক কল্যাণার্থে যেন সেই রকম কর্ম করেন।'

এই রকম কথা যিনি বলেন সেই ভগবান এমন কাজ করবেন যার দ্বারা লোকশিক্ষায় বাধা উপস্থিত হবে, তা হতেই পারে না। অতএব শ্রীমৎ ভাগবতে যেখানে কাম, রমণ, রতি প্রভৃতি শব্দ এসেছে সেখানে সেগুলির খারাপ অর্থ না করে অন্য অর্থ করা উচিত এবং বাস্তবিকতাও তাই-ই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন—

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে।।

(১০/৯-১০)

'যাদের চিত্ত সর্বদা আমার প্রতি অভিনিবিষ্ট এবং যাদের প্রাণ আমার প্রতি অর্পিত সেই ভক্তজনেরা নিজেদের মধ্যে আমার প্রতি ভক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে আমার প্রভাব জেনে এবং নিরন্তর আমার গুণ ও আমার প্রভাব কীর্তন করে সন্তুষ্ট হয়। আমিই যে বাসুদেব সেই আমাতে তারা 'রমণ' করে। ঐ রকম যারা আমার ধ্যানে সর্বদা নিযুক্ত এবং প্রেমপূর্বক আমাকে ভজনা করে তাদের আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তারা আমাকেই লাভ করে থাকে।'

এটি হলো সাধনাবস্থার বর্ণনা, এখনও সাধক ভগবানকে লাভ করেননি। এই শ্লোক দুটিতে ভক্তের সেই মানসিক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলস্বরূপ ভগবানের প্রাপ্তি ঘটে। এখানে তিনি মানসিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানকে দেখেন, শোনেন এবং রমণ করেন। ভক্তের ভগবানের সঙ্গে এই রমণ কখনও কুৎসিত ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়। এটি পরম পবিত্র মানসিক ভাব। এই মানসিক ভাব নিয়েই তিনি ভগবানকে চিন্তা করেন, তাঁর সংস্পর্শ লাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বার্তালাপ করেন। ভাগবতে বর্ণিত রমণ, কাম প্রভৃতি শব্দগুলির এই রকম তাৎপর্যই বোঝা উচিত। ভগবানের প্রতি কোনো রকম কুৎসিত ক্রিয়া আরোপ করা তো নিজের কুৎসিত বৃত্তিরই পরিচয়।

এই-যে বলা হয়ে থাকে যে ভক্তির শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য—এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে মাধুর্যই শ্রেষ্ঠ তা ভাববিকাশের দৃষ্টিতে এক

দিক থেকে ঠিক। তবে, সকল ভক্তের মধ্যে এই সব কটি ভাবের ক্রমশ উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব হবে অথবা ভক্তের কোনো একটি ভাবকে অন্য ভাবগুলি অপেক্ষা ছোট বা বড় মনে করা হবে—তার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভাবই উত্তম আর যে ভাবটি যে ভক্তের প্রিয় সেইটিই তাঁর কাছে সর্বোত্তম। যেমন, শ্রীহনুমানের নিকট দাস্য ভাবই সর্বোত্তম। তিনি কি কখনও অন্য ভাবের জন্য দাস্য ভাব পরিত্যাগ করতে পারেন? বাসুদেব-দেবকী অথবা নন্দ-যশোদার কাছে বাৎসল্য ভাবই সর্ব প্রধান। অন্য ভাবগুলির সম্পর্কেও এই কথা মনে করা উচিত। আর কোনো অবস্থাতেই তো এমন কথা মনে করা ঠিক নয় যে 'মধুর' ভাবের অর্থ হলো লৌকিক স্ত্রী-পুরুষদের মতো কামজনিত অঙ্গ-সংসর্গ অথবা কোনো কুৎসিত ক্রিয়া। তা তো পরম পবিত্র ভাব, সেখানে ভক্ত নিজেকে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করে তাঁর মধুর চিন্তনে, মধুর ভাষণে এবং মধুর মিলনে নিমজ্জিত থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা। তিনি সকল রকম দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, তিনি সকল কল্যাণময় গুণে মণ্ডিত। তাঁর নাম-গুণ-লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কথন, মনন এবং চিন্তন করলেই মানুষ পরম পবিত্র হয়ে দুর্লভ পরমপদকে লাভ করে। তাহলে তাঁর মধ্যে কোনো রকম দোষের কল্পনা কি করে করা যেতে পারে? অতএব ভগবানের লীলাগুলিতে যেখানেই এই রকম প্রসঙ্গ বা বাক্য এসেছে, সেখানে পরম শুদ্ধ ভাব নিয়েই তার অর্থ করা উচিত, কুৎসিত ভাব নিয়ে কখনই করা উচিত নয়। পূর্বাপর প্রসঙ্গ যদি বুঝতে পারা না যায় তো তাকে নিজের অল্প বুদ্ধির অগভীর অর্থ দিয়ে আলোচনা থেকে সরে যাওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গ পরিত্যাজ্য বলেও মনে করা উচিত নয় এবং তাকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক রূপকও মনে করা উচিত নয়। আবার ভুলক্রমে এমন অব্যাহতি দেওয়াও উচিত নয় যে ভগবান যদি এমন করেই থাকেন তাতে দোষ কী? তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরম পবিত্র মনে করা উচিত, কিন্তু নিজেদের বুদ্ধি কাজ করে না, তাঁর স্বরূপকে চিনতে পারা যায় না, তাই তাঁর আলোচনা করা উচিত নয়।

গোপীদের প্রেমকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে প্রশংসা করেছেন। উদ্ধব প্রমুখ মনীষীরা মুক্তকণ্ঠে তাদের সাধুবাদ দিয়েছেন। যদি গোপীনীরা বাস্তবে

ব্যাভিচারিনী হতো তাহলে ভগবান তাদের কি করে প্রশংসা করতেন আর উদ্ধবেরাও কেন তাঁদের পদধূলি চাইত? গোপীনীদের ভক্তি সম্পূর্ণরূপে অব্যাভিচারিনী এবং অহেতুকী ছিল। তাদের ভাব ছিল পবিত্র আর সেই অনুযায়ী তাদের রাসলীলাও পবিত্র ছিল। তাদের চলাফেরা, বলা, তাদের মিলন, তাদের নৃত্য এবং তাদের সঙ্গীত সব কিছু পবিত্র ছিল, আনন্দ এবং প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। তাতে কোনো রকম কুৎসিত ভাবের কল্পনার অবকাশও নেই। ভক্তির সাধনায় কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দোষের মূল উৎপাটিত হয়। তাহলে গোপীদের মতো ভক্তিমতী নারীদের মধ্যে কামাদি দোষ কি করে থাকতে পারে? তাদের 'রাস' ছিল ভগবানের প্রতি প্রেমের মূর্তিমান স্বরূপ। আজকাল লোকেরা অর্থের লোভে যেমন প্রতিরূপ তৈরী করে থাকে তাদের সেরকম কিছু ছিল না।

শ্রীমৎ ভাগবতে কয়েকটি জায়গায় মদিরা, মাংস, হিংসা, ব্যাভিচার, চুরি, অসৎভাষণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ, অহঙ্কার, অসত্য, কপটতা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সেগুলিকে সিদ্ধান্ত বলে অথবা অনুকরণীয় বলে মনে করা উচিত নয়। সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে হেয় জ্ঞান করে পরিত্যাগ করা উচিত। আসলে শ্রীমৎ ভাগবতে বিভিন্ন স্থানে এই সব দোষ, দুর্গুণ এবং দুরাচারকে পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশই পালন করা উচিত। শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যেও কোথাও কোনো কোনো দোষের কথা এসেছে। যেমন ব্রহ্মার কাম, মোহ প্রভৃতি। সেখানে এই কথাই বোঝা উচিত যে কাম, মোহের প্রাবল্য দেখিয়ে খুব সাবধানতার সঙ্গে সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবার অভিপ্রায়ের কথা লেখা হয়েছে। সেগুলিকে বিধি মনে করা উচিত নয়, এবং একথাও মনে করা উচিত নয় যে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা, মহাত্মাদের মধ্যে ঐসব দোষ ছিল। ঐগুলিকে ব্যতিক্রম বা ছাড় হিসেবে মনে করাও উচিত নয়।

শ্রীমৎ ভাগবতে অনেক জায়গায় কাম, ব্যাভিচারের নিন্দা আছে, ক্রোধ এবং অসত্যের বিরোধিতা করা হয়েছে, চুরি-জবরদস্তি, হত্যা, শিকার, মাংস ভোজন প্রভৃতির নিষেধ আছে। অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেখুন—

যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়মগম্যাং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া সূর্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ং চ পুরুষরূপয়া সূর্ম্যা।

(৫/২৬/২০)

'এই লোকে যদি কোনো পুরুষ পরস্ত্রীর সঙ্গে অথবা কোনো স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে ব্যাভিচার করে তাহলে যমদূত তাদের 'তপ্তভূমি' নামক নরকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে মারেন এবং পুরুষকে লোহার তপ্ত স্ত্রীমূর্তিকে আর নারীকে লোহার তপ্ত পুরুষ মূর্তিকে আলিঙ্গন করান।'

বলি রাজা বলেছেন—

'ন হ্যসত্যাৎপরোঽধর্মঃ' (৮/২০/৫)

'অসত্যের চেয়ে বড় অধর্ম আর নেই।'

যস্ত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্ বা হিরণ্যরত্নাদীনি ব্রাহ্মণস্য বাপহরত্যন্যস্য বানাপদি পুরুষস্তমমুত্র রাজন্ যমপুরুষা অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈস্ত্বচি নিষ্কুষন্তি। (৫/২৬/১৯)

'এখানে যে লোক চুরি অথবা জবরদস্তির দ্বারা ব্রাহ্মণের অথবা ঘোর বিপদের সময় ছাড়াই অন্য কোনো মানুষের সুবর্ণ-রত্নাদি, সামগ্রী হরণ করে তার মৃত্যুর পর যমদূত তাকে 'সন্দংশ' নামক নরকে নিয়ে তপ্ত লৌহ গোলকের দ্বারা জ্বালান এবং সাঁড়াশি দিয়ে তার চামড়া ছিঁড়ে ফেলেন।'

ভগবান স্বয়ং রাজা মুচুকুন্দকে বলেছিলেন—

ক্ষাত্রধর্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।
সমাহিতস্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ।। (১০/৫১/৬৩)

'তুমি ক্ষত্রিয়বর্ণ অনুসারে শিকার প্রভৃতির দ্বারা অনেক পশু হত্যা করেছ। এখন একাগ্র চিত্তে আমার উপাসনা করে তপস্যার দ্বারা সেই পাপ ধুয়ে ফেল।'

কপিলদেব বলেছেন—

অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্যা হিংসযেতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্ যাত্যধঃ স্বয়ম্।।

(৩/৩০/১০)

'মানুষ যেমন-তেমনভাবে ভয়ঙ্কর হিংসা প্রভৃতির দ্বারা ধন আহরণ করে স্ত্রী-পুত্রের পালন-পোষণে নিরত থাকে এবং অবশেষ পাপময় জীবনযাপন করে ভোগ করবার জন্য নরকে যায়।'

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিঁল্লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্ নিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি। (৫/২৫/২৬)

'যারা লোক দেখানো, বেদবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা যজ্ঞ করে তাতে পশুবলি দেয় তারা অবশ্যই দাম্ভিক। সেই পতিতদের পরলোকে 'বৈশস' নরকে নিয়ে গিয়ে সেখানকার অধিকারীরা তাদের নানারকম কষ্ট দিয়ে ছিন্ন করে।'

দেবর্ষি নারদ মৃত পশুদের আকাশে দেখিয়ে রাজা প্রাচীনবর্হিকে বলেছিলেন—

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতাঞ্জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ।।
এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ।।

(৪/২৫/৭-৮)

'প্রজাপালক রাজন! দেখো দেখো, তুমি নিষ্ঠুরভাবে যে হাজার হাজার পশুদের বলি দিয়েছ তাদের আকাশে লক্ষ্য কর, এরা সকলে তোমার দেওয়া যন্ত্রণাকে স্মরণ করে তোমার প্রতি তার বদলা নেবার জন্য তোমার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। যখন তুমি মারা গিয়ে পরলোকে যাবে তখন এরা ভীষণ ক্রোধে তোমাকে তাদের লোহার মতো শিং দিয়ে বিদ্ধ করবে।'

ভাগবতে দোষগুলিকে ত্যাজ্য এবং খুবই অশুভ ফলদায়ক বলা হয়েছে। লেখা যাতে বড় হয়ে না যায় সেজন্য এখানে অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, ইতিহাসে, কথিকায় বর্ণিত সব কথা আচরণযোগ্য হয় না। শাস্ত্রের বিধিবাক্যগুলিই আচরণীয়, নিষেধ বাক্যগুলি তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। শাস্ত্রগুলিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ব্যাভিচারিতা প্রভৃতির জন্য কোথাও কোনো বিধি নেই, বরং নিষেধই আছে। যদি কোথাও অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকেও তবু তাকে কোনোভাবেই বিন্দুমাত্র কোনো রকম উপাদেয় অথবা অবলম্বন করার যোগ্য বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়।

আসল কথা হলো যেখানে ভগবানের প্রতি ভক্তি থাকে সেখানে তো কাম, ক্রোধাদি দোষ থাকতেই পারে না। শ্রীশুকদেব বলেছেন—

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীডতোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈ।।

(৬/১২/২২)

'যিনি মোক্ষের প্রভু ভগবান হরিকে ভক্তি করেন তিনি অমৃতের সাগরে বিহার করেন। ক্ষুদ্র গোস্পদের সাধারণ জলের মতো কোনো রকম ভোগের প্রতি অথবা স্বর্গাদিতেও তাঁর মন কখনও চলাচল করে না।' যখন কোনো ভোগাসক্তি এবং কামনাই থাকে না তখন নিষিদ্ধ কর্ম, দুর্গুণ, দুরাচার কি করে হতে পারে। তুলসীদাস বলেছেন—

বসই ভগতি মনি জেহি উর মাহীঁ।
খল কামাদি নিকট নহিঁ জাহীঁ।।

অতএব এটি নিশ্চিত করে নেওয়া চাই যে যাঁরা প্রকৃত ভক্ত, সাধু কিংবা মহাপুরুষ—তাঁদের হৃদয়, তাঁদের প্রত্যেক ক্রিয়া এবং চেষ্টা, তাঁদের উপদেশ বা ভাব, তাঁদের দর্শন এবং ভাষণ—সবই পবিত্র, পবিত্রকারী। তাঁদের সকল আচরণ আদর্শ এবং সকলের জন্য হিতকারী। এটি ভাবা দরকার যে ভক্ত, সন্ত এবং মহাপুরুষদের কাছ থেকে যদি জগৎ সদাচার এবং সৎগুণেই সমুচিত শিক্ষা না পায় তাহলে সংসারে আদর্শ কারা হবে? সুতরাং শ্রীমৎ ভাগবতে উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক কাম, রমণ, রতি শব্দগুলির এবং ঐ রকম প্রকরণগুলির কেউ যদি লৌকিক নোংরা কাম, রমণ প্রভৃতি অর্থ করে তাহলে সেগুলিকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া উচিত নয়। সময় খুবই খারাপ, আজকাল ভক্ত অথবা সাধুর বেশ ধারণ করে না জানি কত কপট লোক নিজেদের খারাপ বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করবার জন্য লোকেদের ঠকিয়ে থাকে। এই রকম লোকেরা প্রায়ই সৎ গ্রন্থগুলির এই রকম প্রকরণ ও শব্দের আশ্রয় নিয়ে, সেগুলি মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে সকলকে নিজেদের কব্জায় করে নেয়। সংসারের সাধা-সিধা নারী-পুরুষ, যারা মহাপুরুষদের লক্ষণ এবং আচরণগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত নয়, তারা শাস্ত্রের এইসব প্রকরণ অথবা শব্দের প্রকৃত অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত নয়। তারা, কামিনী-কাঞ্চন, ইন্দ্রিয়ের নানা রকম ভোগ এবং মান-সম্মান তথা পূজা-প্রতিষ্ঠা যারা চায় সেইসব বাচাল দাম্ভিকদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অতএব সকল ভাই-

বোনের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন সাবধান হন এবং যাদের আচরণে এই ধরনের বিশ্রী জিনিসগুলি দেখতে পাওয়া যায় অথবা যারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দুর্গুণ, দুরাচার, ব্যাভিচার, চুরি, কপটতা এবং অসত্য প্রভৃতিকে সমর্থন করে তাদের যেন মহাত্মা বলে গণ্য না করেন। প্রকৃত যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁদের মধ্যে দুর্গুণ-দুরাচার থাকেই না। তাঁরা পরস্ত্রী, পরদ্রব্যের কথা তো দূর, শাস্ত্রানুকূল মান- সম্মান লাভ করলেও সঙ্কুচিত হন।

এর পরেও যদি কেউ বলে যে ইতিহাসে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কাম-ক্রোধের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় তো তার উত্তর হলো যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে কাম-ক্রোধ প্রভৃতি থাকে না। তাঁরা যদি লোককল্যাণের দৃষ্টিতে অভিনয় করেন তো সেকথা আলাদা আর বাস্তবে যদি তাঁদের মধ্যে কাম-ক্রোধ থেকে থাকে তাহলে শাস্ত্রানুসারে তাঁদের ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ, মহাত্মা অথবা যথার্থ জ্ঞানবান্ বলে মনে করা উচিত নয়।

হ্যাঁ, পাপী এবং দুরাচারীরাও অবশ্যই ভগবানকে ভক্তি করতে পারে এবং ভক্তিতে মশগুল হয়ে গেলে তারাও পরম পবিত্র হয়ে যেতে পারে।

ভগবান নিজেই বলেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

(গীতা ৯/৩০-৩১)

'যদি কোনো অতিশয় দুরাচারীও অনন্যভাবে আমার ভক্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে তাহলে সেও সাধু রূপে মান্য। কেননা সে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সে ভালভাবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরমেশ্বরের ভজনার মতো আর কিছুই নেই। সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং চিরকালীন পরম শান্তি লাভ করে। হে অর্জুন! তুমি এটি অবশ্যই মেনে নাও যে আমার ভক্ত কখনও পতিত হয় না।'

সকলেই ভগবানকে ভক্তি করবার অধিকারী। সে যে কোনো জাতেরই হোক না কেন, অদ্যাবধি সে যত নীচ আচরণই করে থাকুক না

কেন—ভগবানের শরণাগত হয়ে সে যদি তাঁকে ভক্তি করে তাহলে সে শীঘ্রই পবিত্র হয়ে যায় এবং অন্তিমে পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করে।

এইসব কথায় মন দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের নিজের নিজের জীবনকে ভজনাশ্রিত করবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, যাতে ভগবানের প্রতি অনন্য ভালবাসা জাগে। সেজন্য আপনারা ভগবানের নাম জপ করা, তাঁর গুণ-প্রভাব-রহস্য তত্ত্বের জ্ঞানসহ তাঁর স্বরূপকে অনুধ্যান করা এবং তাঁর লীলা শ্রবণ-কথন-মনন করুন। এইটিই মানুষের পরম কর্তব্য। যে এরকম করে সে ভগবানের প্রতি ভক্তির প্রভাবে সফলকাম হয়ে যায়। আর সে যদি নিজে থেকে কিছু না চায় তাহলে ভগবান নিজে থেকেই তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেন।

জীবন সংক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকারের বিঘ্নে ভরপুর। যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তা তো চলেই গিয়েছে। এখন জীবনের যে অবশিষ্টটুকু রয়েছে তার প্রত্যেকটি মুহূর্তকে ভগবানের সেবায়, তাঁর ভজনায় লাগিয়ে দেওয়া উচিত। এতেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। ভাগবৎপ্রাপ্তি রূপ পরম কল্যাণের প্রাপ্তি মানুষ্য জীবনেই সম্ভব। সেটি লাভ করতেই হবে। অন্যান্য ভোগ তো অন্য জীবনেও হতে পারে। কিন্তু একমাত্র মনুষ্য জন্মেই ভগবানকে লাভ করা যায়।

শ্রীভগবান বলেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।

(শ্রীমৎ ভাগবর্ত ১১/২০/১৭)

'এই মনুষ্য শরীর সকল শুভ ফল প্রাপ্তির আদি কারণ। এটি পুণ্যবানদের কাছে সুলভ আর পাপাত্মাদের কাছে অত্যন্ত দুর্লভ। এটি ভবসাগর পার করার জন্যই সুদৃঢ় নৌকার মতো। গুরুই হলেন এর কর্ণধার। অনুরূপ বায়ুরূপ আমার সহাযতা পেয়ে তিনি এটি পার হয়ে যান। (এইসব সুযোগ পেয়েও) যে মানুষ সংসার সমুদ্র পার করে না সে অবশ্যই আত্মঘাতী।'

এই কথাই ভগবান শ্রীরঘুনাথ তাঁর প্রজাদের বলেছিলেন—

বড়েঁ ভাগ মানুষ তনু পাবা। সুর দুর্লভ সব গ্রন্থন্হি গাবা।
সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা। পাই ন জেহিঁ পরলোক সঁবারা।।
সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোষ লগাই।।
নর তনু ভব বারিধি কহুঁ বেরো। সন্মুখ মরুত অনুগ্রহ মেরো।
করনধার সদগুর দৃঢ় নাবা। দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাবা।।
জো ন তরৈ ভব সাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি আত্মাহন গতি জাই।।

কলিযুগে ভগবৎ লাভের সাধন খুবই সহজ—ভগবানের নাম সংকীর্তনেই সব কাজ হয়ে যেতে পারে। সৎসঙ্গ পেয়ে গেলে তো আর বলারই কিছু থাকে না। শ্রীমৎ ভাগবতে বলা হয়েছে—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।

(১/১৮/১৩)

'ভগবৎ সঙ্গী অর্থাৎ নিয়ত ভগবানের সঙ্গে থাকেন যেসব অনন্য প্রেমী ভক্ত তাঁদের মুহূর্তের জন্য সঙ্গও স্বর্গলাভ এবং মোক্ষ প্রাপ্তির তুলনায় কিছুই নয়। তাহলে মানুষের ঈপ্সিত বস্তুর তো কোনো কথাই নেই।'

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।
কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

(১২/৩/৫১-৫২)

'হে রাজন্! দোষের ভাণ্ডার কলিযুগে একটি মহান গুণই যা আছে তা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনের ফলে মানুষ আসক্তিমুক্ত হয়ে গিয়ে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। সত্যযুগে ধ্যানযোগের দ্বারা, ত্রেতাতে বড় বড় যজ্ঞের দ্বারা এবং দ্বাপরে বিধিপূর্বক পূজা-অর্চনার দ্বারা ভগবানের আরাধনা করলে যে ফল

পাওয়া যায় সেই ফলই কলিযুগে কেবল হরির নাম সংকীর্তনের দ্বারাই পাওয়া যায়।

অতএব ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীভগবানের নাম-গুণের জপকীর্তন, মহাপুরুষদের সঙ্গ এবং শ্রীমৎ ভাগবত, গীতা ও রামায়ণের মতো গ্রন্থ পাঠের দ্বারা মানুষের জীবনকে সার্থক করবার প্রয়াস প্রাণপণে করা উচিত।

(১৭) ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন?

বর্তমান যুগ তর্কপ্রধান। যে বিষয় তর্কাতীত নয় তাকে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বিংশ শতাব্দীর প্রায় কোনো মানুষই প্রস্তুত নয়। কোনো বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করবার পূর্বে তার মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়—কেন এবং কিজন্য? ধর্ম এবং ঈশ্বরের কথাও যখন তাকে বলা হয় তখন সে এই প্রশ্নই করে—'ধর্ম এবং ঈশ্বরকে আমি কেন মানব? তাদের বিশ্বাস করলে আমাদের কী লাভ?' কথাটি পুরাপুরি সত্য। তাদের স্বীকার করে যদি আমাদের কোনো লাভ না হয় এবং তাদের স্বীকার না করলে আমাদের যদি কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে কেন আমরা তাদের মানতে যাব? বর্তমান নিবন্ধে এই কথাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে ঈশ্বর এবং ধর্মকে মেনে নিলে কেবল যে লাভই হয় তা নয়, না মানলে হয় অত্যন্ত ক্ষতি।

আজকের তার্কিক মানুষের প্রথম প্রশ্ন—'ঈশ্বরকে আমরা কেন স্বীকার করব?' এর উত্তর সংক্ষেপে এই—বেদ-পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্র, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ এবং প্রায় সকল মতের প্রবর্তক, সম্প্রদায়াচার্য তথা মহাপুরুষ এক স্বরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। এদের সকলের সম্মিলিত অনুভূতির কাছে নাস্তিকের নিষেধের কী মূল্য আছে? এখানে বাদী বলতে পারেন 'বেদাদি শাস্ত্রে এবং অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থে যেমন ঈশ্বরের সমর্থনকারী কথা পাওয়া যায় তেমনই নাস্তিকের ঈশ্বর-নিরোধক কথাও পাওয়া যায়। আস্তিক যেমন তাঁর অনুভূতিকে ঠিক মনে করেন নাস্তিকও তেমনই তাঁর অনুভূতিকে সত্য বলে মনে করেন। এই অবস্থায় কার অনুভূতিকে প্রমাণ বলে মান্য করা যায়?' এর উত্তর হলো, নাস্তিকের অনুভূতির চেয়ে আস্তিকের অনুভূতি বেশি শক্তিশালী। আসলে যে কোনো বস্তুরই বিষয়ে 'সেটি নেই' এমন কথা বলার মানে হয় না। যিনি কোনো বস্তুকে সাক্ষাৎ করেছেন, কোনো বস্তুকে জেনে নিয়েছেন তিনি তো জোর করে বলতে পারেন যে ঐ বস্তুটি আছে, আমি দেখেছি, জেনেছি, অনুভব করেছি। কিন্তু যিনি সেই বস্তুটিকে জানেন না বা দেখেননি, অনুভব করেননি তিনি কেমন করে

বলতে পারেন যে বস্তুটি নেই? তার এরকম কথা বলা অজ্ঞতাপ্রসূত এবং দুঃসাহসই শুধু নয়, অধিকন্তু তা অসত্য। কেননা কোনো বস্তুর অনস্তিত্ব বিশেষ দেশ এবং বিশেষ কালের দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে। সর্বত্র এবং সর্বকালে আমাদের গতি হয় না। তাহলে আমরা সৈদ্ধান্তিক রূপে কি করে বলতে পারি যে ঈশ্বর কোথাও এবং কোনো কালেই নেই। যার গতি সর্বত্র, যার সর্বকালে অবস্থান এবং যে সবকিছু জ্ঞাত একমাত্র সেই সাহস করে বলতে পারে যে অমুক বস্তু একেবারেই নেই। আর এমন কেউ যদি থাকেন তাহলে তিনিই হলেন আমাদের ঈশ্বর। শুধু ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন, সকল অপার্থিব এবং অপ্রাকৃত বস্তুর সম্পর্কেই বলা হয় যে অমুক বস্তুকে দেখা যায় না, অতএব তা নেই; কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, চিন্তামণি, দেবাদি যোনি, স্বর্গাদি লোক—এই বস্তুগুলিকে দেখা যায় না, অতএব এদের মধ্যে একটিও নেই—এমন কথা বলা দুঃসাহস। হ্যাঁ, যদি কেউ বলে যে আমি ঈশ্বরকে দেখিনি, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার জানা নেই তাহলে সেকথা সম্পূর্ণ সত্য। ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের অসামর্থ্য প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু একথা কিছুতেই বলতে পারি না যে তিনি নেই।

কিছুক্ষণের জন্যও যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংশয়জনক, তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে একথাও বলা যায় না যে 'তিনি আছেন' আর একথাও বলা যায় না যে 'তিনি নেই'। কিন্তু এরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রেও না মানার চেয়ে মেনে নেওয়া অধিক লাভদায়ক। যদি বাস্তবে ঈশ্বর না থাকেন তাহলেও যে তাকে মানে তার কোনো ক্ষতি হয় না। ঈশ্বরকে যে মানে সে কমপক্ষে তো পাপ এবং অনাচার থেকে বাঁচবে; জীব মাত্রই ঈশ্বরের স্বরূপ অংশ অথবা সন্তান মনে করে সকলের সঙ্গে প্রেম এবং সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করলে অন্ততপক্ষে জগতে তার খ্যাতি হবে এবং পরিবর্তে সে অন্য লোকেদের কাছ থেকে সদ্ভাব এবং সহানুভূতি লাভ করবে। ফলে তার জীবন অপেক্ষাকৃত বেশি সুখ-শান্তিতে যাপিত হবে এবং তার দ্বারা জগতেও সুখ শান্তি বিস্তার করবে। ঈশ্বর না থাকলেও তাঁকে মেনে নেওয়ায় এইটুকু লাভ তো তার হবেই। এর বিপরীত যদি ঈশ্বর থাকেন তাহলে তাঁকে যারা মানে তাদের সবদিক থেকে লাভ হবে—তাঁর বিধানকে মেনে, তাঁর আদেশানুসারে চললে তাঁর প্রীতিভাজন হবে আর ফলত এই

পৃথিবীতে সুখ-শান্তিতে থাকবে এবং মৃত্যুর পর পরম শান্তি লাভ করবে। কিন্তু ঈশ্বর থাকা সত্ত্বেও যে তাঁকে না মানে, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে, তাঁর সৃষ্ট জীবদের কষ্ট দেয়, জীবনকালে তারা অনেক কষ্ট ভোগ করে আর মৃত্যুর পর তাদের কি রকম দুর্গতি হয় তার অনুমান সহজেই করা যায়। শুধু তাই নয় ; ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে সাধকদের প্রত্যক্ষ লাভ হয়েছে দেখা যায়। ঈশ্বরকে যারা মানে তাদের অন্তরে ধৈর্য, বীর্য, গাম্ভীর্য, সহৃদয়তা, দয়ালুতা, ক্ষমা, নির্ভয়তা, শান্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম প্রভৃতি সদগুণ আপনা-আপনি এসে যায় এবং দুর্গুণ-দুরাচার বিনষ্ট হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে ভগবান তাঁর বিশ্বাসীদের প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে অনেক রকম সঙ্কট থেকে বাঁচিয়েছেন এবং তাদের অনেকভাবে সুখী করেছেন। অ-ভাব থেকে ভাব উৎপন্ন হতে পারে না। যদি ভগবান না থাকতেন তাহলে তাঁর বিশ্বাসীদের এইরকম লৌকিক এবং পারমার্থিক লাভ কি করে সম্ভব।

যেমন সূর্যোদয় হওয়ার পর অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়, তার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না তেমনই ভগবানের জ্ঞান, ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়ে যাওয়ার পর অবিদ্যা, অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়, তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অন্ধকার অথবা অজ্ঞানতা কোনোটাই বাস্তবিক নয়, কেননা এদের সত্তা কল্পিত বস্তু। অতএব জ্ঞানরূপ আলোকের আবির্ভাব হলেই অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। যখন অজ্ঞানতা থাকে না তখন তার কার্যরূপ কাম-ক্রোধাদি বিকার, দুর্গুণ এবং দুরাচার কি করে থাকতে পারে? আর যখন দুর্গুণ-দুরাচার না থাকলে তার ফলস্বরূপ দুঃখ-শোকাদিও অবিদ্যমান হয়ে যাবে। এইভাবে পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান অথবা ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়ে গেলে মায়া এবং তার সমগ্র পরিবার—দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, দীনতা, পরাধীনতা, মমতা-মোহ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়। সূর্যোদয় হওয়ার পর অন্ধকারকে দূর করতে স্বতন্ত্র প্রয়াস করতে হয় না। সূর্যোদয় আগত হওয়া মাত্র অন্ধকার নিজে থেকে চলে যেতে থাকে আর সূর্যোদয় হলে কোথাও তার পদচিহ্ন থাকে না।

মায়া হলো জড়, পরমাত্মা বিশুদ্ধ চেতনতত্ত্ব। অন্ধকার এবং আলোকের মতো এই দুটিও পরস্পর ভিন্ন। মায়ার অপর নাম প্রকৃতি। এই মায়ার দুটি

রূপ—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণ এই দুটির নামান্তর। গীতা অনুসারে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ প্রকৃতির কাজ—**'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ'** (১৪/৫)। বেদে বলা হয়েছে যে জীবের কর্মের প্রেরণা থেকে ইচ্ছারহিত পরমাত্মায় এক থেকে বহু হওয়ার ইচ্ছা হয়—**সোঽকাময়তা। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।'** (তৈত্তেরীয়. ২/৬)। ভগবানের এই ইচ্ছার ফলে প্রকৃতিতে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়—এইটি রজোগুণের স্বরূপ। যেমনভাবে দইকে মন্থন করলে তা থেকে মাখন বেরিয়ে আসে তেমনই প্রকৃতিতে ক্ষোভ উৎপন্ন হলে তা থেকে সত্ত্বগুণরূপ মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষের নামই হলো জ্ঞান অথবা বিদ্যা আর এর বিরুদ্ধ হলো অজ্ঞানতা অথবা অবিদ্যা—একে 'তমোগুণও' বলা হয়। মহত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের এবং অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্রাগুলি অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতগুলির সৃষ্টি হয়। এই ভূতগুলির মধ্যে যেটি অগ্নির দ্বারা অভিব্যক্ত স্বরূপ তারই নাম আলোক আর অন্ধকার হলো তার বিরোধী। আলোক সত্ত্বের কাজ আর অন্ধকার তমোগুণের। যা মায়ার অতীত বিশুদ্ধ চেতনতত্ত্ব তারই নাম নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্ম। যা বুদ্ধি বিশিষ্ট সমষ্টি চেতন পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপ—তা-ই সগুণ-নিরাকার ব্রহ্ম। আর তাঁর যা প্রকাশমান দিব্য বিগ্রহ তা-ই সগুণ-সাকার ভগবান। এঁদেরই শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদুর্গা প্রভৃতি বিবিধ রূপ।

এই রূপগুলির মধ্যে ভগবান নিজেকে মায়ার আবরণের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। এইজন্য এইসব রূপকে মায়াবিশিষ্ট বলা হয়। ভগবান স্বয়ং গীতায় বলেছেন—

'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।'

(৭/২৫)

অর্থাৎ 'আমি যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে লুকিয়ে রাখার কারণে সকলের সামনে প্রকট হই না।' কিন্তু যারা ভগবানের জ্ঞানী ভক্ত তাঁদের কাছে ভগবান নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না। তাঁদের কাছে তিনি নিরাবরণ হয়ে নিজের আসল রূপে প্রকট হয়ে যান। কিন্তু এর অর্থ এটি হওয়া উচিত নয় যে ভগবানের রাম-কৃষ্ণাদি বিগ্রহ মায়িক, আসল নয়। ভগবানের সকল স্বরূপ তাঁর নিজস্ব স্বরূপ, চিন্ময়। কিন্তু জনসাধারণের সামনে তিনি নিজেকে

যোগমায়ার আবরণে ঢেকে রাখেন। তার ফলে লোকেরা তাঁকে জন্ম-মৃত্যুশীল সাধারণ মানুষ বলে মনে করে—

'মূঢোঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।'

(গীতা ৭/২৫)

তত্ত্বগতভাবে ভগবানের সাকার-নিরাকার সমস্ত রূপ চিন্ময় মায়াতীত হয়ে থাকে। তাঁর ভিতরে যে অনন্ত কল্যাণগুণ আছে তাও চিন্ময়, দিব্য, তাঁর স্বরূপের অন্তর্গত এবং তা মায়াময় গুণগুলি থেকে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মায়াময় গুণ সবই এই গুণগুলির প্রতিবিম্ব। জগতে যত গুণ দেখা যায়, দেবতা এবং মানুষের মধ্যে যত গুণ দৃষ্টিগোচর হয় সেই সবগুলি একসঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ অনন্ত দিব্য গুণান্বিতের বিন্দুমাত্র আভাসের সমান নয়। ভগবান গীতায় বলেছেন—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।

(গীতা ১০/৪১)

'যত কিছু বিভূতিযুক্ত অর্থাৎ ঐশ্বর্যময়, কান্তিময় এবং শক্তিধর বস্তু আছে সেই সবকেই তুমি আমার তেজের এক অংশের অভিব্যক্তি বলে জানবে।'

জগতে দৃষ্ট গুণ বাড়ে-কমে, বিনাশশীল এবং ধরাছোঁয়ার মধ্যে। এর বিপরীত ভগবানে অন্তর্গত গুণগুলি সর্বদা একরকম থাকে। সেগুলি ভগবানের মতোই একরস, অবিনাশী এবং স্বতন্ত্র।

এই রকম অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম উদার, দয়ার সাগর, জীবের পরম হিতৈষী প্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি একান্ত ভক্তি তথা তাঁর অনুকূল আচরণের দ্বারা তাঁকে শীঘ্রাতিশীঘ্র পাওয়া এবং তাঁকে তত্ত্বগতভাবে জানাই জীবের পরম পুরুষার্থ, প্রকৃত লাভ। এরই জন্য আমরা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি, সেই করুণাবরুণালয়, সকলের সুহৃদ, সকলের মাতা-ধাতা-পিতামহ ভগবানের সন্ধানে এই জীব অনন্ত কাল ধরে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে আর এই হাতড়ে বেড়ান যতক্ষণ না তাঁকে পাচ্ছে ততক্ষণ বন্ধ হবে না। কিন্তু এই কাজ অপরে করলে হবে না, এই কাজ জীবকে নিজেকে করতে হবে। ভগবান স্বয়ং বেদ্য এবং স্বয়ং প্রাপ্তিযোগ্য। অতএব তাঁকে পাওয়ার জন্য মানুষকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। যতক্ষণ না এই কাজ সিদ্ধ হয় ততক্ষণ তার

নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। বিষয়-সম্পত্তি পাওয়ার জন্য তো সকলে লালায়িত এবং বিষয়-সম্পত্তি ভাগ্যানুসারে সকল যোনীতেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবানকে পাওয়া কেবল মনুষ্য জীবনেই সম্ভব। অতএব সর্বদিক থেকে চিত্তবৃত্তিকে দূর করে কেবল ভগবানকে পাওয়ার জন্য প্রযত্ন করা মানুষ মাত্রেরই প্রথম কর্তব্য। অন্য সমস্ত কর্তব্য এর কাছে গৌণ। বিষয়-ভোগে সুখ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা শিশুর সূর্য বা চাঁদের প্রতিবিম্বকে ধরবার প্রযত্নের মতো। প্রতিবিম্বকে ধরবার চেষ্টারত শিশু বিম্ব (আসল)-কে ধরতে পারেই না, প্রতিবিম্বও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তার কারণ প্রতিবিম্বের কোনো বাস্তবিক সত্তা নেই। কেবল ছটপটানিই থেকে যায়। এইভাবে সর্বসুখের আকর পরমানন্দ রূপ ভগবানকে ছেড়ে দিয়ে মায়িক বিষয়-সুখের পিছনে দৌড়ানরত মানুষ বাস্তবিক সুখ তো লাভ করেই না, বিষয়-সুখও তার আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়। ধরতে পারলেও সেগুলি তার কাছে টেঁকে না, কেননা তাদের স্বরূপ ক্ষণিক এবং বিনাশী। বাস্তবে তাদের তো কোনো সত্তাই নেই। আমরাই কেবল তাদের সত্তা বলে মেনে নিয়েছি। সেজন্য তা প্রতীত হয়।

অতএব যুক্তি এবং শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা যখন নিশ্চিত হয়েছে যে ভগবান আছেন এবং তাঁকে পাওয়াই জীব-জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ, তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন যা উত্থিত হয় তা হলো তাঁকে পাওয়া যাবে কি করে? এর সরল উত্তর হলো—নিষ্কামভাবে তাঁর আদেশ পালন করা অথবা অনন্য শরণাগত হয়ে তাঁর উপাসনা করা, তাঁকে ভক্তি করা হলো সর্বোত্তম উপায়।

ঈশ্বর যখন আছেন তখন তাঁর বিধানও আছে। সেই বিধানের নাম ধর্ম। ধর্ম দু'প্রকারের—সাধারণ এবং বিশেষ। মানুষ মাত্রেরই পালনীয় ধর্ম অর্থাৎ উত্তম আচরণের নাম সাধারণ ধর্ম অথবা মানবধর্ম। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদের নামে, সপ্তদশে কায়িক-বাচিক-মানসিক—এই ত্রিবিধ তপস্যার নামে, এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের নামে এই সাধারণ ধর্মের নিরূপণ করা হয়েছে। (দেখুন ১৬/১ থেকে ৩, ১৭/১৪ থেকে ১৬, এবং ১৩/৭ থেকে ১১)। যোগদর্শনে যম-নিয়মের তথা মানবধর্মশাস্ত্রে দশবিধ ধর্মের নামে এই মানবধর্মের উল্লেখ আছে। উপরোক্ত ধর্মকে নিষ্কাম ভাবের দ্বারা পালন করলে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয়ে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করে। শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে

বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের আচারের নাম 'বিশেষ ধর্ম'; এটি সকলের কাছে ভিন্ন ভিন্ন। একেই গীতায় কোথাও কোথাও স্বধর্ম, স্বভাব-নিয়ত কর্ম, স্বকর্ম, সহজ কর্ম, স্বভাবজ কর্ম প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ ধর্ম করার উপর গীতা খুব জোর দিয়েছে এবং পরধর্মকে স্বীকার করা অপেক্ষা—তা যদি আমাদের কর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় এবং আমাদের ধর্ম ততটা উচ্চ নাও হয় তবু স্বধর্ম পালনরত অবস্থায় মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ বলেছে। গীতা উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।

(৩/৩৫)

'স্বধর্ম গুণরহিত হলেও তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর এবং পরধর্ম ভয়দাতা।' অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোকে পূর্বার্ধকে যেমনকার তেমন রেখে, সেই প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে—

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।

(গীতা ১৮/৪৮)

'অতএব হে কুন্তীপুত্র! দোষযুক্ত হলেও সহজ কর্মকে ত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা ধোঁয়া দেখে যেমন আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় তেমনই সকল কর্মই কোনো না কোনো দোষযুক্ত।'

তাৎপর্য হলো এই যে গীতা সমাজের শৃঙ্খলাকে সুদৃঢ় এবং সুব্যবস্থিত রাখার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মকে মানা অনিবার্য মনে করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছে যে কর্ম উচ্চ কি নীচ, তা স্বরূপনির্ভর নয়, বরং তা হলো কর্তার ভাবের উপর। আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মের এইটি বৈশিষ্ট্য যে তাতে লোক-পরলোক, স্বার্থ-পরমার্থ দুটির উপরেই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং সমাজধর্ম ও অধ্যাত্মর মধ্যে অদ্ভুতভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। আমাদের এখানে ধর্মের পরিভাষাও এইরকম করা হয়েছে—'**যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ** (বৈশেষিক দর্শন) যা পালন করলে আমাদের লৌকিক অভ্যুদয়—জাগতিক উন্নতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরলোকেও উন্নতি হয় অর্থাৎ যাতে

আমাদের স্বার্থ-পরমার্থ দুটিই সিদ্ধ হয় সেইটিই হলো ধর্ম। পরলোকে উত্থান হোক এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। মৃত্যুর পর ইহলোকে আমাদের কীর্তি থাকুক এবং আমাদের স্বর্গাদি দিব্যলোকের দিব্য সুখ লাভ হোক, একেও সংসারে-পরলোকে উন্নতি হওয়া বলা হয়। কয়েকটি ধর্ম এবং দর্শন একেই মনুষ্য জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করেছে। কিন্তু গীতা অথবা হিন্দুধর্মের পরলোক এতেই সীমিত নয়। আমাদের তো অন্তিম লক্ষ্য অসীম অনন্ত সুখ। আমাদের ঋষিরা স্বর্গাদির সুখ অনুভব করে আমাদের জানিয়েছেন যে পার্থিব সুখের মতো ঐ সুখগুলিও অল্প—অস্থায়ী। সেগুলিও একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। ভগবান গীতায় বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

(৮/১৬)

'হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল লোক থেকেই লোকেরা ফিরে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কেননা আমি কালাতীত আর এইসব ব্রহ্মাদি লোক কালের দ্বারা সীমিত হওয়ায় অনিত্য।'

উপরস্থ স্বর্গাদি লোকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা দিব্য লোক হলো ব্রহ্মলোক। সেখানকার নিবাসীদের আয়ুও সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। কিন্তু ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয়ে গেলে ব্রহ্মলোকেরও লয় হয় আর যদিও সেখানকার অনেক জীব সেইসময় মুক্ত হয়ে যায় তবু সেখানকার সকল নিবাসীর মুক্তি নিশ্চিত নয়। ব্রহ্মলোক সম্পর্কেই যখন এমন কথা তখন স্বার্গাদি নিম্নস্থ লোক সম্পর্কে তো কথাই নেই। তাদের সম্পর্কে ভগবান তো স্পষ্ট বলেছেন যে পুণ্য ক্ষীণ হয়ে যাবার পর সেখানকার নিবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের আবার মর্তলোকে আসতে হয়—'**ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি**' (গীতা ৯/২১)। চিরস্থায়ী সুখ তো একমাত্র ভগবানের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তা লাভ করে জীব চিরকালের জন্য কৃতকৃত্য হয়ে যায়, সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এরই নাম মুক্তি। আর একেই শাস্ত্র '**নিঃশ্রেয়স**' বলেছে—তার বড়ো কোনো সুখ নেই। এই নিঃশ্রেয়সকে পাওয়াই হিন্দুদের পরম লক্ষ্য।

প্রত্যেক মানুষ তার বর্ণাশ্রমোচিত কর্তব্য নিষ্কামভাবে পালন করে এই পরম গতিকে লাভ করতে পারে। যে যেখানে আছে সেখানে সেই স্থিতিতে থেকে স্বধর্ম পালন করতঃ ভগবানকে লাভ করতে পারে। ভগবানকে পাওয়ার জন্য কাউকে তার নিজের ধর্ম ত্যাগ করার অথবা অন্যের ধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। শম-দম প্রভৃতি সদ্‌গুণে সম্পন্ন বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রভৃতি রূপ স্বধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে পদ প্রাপ্ত করতে পারেন, নিম্নতম স্থানে কর্মরত শূদ্রও নিজের সেবা রূপ কর্মের দ্বারা সেই গতি লাভ করতে পারে। শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের কর্ম করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলো কর্তব্য বুদ্ধির দ্বারা অথবা ভগবানের প্রীত্যর্থে নিজের বিহিত কর্ম করে যাওয়া। নিষ্কাম অথবা ভগবৎ প্রীতির ভাবনা থাকলে স্বধর্ম পালনের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গেলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম হয়ে ভগবানকে লাভ করা সহজ হয়ে যায়। বলুন দেখি, ভগবানকে পাওয়ার কত সহজ উপায়! এইভাবে বর্ণাশ্রমের আদর্শ ব্যবস্থা বেঁধে দিয়ে আমাদের এখানকার ঋষিরা কেবল সর্বসাধারণের কল্যাণের পথই সুগম করেননি, অধিকন্তু প্রত্যেক বর্ণের কর্ম নিশ্চিত করে সমাজকেও সুব্যবস্থিত করে দিয়েছিলেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আমরা পাশ্চাত্যকে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত সীমাকে অবহেলা করছি এবং এইভাবে দুঃখ ও অশান্তিকে আবাহন করছি।

ভগবানকে লাভ করার এর চেয়েও সরল এবং সফল উপায় আছে, তা হলো ভগবানের প্রতি ভক্তি। ঈশ্বর-ভক্তি থেকে দৈব গুণ নিজে থেকেই আসতে থাকে আর ভগবান ভক্তের হৃদয়াসীন হয়ে যান। সুতরাং যেখানে ভগবান থাকেন সেখানে তাঁর গুণ অবশ্যই থাকবে। এইভাবে ভগবৎ ভক্তের দ্বারা সাধারণ ধর্ম পালন আপনা থেকেই হয়ে যায়। এর জন্য তাঁকে কোনো ভিন্ন প্রচেষ্টা করতে হয় না। সদাচার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়। ভগবৎ ভক্তি এবং সদাচারের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। ভক্তি থেকে সদগুণ-সদাচারের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সদগুণ-সদাচারের দ্বারা অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম এবং ভক্তি জন্মে। ভগবান গীতায় বলেছেন—

যেষাং তন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।

(৭/২৮)

'কিন্তু নিষ্কামভাবের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্মগুলি আচরণরত যে পুরুষদের পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই রাগদ্বেষজনিত দ্বন্দ্বরূপ মোহ থেকে মুক্ত দৃঢ়নিশ্চয়কারী ভক্ত আমাকে সর্বপ্রকারে ভজনা করে।'

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।

(৯/১৩)

'কিন্তু হে কুন্তীপুত্র! দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মারা আমাকে সকল ভূতের সনাতন কারণ এবং অবিনাশী অক্ষয়স্বরূপ জেনে অনন্য মনে যুক্ত হয়ে নিরন্তর আমার ভজনা করে।'

ভক্তি থেকে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানও নিজে থেকে এসে যায়। ভগবান তাঁর ভক্তদের অনায়াসেই জ্ঞান দিয়ে দেন। তিনি বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।

(১০/১০-১১)

'যারা নিরন্তর আমার ধ্যান প্রভৃতিতে মগ্ন থেকে এবং প্রেমপূর্বক ভজনা করে সেই ভক্তদের আমি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ দিই, যার দ্বারা তারা আমাকে লাভ করে। এবং হে অর্জুন! তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তাদের অন্তঃকরণে স্থিত থেকে আমি নিজেই তাদের অজ্ঞানতাজনিত অন্ধকারকে প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপী প্রদীপের দ্বারা বিনষ্ট করে দিই।'

শুধু তাই নয়, ভক্তের যা প্রয়োজন ভগবান স্বয়ং সেগুলির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং তাদের সর্বপ্রকার বিপত্তি ও বিঘ্ন থেকে রক্ষা করেন। ভগবান বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।

(গীতা ৯/২২)

'যে অনন্যপ্রেমী ভক্তজন আমাকে (পরমেশ্বরকে) নিরন্তর চিন্তারত থেকে নিষ্কামভাবে ভজনা করে সেই নিত্যনিরন্তর আমাকে চিন্তনরত মানুষদের যোগক্ষেম আমি নিজেই করে দিই।'

ভগবানের ভক্তির দ্বারা নিকৃষ্টতম পাপীও খুব তাড়াতাড়ি ধর্মাত্মা হয়ে গিয়ে শাশ্বত শান্তি লাভ করে। এদেরও ভগবান স্বয়ং নিজমুখে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।

(গীতা ৯/৩০-৩১)

'যদি কোনো অত্যন্ত দুরাচারীও অনন্য মনে আমার ভক্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে তাহলে সেও সাধু বলে মান্য হওয়ার যোগ্য হয়। কেননা সে যথার্থ নিশ্চয়কারী অর্থাৎ সে ভাল করে নিশ্চয় করে নিয়েছে যে পরমেশ্বরের ভজনা করার মতো আর কিছু নেই। শুধু তাই নয়, সে খুব তাড়াতাড়ি ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করে। অর্জুন! তুমি এই সত্য জেনে নাও যে আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।'

অধিকন্তু, যে ভক্ত অনন্য মনে নিরন্তর ভগবানকে চিন্তা করে তার কাছে ভগবান সহজ প্রাপ্ত হয়ে যান (দেখুন, গীতা ৮/১৪)। যে ভক্তির ফলে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, অনন্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অচিন্ত্য মহাসাগর, কর্তুং-অকর্তুং-অন্যথাকর্তুং সমর্থ, সর্বভূতমহেশ্বর, সর্বসুহৃদ, সর্বাধার, সর্বান্তর্যামী, সর্বসাক্ষী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বনিয়ন্তা ভগবান সুলভ হয়ে যান, সেই ভক্তি ভগবতীর মহিমা কতই বা বলা যেতে পারে। অতএব অনন্যভাবে প্রেমপূর্বক ভগবানের ভজনা করাই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এজন্য শ্রীমৎ ভাগবতে বলা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াঽঽত্মা সম্প্রসীদতি।।

(১/২/৬)

'প্রত্যেক মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সেইটিই যার দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি হয়—এমনই ভক্তি যার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, যার ধারা কখনও রুদ্ধ হয় না এবং যার দ্বারা চিত্ত ভালভাবে শান্ত হয়ে যায়।'

যখন ভালভাবে উপলব্ধ হয়েছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ামক এক সর্বশক্তিমান এবং সর্বসাক্ষী চেতন ঈশ্বর—তাহলে একথাও মানতে হবে যে এই বিশ্বের সঞ্চালন কতিপয় অনাদি এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মানুসারে হয়ে থাকে। সেই নিয়মগুলির সমষ্টির নাম ধর্ম অথবা সনাতন ধর্ম আর সেই নিয়মগুলির উল্লেখ তথা বিধান যে গ্রন্থে আছে তারই নাম শাস্ত্র। অতএব একথা মেনে নিতে হবে যে জগতে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি তখনই হতে পারে যখন জগতের জীব সেই ঈশ্বরীয় নিয়মগুলিকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং সেগুলির অনুসরণ করে। পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবসমূহের মধ্যে মানুষের স্থান সবার উপরে। পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যাকে ভগবান বিবেক-বুদ্ধি, নিজের হিতাহিত চিন্তা করার এবং ভাল-খারাপকে চিনে নেওয়ার শক্তি দিয়েছেন। যার মধ্যে হিতাহিত চিন্তা করবার বুদ্ধি, সৎ-কে গ্রহণ করবার এবং অসৎ-কে ত্যাগ করবার সামর্থ্য আছে, বিধানও তারই উপর প্রযোজ্য হয়। নাবালক বালক এবং তির্যক যোনি জীবেদের উপর জগতের বিধান প্রযুক্ত না হওয়ার কারণ তাদের মধ্যে নিজেদের হিতাহিত চিন্তা করার এবং তদনুসারে কাজ করার ক্ষমতা নেই। এইজন্য নিয়মানুসারে আচরণের দায়িত্ব পৃথিবীর জীবদের মধ্যে কেবল মানুষেরই আছে। অতএব মনুষ্য জাতির আচরণের উপর জগতের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। মানুষের আচরণ যদি ধর্মানুকূল হয় তাহলে জগতের সর্বত্র সুখ শান্তি থাকবে। এর বিপরীত মানুষদের যখন ধর্মের প্রতি আস্থা ক্ষীণ হয়ে যায় এবং তারা নিজেরা যেমন ভেবেছে সেইরকম আচরণ করতে থাকে তখন জগতে সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সকল জীব দুঃখ এবং শোকের জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

এজন্য ভগবান বেদব্যাস মহাভারতে বলেছেন—

ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে।।

(মহাভারত-স্বর্গা. ৫/৬২)

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য়তাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।।

'আমি দুটি হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বলি, কিন্তু আমার কথা কেউ শোনে না। ভাই সব! ধর্ম থেকেই ধন এবং সুখ প্রাপ্ত হয়। তাহলে কেন ধর্মের আশ্রয় নাও না? আমি ধর্মের সার বলছি। সে কথা সকলে শুনুক এবং তাতে মন দিক। তা হলো যে ব্যবহার নিজের ভাল লাগে না, তা অপরের সঙ্গে করবে না।'

এজন্য শাস্ত্রে স্থানে স্থানে এই ঘোষণা করেছে, যেখানে ধর্ম সেখানেই বিজয়—'**যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।**' (মহা. ভীষ্ম. ২১/১১, ৬৬/৩৫), যেখানে ধর্ম থাকে সেখানে অবশ্যই ভগবান আছেন; কারণ বিধাতা এবং তাঁর বিধান এক। উপরন্তু একথা বলাতেও কোনো ক্ষতি নেই যে বিধানের রূপে স্বয়ং বিধাতা বিদ্যমান থাকেন। আর যেখানে স্বয়ং ভগবান থাকেন সেখানে জয় তো নিশ্চিত। এজন্য মহাভারতের এক স্থানে আছে '**যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।**' (ভীষ্মপর্ব ৪৩/৬০)। 'যেখানে ধর্ম থাকে সেখানে ভগবান অবশ্যই থাকেন আর যেখানে ভগবান থাকেন সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী'। কেবল বিজয় নয়, সেখানে তো লক্ষ্মী, ঐশ্বর্য, নীতি প্রভৃতি সব অভীষ্ট বস্তু একত্র থাকে। এই কথাই সঞ্জয় গীতার শেষের দিকে বলেছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।

(১৮/৭৮)

'হে রাজন্! (বিশেষ কী বলব।) যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন এবং যেখানে গাণ্ডীব ধনুকধারী অর্জুন আছেন সেখানে শ্রী, বিজয়, বিভূতি এবং অচল নীতি থাকে, এই হলো আমার মত।'

কিন্তু এখন তো সব কিছুই উল্টে হচ্ছে। বর্তমান স্থিতির দিগ্‌দর্শন করাতে গিয়ে মহর্ষি দেবব্যাস বলেছেন

পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্বন্তি যত্নতঃ।।

'লোকেরা পুণ্যের ফল যে সুখ তা চায়, কিন্তু পুণ্য করতে চায় না। পাপের ফল যে দুঃখ আমরা তা চাই না, কিন্তু চেষ্টা করে পাপ করি।'

এই অবস্থায় সুখ কি করে হতে পারে। তবু লোকেদের চেতনা হয় না, ধর্মের দিকে কারও মন যায় না। জগতে সুখ-শান্তির বিস্তারের জন্য সাম্যবাদ, জনতন্ত্রবাদ, প্রভৃতি অনেক বাদ প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু এইসব বাদ থেকে আমাদের দুঃখ হ্রাসের বদলে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মের ফল সুখ আর পাপের ফল দুঃখ—এই কথা ভারতের শিশুরাও জানে। তবুও আজ আমরা এই সিদ্ধান্তকে ভুলে গিয়ে অধর্মের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এখন আমাদের বিধানসভাগুলিতে নতুন নতুন আইন তৈরি হচ্ছে—সেগুলি আমাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করছে। কোথাও সগোত্র-বিবাহ বিল, কোথাও অস্পৃশ্যতা-নিবারণ বিল এবং কোথাও বিবাহ বিচ্ছেদের বিল—চারিদিকে নতুন নতুন আইনের ছড়াছড়ি। কিন্তু আমরা চোখ বন্ধ করে এগুলিকে সমর্থন করছি। ইতিহাস একথার সাক্ষী যে পৃথিবীতে যখনই অধর্ম ও অনীতি বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই পৃথিবীতে শোক-সন্তাপও বৃদ্ধি পায়েছে। আর শেষপর্যন্ত অন্যায়কারীর পতন হয়। কখনও নিজে প্রকট হয়ে, কখনও মহাপুরুদের দ্বারা তাদের মনে প্রেরণা জাগিয়ে, ভগবান জগৎকে অধার্মিকদের কব্জা থেকে বাঁচান ; কেননা তাঁর ঘোষণা হলো—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাহহত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

(গীতা ৪/৭-৮)

'হে ভারত! যখনই ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখনই আমি স্বয়ং নিজের রূপ ধরি অর্থাৎ সাকাররূপে লোকেদের সামনে প্রকট হই। সাধু পুরুষদের উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে, পাপ কর্মে লিপ্ত যারা তাদের বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে এবং ধর্মকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি যুগে যুগে প্রকট হই।'

ঈশ্বরের উপর থেকে বিশ্বাস চলে যাওয়ায় এবং ধর্ম থেকে চ্যুত হওয়ার কারণে ভারত আজ দুঃখী হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা না থাকার ফলেই অল্পসংখ্যক জাতিগুলিও আমাদের সমান অধিকার দাবি করে আমাদের নামও

নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টিত হয়েছে। আর আমরা তা চুপচাপ সহ্য করে যাচ্ছি। এবং বলা হচ্ছে যে 'ধর্ম এবং ঈশ্বরবাদ আমাদের পতনের কারণ। যতক্ষণ না পর্যন্ত ধর্মের কপটাচার দূর হচ্ছে ততক্ষণ ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং ঐক্য ছাড়া ভারত কখনও সুখী হতে পারবে না।' পক্ষান্তরে এই বিধর্মীরা ধর্মের নামে সংগঠিত হয়ে ক্রমশঃ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং আমাদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করে চলেছে। আর অন্যদিকে আমাদেরই ভায়েরা আমাদের বলছে 'তোমরা নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির বিসর্জন দিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হও আর তাদের সঙ্গে একত্রে পান-ভোজন ও বিবাহ-আদি সম্পর্ক স্থাপন কর।' বলিহারী এই বুদ্ধির! ভগবান ঠিক কথাই বলেছেন যে যখন বুদ্ধির উপর তমোগুণের আবরণ এসে যায় তখন সবকিছু উলে দেখায়। অধর্মকে লোকেরা ধর্ম বলে মনে করে। শ্রীভগবান বলেছেন—

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাঽঽবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।

(গীতা ১৮/৩২)

'হে অর্জুন! যে তমোগুণের দ্বারা বেষ্টিত বুদ্ধি অধর্মকেও 'এইটিই ধর্ম' বলে মেনে নেয় এবং এইভাবে অন্য সব বস্তুকে বিপরীত মনে করে সেই বুদ্ধি তামসী।'

আমাদের দেশের বিভিন্ন আততায়ী আজ ধর্মের নামে অন্য মতাবলম্বীদের মারতে এবং স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত নেওয়াকে পুণ্য কাজ বলে মনে করে, যদিও এটি তাদের বিপরীত বুদ্ধির পরিণাম। এদিকে আমাদের ধর্ম-প্রেম এত কম হয়ে গিয়েছে যে আমরা ধর্মের জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করতে প্রস্তুত নই, অথচ গীতা আমাদের স্বধর্মে মৃত্যু বরণ করার উপদেশ দেয়। কিন্তু পরধর্মকে স্বীকার করা মোটেই ভাল নয়। কিন্তু আজকাল আমরা মিথ্যা জাতীয়তার মোহাচ্ছন্ন হয়ে গীতার এই অমর উপদেশ ভুলে গিয়েছি। আর স্বধর্ম ত্যাগ করতে তৎপর হয়ে যাচ্ছি। আহা! আজ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের সেই বীর পুত্রদের স্মরণ করা চাই যাদের প্রাচীরের সঙ্গে গেঁথে মারা হয়েছিল। তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু নিজেদের ধর্মকে ত্যাগ করেনি। সেই বীর বালকেরা বেণীকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু

আজ আমরা নকল একতার নামে বেণী দিতেও প্রস্তুত। উপরন্তু আমাদেরই কেউ কেউ একথাও বলেন যে মুসলমানদের সঙ্গে প্রেমবন্ধন গড়ে তোলার জন্য আমাদের মেয়েদের সানন্দে তাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া উচিত। যারা ধর্মের জন্য আজীবন কষ্ট সহ্য করেছে সেই নল, রাম এবং যুধিষ্ঠির আজ কোথায়? যারা ধর্মে দৃঢ় থাকে ধর্ম তাদের রক্ষা করে এবং অন্তিমে তাদেরই জয় হয়। অন্যায়কারী এবং পাপাচারী কিছুদিনের জন্য সুখী হলেও শেষপর্যন্ত তাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দময়ন্তীর পাতিব্রত ধর্মই তাকে রক্ষা করেছিল এবং যে ব্যাধ কুদৃষ্টিতে তার দিকে দেখছিল সে তার তেজে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। সতী শিরোমণি সাবিত্রী আপন ধর্মপ্রেমের দ্বারা যমরাজকেও জিতে নিয়েছিল এবং নিজের স্বামীকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছিল। দ্রৌপদীকে রক্ষা করবার জন্য ধর্মরূপ ঈশ্বর স্বয়ং মূর্তিমান হয়ে বস্ত্ররাশি রূপে প্রকট হয়েছিলেন। এই বীর নারীদের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে হিন্দু জাতি জীবিত থাকবে ততদিন এই দেবীদের উজ্জ্বল চরিত্র আমাদের কাছে দীপস্তম্ভ রূপে কাজ করবে। আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ঋষি মহর্ষি বার বার এই উপদেশ দিয়েছেন—

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভা-
দ্ধর্ম ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ।।

(মহা০ স্বর্গ০ ৫/৬৩)

'মানুষের কোনো সময়েই কাম, ভয়, লোভ, এমনকি জীবন রক্ষার জন্য ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা ধর্ম নিত্য এবং সুখ-দুঃখ অনিত্য তথা জীব নিত্য এবং জীবনের হেতু অনিত্য।'

যদিও ভগবানের দৃষ্টিতে পাপী ও ধর্মাত্মা সমান, তাঁর কারো প্রতি অনুরাগ নেই! বিদ্বেষ নেই; তবু তিনি ধর্মাত্মাদের রক্ষা করে প্রেমামৃত দান করেন এবং ধর্মদ্বেষীদের বিনাশ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিদুরের মতো ধর্মনিষ্ঠের বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে আহার করেছিলেন এবং দুর্যোধনের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ ও রাজোচিত আতিথেয়তাও স্বীকার করেননি। কথা হলো, ভগবান দৈবী

সম্পদ, ধর্মাচরণ এবং প্রেমকে গুরুত্ব দেন, ধন অথবা রাজকীয় ঐশ্বর্যের কোনো মূল্য তাঁর দৃষ্টিতে নেই। পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে কে আগে ভগবানকে পাবে তা নিয়ে এক রাজা ও এক নির্ধন ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। রাজা রাজোপচারে এবং অনেক টাকা খরচ করে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে ভগবানের পূজা করেছিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণের কাছে পত্র-পুষ্প এবং অন্নজল ছাড়া ভগবানকে নিবেদন করার কিছু ছিল না। যা ছিল তা হলো হৃদয়ের প্রেম ও দৃঢ় বিশ্বাস। ব্যস, কেবল এই ভরসায় সেই দীন হীন ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। শেষে সেই অকিঞ্চন ব্রাহ্মণই জয়লাভ করেছিল। প্রথমে ভগবান তার ঘরে যান এবং তাকে কৃতার্থ করে পরে রাজাকেও কৃপা করেন। রাজাকেও তাঁর ভক্তির জন্যই কৃপা করেছিলেন, তাঁর বিপুল ধনরাশির জন্য করেননি।

মহারাজ যুধিষ্ঠির জুয়া খেলায় হেরে গিয়ে মহান রাজবৈভবকে ত্যাগ করে ধর্মরক্ষার জন্য বার বৎসর বনবাস করেছিলেন। জুয়া খেলায় হেরে যাওয়ার পর সকলের সামনে দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করতে দেখে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার কোনো প্রতিকার করেননি। যমরূপী ধর্ম তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে যখন বরদান করে বলেছিলেন 'তোমার ভাইদের মধ্যে এক জনের জীবন তুমি চাও, তাকে আমি বাঁচিয়ে দেব।' তখন যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন চেয়েছিলেন। যম বলেছিলেন 'তুমি তোমার সহোদর ভীম অথবা অর্জুনের জীবন কেন চাইছ না? তাদের একজনকে পেলে তুমি তো সমগ্র জগৎকে জিতে নিতে পারবে এবং নিজেদের হারান সাম্রাজ্য পেতে পারবে?' কথাটি ঠিক। কিন্তু ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির রাজ্যের লোভ না করে ধর্ম রক্ষার জন্য নকুলকে বাঁচিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন ; কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে আমাদের দুটি মায়ের-ই সন্তানের বেঁচে থাকা উচিত। কুন্তীর পুত্র তো আমি জীবিত আছি। মাদ্রীরও একজন পুত্র থাকা উচিত। কুন্তীর দুজন পুত্র জীবিত থাকবে আর মাদ্রীর একজন পুত্রও বেঁচে থাকবে না—বিশেষ করে মাদ্রী যখন জীবিত নেই—এটি যুধিষ্ঠিরের ধর্মসঙ্গত বলে মনে হয়নি। এই জন্য তিনি নকুলের জীবন চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছিলেন সেই সময় একটি কুকুরও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কুকুরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে দেননি। এতে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে যেতে

অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন 'হয় এই কুকুরও আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে, নাহলে আমিও এখানেই থেকে যাব।' যুধিষ্ঠিরের এই অনুপম ধর্মপ্রেমের ফল এই যে ভগবান এক প্রকার তাঁর কাছে বিক্রিত হয়ে গিয়েছিলেন।

মহারাণা প্রতাপ জঙ্গলে ঘাসের রুটি খেয়ে বেঁচে ছিলেন তবু প্রাণ থাকতে ধর্ম ত্যাগ করেননি। ভক্ত বালক পুণ্ডলীক তো সাক্ষাৎ ভগবানকেও গ্রাহ্য করেনি এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মাতা-পিতার সেবারূপ ধর্মকে ত্যাগ করেননি। মাতা-পিতার অদ্বিতীয় ভক্ত বৈশ্যকুমার শ্রবণ মা-বাবার সেবায় সারাজীবন অতিবাহিত করেছিল। ধর্মব্যাধ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে স্বধর্ম পালনের চেয়ে বড় কোনো তপস্যা নেই। ব্রহ্মচর্য পালনরূপ ধর্ম পালন করে মহাত্মা ভীষ্ম দেবতাদের কাছেও অজেয় হয়ে গিয়েছিলেন। গৃহস্থের কাছে অতিথি সেবাকে পরম ধর্ম বলে মানা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহারাজ রন্তিদেবের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইনি একবার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আটচল্লিশ দিন নির্জলা উপবাস করার পর কিছু ক্ষীর, হালুয়া ও জল পেয়েছিলেন। নিজেদের মধ্যে ভাগ করে যখন তাঁরা ক্ষীর খেতে উদ্যত, তখন একজন ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁর দুয়ারে আসেন। ক্ষীরের কিছু অংশ তিনি সশ্রদ্ধায় ব্রাহ্মণকে দেন এবং বাকি অংশ নিজেদের জন্য রেখে দেন। ব্রাহ্মণ ক্ষীর খেয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন এক শূদ্র সেখানে আসে। সেই শূদ্রও ক্ষুধার্ত ছিল। সুতরাং রাজা ব্রাহ্মণকে দেওয়ার তার যা অবশিষ্ট ছিল তা থেকে তার এক অংশ সশ্রদ্ধায় শূদ্রকে দিয়ে দেন। শূদ্র চলে যাওয়ার পর এক চণ্ডাল তার কুকুরের সঙ্গে সেখানে আসে এবং রাজার কাছে খাদ্য চায়, রাজা অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষীর খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই চণ্ডালকে দিয়ে দেন এবং ভগবৎ বুদ্ধিতে তাকে এবং তার কুকুরটিকে প্রণাম করেন। তাঁর কাছে মাত্র একজনের পান করার মতো জল বেঁচেছিল? সেই জল যখন তিনি সকলের মধ্যে বণ্টন করার পর অবশিষ্টটুকু দিয়ে নিজের আটচল্লিশ দিনের পিপাসা মেটাতে যাচ্ছিলেন তখন আর এক চণ্ডাল সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাঁর কাছে জল যাঞ্চা করে। ব্যস, আর কী, রাজা সেই জল তাকে দিয়ে দেন। তখন ভগবান তাঁর সামনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে প্রকট হন। তখন রন্তিদেব ভগবানকে এই বলে প্রার্থনা করেন—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্চরাৎপরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।।

(শ্রীমদ্ভা. ৯/২১/১২)

'আমি পরমাত্মার কাছ থেকে অণিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধির দ্বারা যুক্ত উত্তম গতি বা মুক্তি চাই না, আমি কেবল এই চাই যে আমিই যেন সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে স্থিত হয়ে তাদের দুঃখ ভোগ করি যার ফলে তারা দুঃখমুক্ত হয়ে যায়।' ধন্য অতিথি প্রেম!

অতিথিসেবার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে পাওয়া যায়। মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হিংসা-দোষ থেকে নিবৃত্তি লাভের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়া মাত্র একটি নেউল যজ্ঞমণ্ডপে আসে এবং সেখানকার মাটিতে লুটোপটি করতে থাকে। তার অর্ধেক শরীর সোনার ছিল। সেই বিচিত্র জন্তুকে এইভাবে লুটোপটি করতে দেখে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে তার দিকে দেখতে থাকেন। তাকে আশ্চর্যান্বিত দেখে নেউলটি মানুষের স্বরে কথা বলে। সে জানায় যে কুরুক্ষেত্রে এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ থাকতেন। তিনি পায়রার মতো অন্নের দানা বেছে বেছে নিয়ে আসতেন এবং এইভাবে কষ্টার্জিত অন্নকে একত্র করে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। একবার তাঁকে সপরিবারে কয়েকদিন উপবাস করতে হয়। তারপর একদিন তিনি সের খানেক যব পান। তিনি তা থেকে ছাতু তৈরি করেন এবং সেই ছাতু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে যখন নিজে খেতে বসেন তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁর দরজায় উপস্থিত হন। তাঁকে তিনি প্রথমে নিজের, পরে তাঁর স্ত্রীর, তারপর তাঁর ছেলের এবং সর্বশেষে তাঁর পুত্রবধূর ভাগ দিয়ে দেন আর নিজেরা অভুক্ত থাকেন। তা দেখে আমি আমার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসি এবং যেখানে অতিথি ব্রাহ্মণ ছাতু খেয়েছিলেন সেখানে লুটোপটি করতে থাকি। তার ফলে আমার দেহের সঙ্গে সেখানকার কাদার স্পর্শ লেগে আমার মাথা এবং অর্ধেক শরীর সোনার হয়ে গিয়েছে। নেউলটি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের প্রশংসা শুনে এই আশায় সেখানে এসেছিল যে সেখানকার মাটিতে লুটোপটি করলে তার বাকী শরীরও

সোনার হয়ে যাবে। কেননা সেই যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ আহার করেছিল এবং অগণিত জিনিস খরচ হয়েছিল, কিন্তু নেউলের মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। তার শরীরের বাকি অংশ যেমনকার তেমনই রয়ে গেল। তাই সে জানিয়েছিল যে চক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের বিরাট যজ্ঞও সেই এক সের ছাতুর দানার সমান হতে পারেনি, অন্যদের সম্পর্কে আর কী বলা যায়!

এইভাবে বিভিন্ন ধর্মের বর্ণনা আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ধর্মগ্রন্থের পঠন পাঠন এবং পুরাণের কথকতার পদ্ধতি এক রকম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমান যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্মজ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে। তাই ধর্মজ্ঞান প্রসারের জন্য ধর্মগ্রন্থগুলির পঠন-পাঠন এবং পুরাণের কথকতা পদ্ধতিকে আবার চালু করা উচিত। ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকাদের এক জায়গায় বসে নিয়মিত রূপে সৎসঙ্গ এবং স্বাধ্যায়ের জন্য সময় বার করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ধর্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ তা পালন করবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ধর্ম সম্পর্কিত পত্রিকাগুলি খুব বেশি প্রচার করতে হবে। তাতে লোকেদের মনে ধর্মভাবনা জাগ্রত হয় এবং ধর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়ে। ভাল গুণ এবং ভাল আচরণ বৃদ্ধির জন্য মহাপুরুষদের স্মৃতি এবং তাঁদের চরিত্র পাঠ ও আলোচনা খুবই সহায়ক। শ্রীরাম, কৃষ্ণ প্রমুখ ভগবানের অবতারদের পবিত্র লীলা অনুসরণ এবং তাঁদের আদর্শ চরিত্র অনুকরণের দ্বারা সৎ চরিত্র নির্মাণ এবং দৈবী সম্পদ অর্জনে খুব সহায়তা হয়। **ভগবৎ স্মৃতি থেকে সকল গুণ অনায়াসে হৃদয়ে এসে যায় এবং জীবের পরম কল্যাণ হয়। অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করবার জন্য ভগবৎস্মৃতি অপেক্ষা শ্রেয় কোনো সাধন নেই।** অতএব ভগবানের স্মৃতি যাতে সদাসর্বদা হতে থাকে মানুষকে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। গীতায় ভগবৎস্মৃতির উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। গীতায় ভগবান অর্জুনকে যেসব জায়গায় আদেশ করেছেন সেখানকার অধিকাংশ জায়গাতেই স্মরণ রাখার উল্লেখ আছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে বিষয়-চিন্তন সর্বনাশের কারণ (দেখুন ২/৬২-৬৩) আর যারা ভগবৎ চিন্তা করে তাদের কখনই বিনাশ হয় না—**ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** (৯/১৩)

ভগবানের নাম জপ এবং কীর্তনের দ্বারাও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে সদগুণের বিকাশ এবং সদাচারের প্রবৃত্তি জন্মে। বাস্তবে ভগবান এবং ভগবানের নামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভগবানের স্বরূপের মতো তাঁর নামও চিন্ময়,

তাঁরই স্বরূপ। শব্দ, অর্থ এবং অর্থের জ্ঞান এই তিনটি একই জিনিস। অতএব ভগবৎ নামের সান্নিধ্যে এলে অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। সব কিছুর সার কথা সৎসঙ্গ এবং সৎ শাস্ত্রের অধ্যয়ন। সৎ নাম পরমাত্মার। গীতাতেও বলা হয়েছে—

'ওঁ তৎসদিসি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।'

(১৭/২৩)

'ওঁ তৎসৎ—এইভাবে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের নাম নির্দেশ করা হয়েছে।' সঙ্গ বলা হয় প্রীতিকে, সম্বন্ধকে। সুতরাং পরমেশ্বরের প্রতি প্রেমই হলো প্রকৃত সৎসঙ্গ। সৎ পুরুষদের, ভগবৎ প্রেমীদের সঙ্গের দ্বারা ভগবানে প্রীতি জন্মে। এজন্য তাকেও সৎসঙ্গ বলা হয়। তাই শাস্ত্রে সৎসঙ্গের, সাধু সঙ্গের এত মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতে বলা হয়েছে—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।

(১/১৮/১৩)

'ভগবৎ সঙ্গীদের—ভগবৎ প্রেমীদের সঙ্গে স্বল্পকালের সৎসঙ্গের তুলনা স্বর্গের আর কি কথা, মোক্ষ লাভের সঙ্গেও তার তুলনা হতে পারে না। মনুষ্যলোকের ভোগের তো কোনো কথাই নয়।'

এইভাবে সৎসঙ্গ এবং সৎশাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা নিজের কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে শীঘ্রাতিশীঘ্র মনুষ্যজন্মকে সার্থক করার প্রয়াসে লেগে পড়া উচিত, তাহলে পরে আর অনুতাপ করতে হবে না।